গানের বাহিরানা

গানের বাহিরান

সংকলিত সংগীত-বিষয়ক রচনা

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : ১৩৬৬ আশ্বিন

প্রুফ সংশোধক : জগন্নাথ ভট্টাচার্য

অরিজিৎ কুমার, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা ৪ প্রকাশিত
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত, বাণীশ্রী, ১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা ৬ মুদ্রিত
ও দীনেশ বিশ্বাস, ১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন, কলিকাতা ৯ গ্রন্থিত।

সূচি

১

২

৩

৪

পরিশিষ্ট

গানের বাহিরানা

১

লোকসংগীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্যা

আমরা আজ এক সামগ্রিক সংকটের আবর্তে। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। সাংস্কৃতিক সংকটের সামগ্রিক প্রকৃতিও আমাদের আজ আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচনার বিষয় লোকসংগীতের সমস্যা, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্যনিরূপণ। কিন্তু তবু আমি মনে করি আজকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে লোকসংগীতের সমস্যার আলোচনা কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। লোকসাহিত্য ও লোকসংগীতের জন্মদাতা যে গ্রাম্য জনসাধারণ তাদের জীবনে যে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে—লোকসংগীতের সার্থক রূপকার অসংখ্য গ্রাম্য-শিল্পীর কণ্ঠ যে অনাহার ও দারিদ্র্যে স্তব্ধ হয়ে এসেছে তাদের দিকে পিছন ফিরে লোকসাহিত্য ও লোকসংগীতের আলোচনা হবে শৌখীন বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই 'একাডেমিক ঔদাসীন্য' যেন আমাদের কখনো না হয়।

অদৃশ্য কালো টাকার যক্ষরাজ আজ সর্বশক্তিমান। অর্থনীতিতে মনোপলির ক্রমবর্ধমান নাগপাশ সমাজ ও সংস্কৃতিকে তার বিষকুণ্ডলীর পাকে জড়িয়ে ধরেছে। একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীন পাবলিসিটির লাউডস্পীকারে word তরঙ্গ আজ সর্বব্যাপী। কর্তা-কবলিত রেডিও গ্রামোফোন সিনেমা সংবাদপত্র সাহিত্যপ্রকাশনী এবং সাপ্তাহিকগুলি আজ জনসাধারণের রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমাদের দেশে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই রেজিমেণ্টেশনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন না করলে লোকসংগীতের সমস্যার উপলব্ধি সম্ভব নয়—তবু লোকসংগীতের সামনে কতকগুলি বিশেষ ধরনের সমস্যা আছে। এখানে তা সামান্য আলোচনা করবো। দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ থাকলে যেটুকু আমরা করবো তাতে আত্মপ্রতারণার সুযোগ থাকবে না।

নাগরিক জনপ্রিয়তা ও লোকসংগীত

অনেকদিন পর আবার কোলকাতা ও উপকণ্ঠে গান গেয়ে ঘুরছি প্রায়ই। পঁচিশ বছর আগেকার গণনাট্যের প্রথম যুগের প্রান্তরের দিনগুলি প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। এখন নতুন করে যতোই তা উপলব্ধি করছি ততোই সেকাল ও একালের গুণগত পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অবশ্য গ্রামের প্রান্তর ও

মহানগরীর মুক্ত অঙ্গন এক জিনিস নয়। একটিতে শ্রোতা নিজেই স্রষ্টা—লোকসংগীতের জনক হালুয়াচাষা। অন্যটিতে শ্রোতা নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত—এই যুগে কৃষিসমাজ ও সংস্কৃতি থেকে যার বিচ্ছিন্নতা প্রায় সম্পূর্ণ। এই শহুরে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে লোকসংগীতের সমাদর ও সমজদারী কি বেড়েছে না কমেছে? উত্তরে হয়ত কেউ বলবেন, যদি না বাড়বে তবে এই কোলকাতায় প্রায় ডজনখানেক লোকসংগীত গাইয়ের ডায়রীর এতোগুলি তারিখ 'ফাংশন' চিহ্নিত হয় কি করে? তাছাড়া কয়েকজন স্টার লোকসংগীতজ্ঞ আছেন যাঁদের জনপ্রিয়তা ও অর্থপ্রাপ্তি ২৫।৩০ বৎসর আগেকার লোকসংগীত গায়করা কল্পনাও করতে পারতেন না। রেডিওতে লোকসংগীতের প্রোগ্রাম নিয়মিত। লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ছোট বড়ো অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম শুনা যায়। 'বঙ্গসংস্কৃতি'র মত বাৎসরিক সম্মেলনে লোকসংগীতজ্ঞের তো লাইন পড়ে যায়। শহরের অসংখ্য বিচিত্রানুষ্ঠানে আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশে লোকসংগীতের জন্যও দু'একটি আসন খালি রাখা হয়। তাছাড়া লোকসাহিত্য, লোকযান প্রভৃতির উপর গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' পাওয়া গবেষকের সংখ্যাও নগণ্য নয়। কয়েক বৎসর আগে কি তা ছিল? ভদ্র-দরবারে লোকসংগীতের কি এমন কক্ষে আগে মিলতো?

কিন্তু এই জনপ্রিয়তা কি সমাদর ও সমজদারীর প্রমাণ? প্রতি শীতে 'সদারঙ্গ', 'তানসেন' প্রভৃতি রাগসংগীতের আসরের শ্রোতা গুণে কিংবা অসংখ্য রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানের অনুরাগীদের হিসাব কষে যেভাবে সমজদারীর মূল্য নিরূপণ করতে পারি ঠিক সেইভাবেই কি 'বঙ্গসংস্কৃতির' বা সেইরকম কোন সম্মেলনের শিক্ষিত শ্রোতার সংখ্যা গণনা করে লোকসংগীতের কদরের দর কষতে পারি?

রাগসংগীতের বৈজ্ঞানিক চর্চার ব্যবস্থা আছে। রাগসংগীত codified। বিশেষ গুরুর কাছে কিংবা ভাতখণ্ডে স্কুলে বসে রাগসংগীতের গায়কী ঘরানা আয়ত্ত করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতও তেমনি আটঘাট ঘরানায় বাঁধা। 'গীতবিতান', 'দক্ষিণী', বা 'রবিতীর্থে' বসে তা আয়ত্ত করা যায় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু লোকসংগীতের তেমন নির্দিষ্ট কোন code নেই। থাকতেও পারে না। নেই তার গুরুমুখী ঘরানা। যা আছে তাকে আমরা বলতে পারি 'বাহিরানা' বা আঞ্চলিকতা। আমরা ছোটবেলা থেকে কানে শুনে, চোখে দেখে মনের ভাবে গান শিখেছি। গলা সেধেছি কখন বলতে পারি না। গলা অবশ্যই চাই। কিন্তু পদ্ধতিটা হলো সেই 'বাহিরানা'র। গায়কীটা জলমাটি হাওয়ার, কিংবা পাহাড়

ও উপত্যকার। শুধু একজন নয়—গণসমষ্টি। সুরের লহরের তুলিতে আঁকা সামগ্রিক সমষ্টিজীবনের চিত্রপট থাকে চোখের সামনে। একটি বাদ দিয়ে আরেকটিকে উপলব্ধি করা যায় না। এইখানেই সমস্যার গোড়ার কথা।

ভাটীয়ালী যখন গাই মনের পর্দায় সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সেই মানুষ ও প্রকৃতির ছবির সারি। কিন্তু সেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নাগরিক শ্রোতার মনের পর্দায় কি সে ছবি প্রক্ষিপ্ত হয়? ভাটিয়ালীর 'সুজন নাইয়া'কে হয়ত তাঁরা কোনদিন দেখেছেন দূরে কোন পালের আড়ালে—চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে রোমান্টিক চোখে। কিন্তু ভাটীয়ালীর বিলম্বিত রেশের সুজন নাইয়াকে কি এই চোখে চিনতে পারা যায়? ঝড়োদিনে বর্ষার হাওরে পাগলা ঢেউএর সওয়ার সুজনকে কি তাঁরা দেখেছেন? কড়া হাতে বাঘথাবা মুঠোয় হালের হাতল ধরে শঙ্খচিলের মতো ঝড় কাটিয়ে যাওয়া সুজনকে না দেখলে, নৌকাবাইচে মরণপণ পাল্লায় দলবদ্ধ হুল্লোড়ে সারিগানের ছান্দসিক সুজনকে না দেখলে, নিস্তরঙ্গ ভাটীগাঙে কর্মবিরত সুজনের লিলুয়া বাতাসে ভাটীয়ালীর ভাবালুতাকে কি করে উপলব্ধি করবেন?

গোয়ালপাড়ার যে মাহুত বাঘবসতিজঙ্গলে জীবন বিপন্ন করে জীবিকার তাগিদে বন্যহস্তীর পাল খুঁজে বেড়ায়—আবার বন্দী বন্যহস্তীকে একদিকে অঙ্কুশের ঘা অন্যদিকে সুরেলা মরমী গানের চামর বুলিয়ে যে বশ মানায়—তার জীবনের একদিকে শৌর্যবীর্য অন্যদিকে দারিদ্র্য ও ঘরের প্রিয়জনের সঙ্গে চিরন্তন বিরহ সব মিলিয়ে সামগ্রিক জীবনের উপলব্ধি না থাকলে কি সেই ভাওয়াইয়ার রেশটানা গোয়ালপাড়ীয়া মাহুতের গানের সমজদারী সম্ভব?

ব্রহ্মপুত্রের রূপালি বালিচর, কাশফুলের ঢেউ, পাহাড়তলী উপত্যকার বুকের সাতনরীহার; দিখৌ, দিশাং, ধনশিরি, কপিলী নদীর প্রচ্ছদপটে মাঠের ধানরোয়া যুবতীটি, কিংবা প্রাঙ্গণে তাঁতশালে নক্সাবুনা মেখলাপরা গ্রাম্য কিশোরী মেয়েটিকে যদি ভালবাসতে না পারি তবে বিহুগীতের পুরো আস্বাদন কি করে পাবো?

রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্যসাহিত্য সম্বন্ধে যে কথাটি বলেছেন গ্রাম্যসংগীত সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য, কারণ গ্রাম্যগীতি ও কাব্য অবিচ্ছেদ্য। তিনি বলেন:

> প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন খণ্ডখণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে সাহিত্য তাহাকে একসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ...সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোলা দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ

করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়, তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে।

সংকটের স্বরূপ

যে গণজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মলীলা থেকে লোকসংগীতের প্রবাহটি উৎসারিত, শহুরে শিক্ষিত সমাজের সে ধারা থেকে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাই সংকটের গোড়ার কথা—পূর্বেই তা বলেছি। এই বিচ্ছিন্নতার খাল দিয়েই বিকৃতির কুমীর এসে ঘরে ঢুকেছে। আজ কোলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ শ্রোতাই সেই বিকৃতির বিচারে অসমর্থ।

কিছুদিন আগে কোলকাতার উপকণ্ঠে এক লোকসংগীত প্রতিযোগিতায় আমাকে বিচারক হিসাবে যেতে হয়েছিল। সেই অঞ্চলের অধিকাংশই পূর্ববংগের লোক। ছেলে মেয়ে মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন প্রতিযোগী ছিল। আশা করেছিলাম—জজীয়তীর দক্ষিণা স্বরূপ অন্তত দু'একটি নতুন গান সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারবো। অবশেষে হারমনিয়ম ও তবলা সহযোগে যা পরিবেশন করা হলো তার মধ্যে একটিতেও লোকসংগীতের এতটুকু স্বাদ পেলাম না। যাও দু'একটি গান কথায় ও সুরে কিছুটা হয়েছিল, গায়কীতে একেবারেই উৎরায়নি—নাগরিক পালিশে তার ধুলাবালি, কাদামাটি সব ঝরে পড়েছিল। এক সময়কার অতিপরিচিত আব্বাসউদ্দীন বা শচীন দেববর্মনের গানগুলিও যেন সবাই ভুলে গেছে।

কলেজে বা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে বিচিত্র অনুষ্ঠান নামীয় জিনিস-গুলির ভয়াবহ চরিত্রের কথা না-ই বা বললাম। মাঝে মাঝে রিফিউজি কলোনীতে গান গাইবার ডাক পড়ে। সেখানে প্রাণ খুলে পূর্ববংগের মেঠোগান গাইবো বলে কতবার গিয়েছি। সেখানকার প্রাচীন বয়স্ক লোকদের মনে সেই গানে nostalgia—ফেলে আসা গাঁয়ের কথা বা হারানো দিনগুলির স্মৃতি জাগাতে পারি, কিন্তু বর্তমান জেনারেশনের ছিন্নমূল পরিবেশে মানুষ তরুণ তরুণীর প্রাণে সেই তোলপাড় জাগাতে পারি না। বরঞ্চ সেখানে দেখেছি কোন হিন্দী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় গান গেয়ে অন্য একজন গায়ক অনেক বেশী ওদের মন জয় করতে পারেন। এ শুধু দুঃখের নয়—আশংকার কথা। কি করে তা হলো?

আজকালকার যুগটা manufactured music-এর যুগ। গান বাজারের

commodity বা পণ্য। কমার্শিয়েল সুর বলে একটি কথা সুরশিল্পীদের মধ্যে চালু আছে। ভৈরবীচক্রের তন্ত্রমন্ত্রের মতো তা এক দুরূহ ব্যাপার। ফাটকা বাজারের দালাল কিংবা ঘোড়দৌড়ের মাঠের টাউট-এর মতো চলচ্চিত্রের মিউজিক ডিরেক্টার বা গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রডুসারকে এই ভৈরবীচক্রের কোড্‌কে আয়ত্ত করতে হয়। আর্টের রথ চলছে আজ এই 'তন্ত্রমন্ত্রের টানে। পেশাদারী শিল্পী চিরদিনই ছিল। Professionalism এবং commercialism এক জিনিস নয়। গ্রামে অতীতে গায়েন, বায়েন প্রভৃতি পেশাদারী শিল্পী ছিল। পেশা ও আর্টে সেদিন কোন সংঘাত ছিল না। বরঞ্চ পেশাটা উৎকর্ষের কারণ ছিল। সংঘাতটা ছিল পেশা ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট সমাজব্যবস্থায়। ছোটবেলায় আমরা একটা ছড়া শিখেছিলাম :

কি কাম করলাম রে ভাই গাজীর গীত গাইয়া
পাঁচ আনা রুজি করলাম পাঁচ সিকার খাইয়া।

গ্রামের পেশাদারী গাজীর গীত গাইয়ের আর্থিক অবস্থাটাই এই ছড়ায় ধরা পড়েছে, কিন্তু গাজীর গীত শুনাতে গিয়ে সস্তায় 'যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য' দিবার ফাঁকিবাজিতে সে যায়নি। চরম দারিদ্র্যেও তাদের সৃষ্টিক্রিয়ায় কোন ব্যবসায়ী বুদ্ধি ভেজাল মেশাতে পারেনি। শিল্পী ও শ্রোতার সম্পর্কটা শুধু প্রমোদ বিতরণের জন্য ছিল না। সম্পর্কটা ছিল সামাজিক দায়িত্বের, আনন্দের মাধ্যমে লোকশিক্ষার, গোষ্ঠীচেতনার ঐক্যগ্রন্থনে এবং কর্মজীবনের প্রেরণা হিসাবে।

কিন্তু এখন পেশা রূপালী নেশার মাতলামিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। শিল্পী আজ paid piper অর্থাৎ রূপিয়া শিল্পের রূপ নির্ধারণ করে। প্রথমেই উল্লেখ করেছি স্ফীত মুদ্রারাক্ষসের আধিপত্য সংস্কৃতিতে কি দুষ্কৃতি এনেছে। লোকরঞ্জনের সমস্ত মাধ্যমগুলি একচেটিয়া আধিপত্যে রুচি তৈরীর mass production-এ নিয়োজিত, তার জন্য প্রয়োজন 'ট্রেডমার্ক' এবং সেই ট্রেডমার্কই হলো স্টার-আর্টিস্ট। পাবলিসিটির ঢাকের কাঠি হাতে থাকলে নকল কৌলীন্য সৃষ্টি করে চিরাগত 'অরেঞ্জে'-র স্বাদকে নবাগত 'কোকাকোলা' যে পরাস্ত করতে পারে তা তো চোখের সামনেই দেখছেন। এমন একদিন ছিল, যখন গ্রামোফোন কোম্পানী আনকোরা পল্লীগায়কের সন্ধানে গ্রামে স্কাউট পাঠাতেন। এভাবেই অনন্তবালা বৈষ্ণবী বা টেপুমিঞাদের সংগে আমাদের পরিচয়। কিন্তু তেহিনোদিবসাগতা। আজ তাদের জন্য গ্রামোফোন কোম্পানীর দ্বার রুদ্ধ। লোকসংগীতের সংগে

রেকর্ড করাতে হলে এখন আর গাঁয়ে গাঁয়ে সংমার্চের কষ্ট নেই, আধুনিক স্টার-শিল্পীদের মার্জিত কণ্ঠের বাজার দর তার চেয়ে অনেক বেশী।

বাংলাদেশে এই সংকটটা ঘনীভূত হয়েছে আরো তিনটি কারণে। প্রথম কথা কোলকাতা হলো মেট্রোপোলিস্—আমরা যাকে বলি মহানগরী। আজকের ধনিকতন্ত্রী সমাজপরিবেশে এই সব মহানগরীর সাংস্কৃতিক চরিত্র হয় cosmopolitan বা বারোবাজারী। রবীন্দ্রযুগে যে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা একদিন কোলকাতার প্রাণকেন্দ্রের সুস্থতা বজায় রেখেছিলেন, তাঁরা আজ দেউলিয়া। মানসিক দিক দিয়ে এঁরা অবক্ষয়ী বীজাণুতে আক্রান্ত, সৃষ্টির ক্ষেত্রে বন্ধ্যা, ব্যক্তি-চরিত্রে অধঃপতিত। তাই বারোবাজারী বিজাতীয় আর্টের আক্রমণের সামনে বুদ্ধিজীবীর কোলকাতা আজ আত্মসমর্পণ করেছে। বিয়ে বাড়িতে, সরস্বতী পূজায়, শারদীয়ায় মাইকের চিৎকারে রবীন্দ্রঐতিহ্যবাহী শিক্ষাভিমানী বাঙালী পাড়ায় পাড়ায় সুরের নামে যে আসুরিক দৌরাত্ম্য চলতে থাকে এটি তারই একটি নিদর্শন মাত্র।

দ্বিতীয়ত, কোলকাতাকে ঘিরে যে কয়টি জেলা আছে,—হাওড়া, হুগলী বা চব্বিশপরগণা—লোকসংগীতের দিক দিয়ে তাকে বাংলা দেশের সবচেয়ে নিষ্ফলা ভূমি বললে অত্যুক্তি হবে না। তার ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণ করতে চাই না। কিন্তু কোলকাতাকে ঘিরে থাকা এই নিষ্ফলা ভূমি কোলকাতার সংস্কৃতির এই বারোবাজারী চরিত্রকে অনেকখানি সাহায্য করছে।

পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকার আশেপাশে ভাটীয়ালীর মাটি ও জল এমন সজীব যে সেখানে সে বিপদ খুব কম। সেখানকার নাগরিকদের কানে মেঠোসুরের রেশ সর্বদা ভেসে আসে। গ্রামের সংগে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন নয়। আমলা শাসিত হলেও ঢাকা রেডিওর লোকসংগীতে তার আস্বাদ আজো আমরা খুঁজে পাই। গৌহাটীতে বসে বিহু গীতে কিংবা ওজাপালীতে ভেজাল মেশানো খুব কঠিন। কিন্তু কোলকাতার লোকসংগীতের আসরে সবই সম্ভব। শ্রোতার কান তৈরী নয়। মন মাটিতে বাঁধা নয়,—বাউল, ভাটীয়ালী, ভাওয়াইয়া সুরকে নিয়ে টানা-হেঁচ্ড়া করলেও শ্রোতার বুকে তা বেঁধে না, কারণ সেই mental association বা ভাবানুষঙ্গের বালাই তাদের নেই।

তৃতীয়ত, বঙ্গভঙ্গ। বাংলার লোকসংগীতের অফুরন্ত খনি পূর্ববংগের সাথে আমাদের দৈহিক বিচ্ছেদ যে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে কী অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে তার মূল্যায়ণ আজো হয়নি। সেই ভাণ্ডারের অধিকারী যে সব রিফিউজি

পশ্চিমবাংলায় হাজারে হাজারে এসেছেন মাটি থেকে শিকড় ওপড়ানো তাঁদের পুঁজিপাটা রসের অভাবে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। পদ্মার ওপার থেকে যে সব মাটির খাঁটী শিল্পী এসেছিলেন তাঁরা যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। কোলকাতায় অলিতে গলিতে সরোদ, সেতারের সাধক পাওয়া যায় কিন্তু একটি দোতারা বাদক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

এই অবস্থার মধ্যে আমি শুরুতেই যার উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রসংগীত বা রাগসংগীত তার সুদৃঢ় দুর্গ তৈরী করে নিয়েছে। বিভিন্ন শিল্পী ও প্রতিষ্ঠানের সমবেত সাধনায় এই হট্টমেলার হাটেও তাদের ঘরানা সুপ্রতিষ্ঠ। অসংখ্য দরদী শ্রোতার তৈরী কান সতর্ক প্রহরায় জাগ্রত। বিকৃতির বিপদ নেই, সমস্যা প্রসারের। এই শ্রোতারা হয়ত সবাই সরগম ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারেন না কিন্তু কান দিয়ে ও মন দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন প্রচলিত রাগের রূপ। তাঁরা হয়ত আশাবরী এবং জৌনপুরীর পার্থক্য ধরতে পারেন না, কিন্তু ভৈরবী ও আশাবরীর তফাৎটা ধরতে পারেন। অথচ সেই শিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই ভাটীয়ালী আর ভাওয়াইয়ার পার্থক্য কানে শুনে বুঝতে পারেন না—গায়কীর কথা ছেড়েই দিলাম। এই অজ্ঞানতাই লোকসংগীতের ঘরে বিকৃতির সিঁদকাঠি।

সমাধানের সন্ধানে

এই অন্ধগলি থেকে খোলা হাওয়ার সন্ধানী আমরা। সেই পথে আজ আমাদের দেশের লোকসাহিত্য বা লোকসংগীতের প্রথম সন্ধানীদের স্মরণ করতে চাই শ্রদ্ধাভরে।

গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে প্রথম জাতীয় জাগরণ ও গণচেতনার উন্মেষই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, বাগ্‌দীদের দিকে শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি ফেরালো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য অলিখিত সাহিত্য কিংবা গীতের দিকে পূর্বসূরীদের দৃষ্টি পড়লো।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে বলেন :

> সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।

সে সম্ভাষণেই অন্য জায়গায় বলেছেন :

> আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology বইয়ে পড়ি না তাহা নহে, যখন দেখিতে পাই সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কতো বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কতো বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।···ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণস্বরে বীণা বাজাইতেছেন একথা ধ্যান করা নেশামাত্র, কিন্তু ভারতমাতা যে পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।···

তারও আগে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> ঠাকুরমার ঝুলিটির মতো এত বড় স্বদেশী জিনিষ আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের fairy tales আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউলদের সম্পর্কের পরিচয় তাঁর চিন্তায়, সংগীতে, সাহিত্যে রয়েছে। এমনকি তাঁর বেশভূষায় বাউলদের প্রভাব সম্পর্কে আপনারা জানেন।

তারও আগে আমাদের দেশের দরদী মনীষী রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সাধারণ চাষাভুষার প্রতি গভীর অনুরাগ থেকেই Folktales of Bengal এবং Bengal Peasant Life লেখেন। শেষোক্ত বই-এর ভূমিকায় তিনি বলেন : **Zaminder's Catchari is the scene of Ryots' degradation where he is derided, spat upon and treated as if they were the veriest vermins in creation.**

নিগৃহীত অনাদৃত আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমতা, তাদের সৃষ্টিপ্রতিভার স্বীকৃতিই লোকসংগীতের অনুসন্ধানী আমাদের পথিকৃৎদের অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তীকালে এই ধারা চিরস্মরণীয় দীনেশচন্দ্র সেনের

মধ্যে এসে গভীরতর এবং প্রশস্ততর হয়। নাগরিক সাহিত্যধারায় যখন দেবদেবীর উৎপাত চলছিল এবং সীতাসাবিত্রীদময়ন্তীর ছিল একচেটিয়া অধিকার ঠিক তখন চাষাভূষার ঘরে মহুয়া, মলুয়া, মদিনার আবিষ্কার আমাদের সংস্কৃতি জগতে এক মোড়ফেরানো ঘটনা। সে উপলক্ষে ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন যে অমূল্য আলোচনায় লোকসংগীত গবেষক ও অনুরাগীদের সামনে এক নতুন দিগদর্শন তুলে ধরেন তার উদ্ধৃতি আর এখানে করছি না। সংগে সংগে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি চিরদরিদ্র লোকসাহিত্যের পথিকৃৎ চন্দ্রকুমার দে-কে। সেটা ছিল সাধারণ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। সে সময় স্মরণ করুন আব্বাস-উদ্দীন ও শচীন দেববর্মনের পল্লীগীতি সারা বাংলায় কী শিহরণ তুলেছিল। শিক্ষিত সমাজ যেন তার জন্যই উন্মুখ হয়ে বসেছিল। গ্রামোফোন কোম্পানী হাওয়া বুঝেই সেদিন পাল তুলেছিলেন—অবশ্য ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে। তবু তাঁদের সেজন্য সাধুবাদ দিতে হয়।

গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত

লোকসংগীত যে সময় ছিল সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, লোকসংগীতের সেই নৈর্ব্যক্তিকতা ও মৌখিকতার রূপ থেকে সমাজের শ্রেণীবিভক্তিকরণের তীব্রতার ও জটিলতার সংগে সংগে তা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। অবশ্য এই 'এগিয়ে আসা' কথাটাতে আমি অগ্রগতি বুঝাতে চাই না। কারণ আমার মতে ধর্ম-প্রভাবমুক্ত আদি কমিউনিটীসৃষ্ট বিশেষ উপলক্ষজাত অনুপ্রেরণায় improvised স্বতঃস্ফূর্ত লোকসংগীতগুলি সুরে ও রচনায় অনেক বেশী আবেগ ও আবেদনশীল। আজো বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের তথাকথিত 'বাহে' উপজাতির সৃষ্টি ভাওয়াইয়াতে তার সাক্ষ্য পাই। তারপর এল ভণিতার যুগ। লোকসংগীতেও বিশেষ রচয়িতার আবির্ভাব হলো। 'দীন শরৎ বলে', 'ভেইবে রাধারমণ বলে', 'পাগল জালালে কয়' ইত্যাদি। কিন্তু এখানে ব্যষ্টি সমষ্টিচেতনারই বাহক ছিলেন। সমাজমানসের বিশেষ বক্তব্যটি ব্যক্তিমানসে প্রতিফলিত হতো। সেইজন্যও ভণিতাযুক্ত হয়েও এগুলি লোকসংগীত। সমাজ-আলোড়নকারী বিশেষ ঘটনাকে ব্যক্তিরচয়িতা লিপিবদ্ধ করেছেন সমাজের প্রতিভূ হিসেবে লৌকিক রূপরীতিতে। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় যখন বহুলোকের সর্বনাশ ডেকে এনেছে লোকসংগীত রচয়িতারা তা রচনায় রূপ দিয়েছেন। যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আমাদের লোকসংগীতে অমূল্য ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। পলাশীর যুদ্ধের

"কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।"

ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি···"

কিংবা মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের গ্রাম্যবধূর সেই আকুতি

"বসরায় পোষ্টআফিস হৈল ছাড়া
খসম আমার গেল কৈ ছাড়ি লড়াই-এর ডাক পাই তরা।"

প্রভৃতি আমাদের লোকসংগীতের ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যশালী করেছে। তাদের পথ অনুসরণ করে কোন বিশেষ রচয়িতা যদি আজকের কৃষক বিদ্রোহের বা তেভাগা আন্দোলনের অমর শহীদদের আত্মদানের অনুপ্রেরণায় লোকসংগীত রচনা করেন —লৌকিক সুর ও রচনার ভঙ্গী অব্যাহত রেখে—যা লক্ষলোকের মনে আলোড়ন তোলে—যা জনসাধারণ গ্রহণ করে তাদের নিজের গান বলে তবে আপত্তির কি আছে? বরঞ্চ এটাই লোকসংগীতের রূপান্তরের স্বাভাবিক ধারা। অথচ আমাদের কিছু গোঁড়া লোকসাহিত্য গবেষক এতে 'রাজনীতি' আছে বলে আঁৎকে ওঠেন। কেউবা বলেন, লোকসংগীতে এসব হলো প্রক্ষিপ্ত। সিপাহী বিদ্রোহে যে অসংখ্য লোকগীতি উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে কি রাজনীতি নেই। ভগৎসিংহের উপর যে অসংখ্য গান পাঞ্জাবে ছড়িয়ে আছে, মণিরাম দেওয়ানের ফাঁসির উপর যে অসংখ্য গান আসামে ছড়িয়ে আছে তাতে কি রাজনীতি নেই! জাতীয় মুক্তি আন্দোলনজাত গানকে কেউ কেউ স্বীকৃতি দিলেও কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামজাত গানকে তারা কিছুতেই গ্রহণ করতে নারাজ। ভারতের অসংখ্য কৃষিবিদ্রোহে জনসমাজে বহু গান রচিত রচিত হয়েছে—আমাদের গবেষকদের অধিকাংশের প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়ামির জন্য ওই সব গান সংগৃহীত হয়নি এবং অনেক লোপ পেয়েছে।

এখানেই গণনাট্যসংঘ বিশেষ ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সারা ভারতে কৃষক ও শ্রমিকের গণ-শ্রেণীসংগ্রামজাত নতুন জীবনবোধে শত শত গান সেদিন রচিত হয়। এক অংশ কৃষক আন্দোলনে নিয়োজিত আমাদের মত শিক্ষিত শ্রেণীর রচয়িতা অন্য অংশ নিরক্ষর চাষীর আপন ঘরেরই রচয়িতা। আরেকটি বড় অংশ যাঁরা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে ছিলেন না—যাঁরা আউল বাউল নামেই খ্যাত ছিলেন তাঁদের ভাবধারায় সেদিনের আন্দোলনের জোয়ারের ধাক্কা পড়েছিল এবং তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্ত গান রচনা করেছিলেন—তাই নেত্রকোনায় লক্ষ কৃষকের

সমাবেশ আমাদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবাহূত রসিদউদ্দিন, জামসেউদ্দিন প্রমুখ আউলিয়া গায়করা আমাদের সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে ময়মনসিংহের 'ব্যালাড' গাইবার বিশেষ ঢঙে যখন গান ধরলেন :

আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কার কাছে জানাই
সুখের স্বপন ভাঙলোরে
চুরাই বাজারে—
ভাইরে ভাই—তেরশ পঞ্চাশের কথা মনে কেউর পরে গো
মনে কি কেউর পরে
ক্ষুধার জালায় বুকের ছাওয়াল
মায়ে বিক্রী করে রে
চুরাই বাজারে ॥
ইত্যাদি……

তখন বুঝতে পারি—আউলিয়াদের 'আবহাওয়াতের' ত্রিবেণী সংগমের সাধনা থেকে বিক্ষুব্ধগণসমুদ্রসংগমে টেনে এনেছে চোরাইবাজার ও দুর্ভিক্ষ। জনসাধারণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তাঁরাও গণবিক্ষোভের সরিকদার। নতুন প্রাণপ্রবাহে লোকসংগীত সমৃদ্ধ হলো। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে প্রবন্ধকে দীর্ঘ করতে চাই না। আমাদের মতো শিক্ষিত রচয়িতাদেরও কিছু গান লোকসংগীতেরই অঙ্গীভূত হয়ে আজো বেঁচে আছে। সে সময় আমাদের দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ ছিল না। সচেতন ভাবে ততটা গান রচনা করিনি আন্দোলনের তাগিদে যতটা করেছি। লোকসংগীত রচনা করবো বলে করিনি। এজন্য তার মধ্যে কতকগুলি লোক-সংগীত হিসাবে উৎরে গেছে—কথায়, সুরে ও ঢঙে। সেসময় গণনাট্য রচনার অধিকাংশই লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি—লৌকিক রূপরীতি ও ঢঙের বিচারে। আমরা তাকে বলি 'গণসংগীত'। কিন্তু নিবারণ পণ্ডিত, বিশু পণ্ডিত, রমেশ শীল প্রমুখ সত্যিকার লোকশিল্পীদের সেদিনকার বহু রচনা লোকসংগীতের ধারার সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল। সর্বভারতীয় এই আন্দোলন লোকসংগীতে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল। কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনের একজন আদি উদ্যোক্তা হিসাবে আমাকে স্বীকার করতেই হয়—আমরা সেদিন ঘনিষ্ঠ গণসংযোগে থাকলেও লোকসংস্কৃতির ও লৌকিক ঐতিহ্যের অধ্যয়নে যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় দরকার তার সুযোগ ও সময় আমাদের ছিল না। জনসাধারণের সঙ্গে গভীরভাবে

মিশবার সুযোগ পেলেও সে তুলনায় সংগ্রহ করতে পারিনি। ফলে আন্দোলনের ঢেউ পলিমাটি যথেষ্ট বয়ে আনলেও সে তুলনায় ফসল আহরণ করতে আমরা পারিনি।

তারপর নাগরিক জীবনে যেসব রচয়িতা লোকসংগীতের সন্ধানী হলেন দেখলাম তাঁদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য হলো 'সুর-চুরি', লোকসংগীত গবেষণা নয়। অন্যদিকে যাঁরা সত্যি লোকসংগীত গবেষণায় নিরত হলেন তাঁদের মধ্যে দেখতে পেলাম শুধু academic অনুসন্ধিৎসা। এঁদের গবেষণাজাত সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে আমরা অত্যন্ত উপকৃত এবং সেজন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। কিন্তু তবু মনে হয় এঁদের অনেকের লক্ষ্য যেন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পাওয়া। গণজীবনের ব্যথা বেদনা ও সংগ্রাম সম্বন্ধে এঁরা এমন নিস্পৃহ যে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলে মনে হয় লোকসংগীতকে এঁরা যেন যাদুঘরের exhibit ভাবেন। লোকসংগীত যেন এঁদের বৈঠকখানায় বিষ্ণুপুরী পোড়ামাটির ঘোড়া। এইসব পণ্ডিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ জনজীবন থেকে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন যে দীনেশ-চন্দ্র সেনের দানকে পর্যন্ত লঘু করে দেখতে লাগলেন। কেউ কেউ দীনেশচন্দ্র সেনের সাধারণ জনতার প্রতি গভীর অনুরাগকে 'অন্ধ অনুরাগ' 'মাত্রাতিরিক্ত ভাবাতিশয্য' বলে মন্তব্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তি অবশেষে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মৌলিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন। কেউ কেউ ভাবলেন এ মূলের উপর দীনেশচন্দ্র সেনের মুন্সীয়ানা। আবার কেউবা প্রকাশ্যেই বললেন এ সবটাই জাল। জনজীবনবিচ্ছিন্ন বাংলার বাবু-সংস্কৃতির দেউলিয়াপনার এমন নিদর্শন আর নেই। এমন সময় যিনি আমাদের দেশের জনতার এই অমূল্য অবদানকে যুক্তি তথ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন সেই দরদী মনীষী হলেন চেকোস্লোভাকিয়ার তরুণ ভারতবিদ্ ডঃ ডুসান জ্‌বাভিতেল। তিনি আমাদের নমস্য।

লোকসংগীতের গবেষণা ও গণদৃষ্টি

বাংলার নিরক্ষর পল্লীসমাজের অলিখিত সাহিত্য ও সংগীতকে আমাদের পূর্বসূরীরা যে মর্যাদা দিয়েছিলেন সেই মর্যাদাকে নূতন করে আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে আমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এখনো শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত সম্বন্ধে শুধু অজ্ঞতা নয়—গুপ্ত অবজ্ঞার ভাব বর্তমান। আজো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অগ্রসর শিক্ষায়তনে বাংলা

সাহিত্যের ডিগ্রিকোর্সে লোকসাহিত্যের তেমন কোন স্থান নেই। বাংলা সাহিত্যে ডিগ্রি বা অনার্স পাওয়া ছাত্রদের কাছে লোকসাহিত্য অবশ্যপাঠ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় নয়। মাত্র কয়েক বৎসর আগে এম. এ. ক্লাসে একটি পেপার লোক-সাহিত্যের উপর করা হয়েছে। আমাদের কবি ও সাহিত্যিকরা এবিষয়ে সবচেয়ে অজ্ঞ। সংগীতজ্ঞরাও তাই। রবীন্দ্রসংগীতের কথায়, সুরে ও দর্শনে বাউলের প্রভাবের কথা আগেই বলেছি—কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত সচরাচর গেয়ে ফিরেন তাঁদের একটি খাঁটি বাউলগান গাইতে বলুন—আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করবেন। আমাদের আকাশবাণীর কর্তারা ভাবেন লোকসংগীত এমনই লঘুসংগীত যে সবাই গাইতে পারে। কাজেই তার দক্ষিণাও সবচেয়ে কম। এই বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টি থেকে একাত্মতার দৃষ্টিতে আমাদের ফিরে আসতে হবে। যে দৃষ্টিকে আমি বলতে চাই গণদৃষ্টি।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নিখিল সোভিয়েট লেখক কংগ্রেসে ম্যাক্সিম গর্কী বলেছিলেন: We must realise that it is the masses' labour that is the chief organiser of culture and creator of all ideas. ···There was a time in antiquity when the toilers' oral lore was the sole organiser of their experience, the translator of ideas into terms of images and stimulator of the collective labour energy. That is something we must realise ..I would again draw your attention to the fact, that the most profound, striking and artistically perfect types of heroes have beeh created by folkore, the oral creation of the working people.

গ্যেটে বলেছেন: Folktale is the father of all fiction and folksong is the mother of all poetry.···

সাহিত্যের ক্ষেত্রে গর্কী ও গ্যেটে যা বলেছিলেন গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রুশ সংগীতবিদ্ গ্লিংকা সংগীতের ব্যাপারে ঠিক সে কথাই বলেছিলেন: It is the people who create music, we only arrange it. এ যুগে সেই কথাটি আরো আবেগের সঙ্গে বলেছেন পল রবসন: One perhaps forgets my own career, and that for five years I would sing nothing but the music of my people. Later when it was established as a fine folk music I began to learn of the folk music of other peoples

This has been one of the bonds that have drawn me so close to the peoples of the world, bonds through this likeness in music that made me understand the political growth of many peoples, the struggles of many peoples and brought me back to you to fight here in this land as I shall continue to do.

এই দৃষ্টিকোণকেই আমি বলতে চাই গণদৃষ্টি। আজকের দিনে এই গণচেতনা ছাড়া লোকসংগীতের উপলব্ধি বা গবেষণা ভ্রান্ত হতে বাধ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই নাগরিক বা লৌকিক সাহিত্য ও সংগীতকে আজ 'উচ্চ' এবং 'নিম্ন' আখ্যা দেবার মধ্যে বিপদ দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন :

গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়।...সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্ন সাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে।

নীচের সহিত উপরের এই যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কনের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশিদুর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।...কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত।...

রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষ অর্থে 'উচ্চ' এবং 'নিম্ন' শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন। তা থেকে যদি কেউ এ সিদ্ধান্তে আসেন যে উৎকর্ষের দিক দিয়ে লোকসাহিত্য নিম্নশ্রেণীর এবং নাগরিক সাহিত্য উচ্চশ্রেণীর তবে তা হবে নিতান্তই হাস্যকর।

চিরায়ত সাহিত্য ও সংগীত চিরদিন লোকায়ত সাহিত্য ও সংগীতকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। গঠন-পারিপাট্যে অর্থাৎ টেকনিক বা আঙ্গিকের উৎকর্ষে ও অলঙ্করণে চিরায়ত সুপ্রতিষ্ঠ। তা বলে বিশেষ ভাব ও রস সৃষ্টিতে তা লোকায়তের চেয়ে সর্বক্ষেত্রে উৎকর্ষের দাবী কি করতে পারে? তা হলে রবীন্দ্রনাথ

একটি ছেলে ভুলানো ছড়া

ও পারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে,
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ॥···

-এর সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ' তুলনা করে বলতেন না 'কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।'

গানের বেলাও উচ্চাঙ্গ সংগীতে, আলাপ, বিস্তার, তান, ও লয়ের টানাপোড়েনে যে জটিল দক্ষতার পরিচয় মেলে সে ক্ষেত্রে আমাদের অন্যান্য গানের চেয়ে তার উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ভাব ও রসসৃষ্টিতে রাগসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত বা লোকসংগীতের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। সেখানে উচ্চ এবং নিম্ন বলে কোন শ্রেণীভেদ সম্ভব নয়। খাঁটি লোকসংগীতে দেশের সাধারণ মানুষ, মাটি ও প্রকৃতির সঙ্গে যে একাত্মতার বাঁধন সৃষ্টি করে অন্য সংগীতে তা হয় না। লোকসাহিত্যের বেলাও সেই কথা। কাজেই আজকের দিনে বিশেষত যখন অবক্ষয়ী নাগরিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে গণমানসের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন তখন তাদের সৃষ্টিকর্মের ও চিন্তার চেয়ে লোকসাহিত্য ও লোকসংগীতের উৎকর্ষের কথাই আমাদের জোরের সঙ্গে বলতে হয়। 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ব্যষ্টিমন ও লোকসাহিত্য' শিরোনামায় আলোচনা করতে গিয়ে খ্যাতনামা লোকসাহিত্য গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এক জায়গায় বলেছেন :

'নাগরিক মন উচ্চতর সাহিত্য হইতেই রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চতর সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি এবং লোকসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি এক নহে। যদিও লোকসাহিত্যের মধ্যে একটি চিরন্তন আবেদন আছে সত্য, তথাপি সেই আবেদনটির বহিরঙ্গগত রূপ ক্রমে নাগরিক সমাজের মধ্যে অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য রূপকথা কিংবা উপকথার মধ্যে যে শাশ্বত আবেদনই থাকুক না কেন, তাহা আধুনিক সাহিত্য হইতে রস-সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত পাঠকের নিকট কোনও কৌতুহল সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক রুচি ও রসবোধ অনুযায়ী লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া এই বিষয়ে কৌতুহল সৃষ্টি করিতে পারিলে ইহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয়া সম্ভব।'···

বর্তমান নাগরিক সমাজের 'আধুনিক রুচি'কে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য

মহাশয় যে ভাবে ছাড়পত্র দিয়েছেন আমি তা দিতে রাজী নই। যে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা চিন্তায়, কথায়, বেশভূষায় ইংরেজীয়ানা আমদানী করেছিল এবং দেশজ সবকিছুর প্রতিই একটা অবজ্ঞামিশানো উন্নাসিকতার জন্ম দিয়েছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিরোধ করেই আমাদের লোকসংগীত ও সাহিত্যের পথিকৃৎরা যাত্রা শুরু করেছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় মন্তব্য করেছিলেন: 'এখনকার কালে বিলাতের 'Fairy tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে।' ১৮৯৮ সনে লিখিত 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে এই আধুনিক শিক্ষার বিষময় ফলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন:

> 'অতি অল্পদিন হইল 'আধুনিক কাল' দূরদেশাগত নবীন জামাতার মতো নূতন চাল চলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য গ্রাম্যছড়া-সংগ্রহের ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা আমাকে লিখিতেছেন— 'প্রাচীনা ভিন্ন আজকালকার মেয়েদের কাছে এইরূপ কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না।···সুতরাং পাঁচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলেই পাঁচগ্রামের বৃদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়।'···

লোকসংগীতের অন্তঃপুরে আধুনিক রুচি নগরের নতুন জামাতা হয়ে প্রবেশ করে এতোদিন আগেই যদি এমন কাণ্ড করে যেতে পারলো তবে আজ যখন কোলকাতা মহানগরীকেন্দ্রিক বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীশ্রেণী গণসমাজের সমস্ত শিকড় থেকে নিজেকে উৎপাটিত করে বৈদগ্ধ্যের বাহাদুরী দেখাচ্ছেন তখন তাঁদের এই 'আধুনিক রুচি ও রসবোধ' অনুযায়ী লোকসাহিত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করার কথা বলা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

লোকসংগীতের সাংগীতিক বিচার

আজ পর্যন্ত লোকসংগীতের যত আলোচনা হয়েছে তা সাহিত্যিক বা সামাজিক দিক থেকেই করা হয়েছে, কিন্তু সাংগীতিক দিক দিয়ে আলোচনা হয়নি বললেই চলে।

লোকসংগীত কী, তা বিচারের প্রধান মানদণ্ড হলো সুর ও গীত-রীতি। পল্লীগীতি দু'প্রকারের—এক, সুর যেখানে কথানির্ভর ও কথা অনুসারী, অন্য, সুর যেখানে কথানিরপেক্ষ। সুর যেখানে কথানিরপেক্ষতায় আপন অভিব্যক্তিতে

আবেদনময় হয়ে ওঠে এবং বিশেষ জাতের বিশেষ প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করে সেখানেই লোকসংগীতের উৎকর্ষ। সেজন্যই পৃথিবীর সর্বদেশের এ ধরনের লোকসংগীতের আবেদন দেশাতীত হয়ে ওঠে। এবং এখানেই **musicologist** বা সংগীতবিদের বিস্ময় ও গবেষণার অনুপ্রেরণা।

লোকসংগীতের সুর বাদ দিয়ে কথার আলোচনা রাম ছাড়া রামায়ণীর মতো। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি সংগীত সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে গেছেন এবং রাগসংগীতকে তদানীন্তন কালোয়াতীর কণ্ঠ ব্যায়াম থেকে মুক্ত করার সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু লোকসংগীতের সাংগীতিক দিক নিয়ে কোন আলোচনা করে যাননি। হয়ত তখনো লোকসংগীতের সংগ্রহ ও অনুশীলনের প্রাথমিক স্তর ছিল বলেই শিক্ষিত শ্রেণীর সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি এর সাহিত্যরসের দিকটাই প্রথমে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। ইদানীং সংগীতার্য সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় প্রমুখ দু'একজন এবিষয়ে সামান্য আলোচনা করেছেন।

লোকসংগীতের বিষয়ে প্রথমে আমি যে 'বাহিরানার' কথা উল্লেখ করেছিলাম আসলে তা হলো আঞ্চলিকতা। এই আঞ্চলিকতা একটি ভৌগোলিক পরিবেশে সংহত কোন উপজাতি বা **ethnic group**-এর মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে। বাঙালী ভাষা ও কৃষ্টিতে একটি জাতি। কিন্তু তথাপি সেখানে জেলা বা অঞ্চল-গত যে উপভাষা আছে এবং তা বলার এক বিশেষ সুর বা **intonation** আছে তাতে যে সব উপজাতি বা খণ্ডজাতির মিশ্রণে বাঙালী জাতির উৎপত্তি হয়েছে তাদের সাক্ষ্য মেলে। সুরের ব্যাপারে তা আরো সত্য। সকলেই জানেন স্বর-সপ্তকের কথা। শুদ্ধ ও বিকৃত মিলে বারটি স্বর অবলম্বনেই বিশ্বের সমস্ত সুরের সৃষ্টি। এই স্বরগুলি দীর্ঘদিনের ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছে। অতি আদিম জাতির সুর দু'টি কি তিন স্বরেই আবদ্ধ থাকতো। আজো ত্রিস্বরিক এবং চতুঃস্বরিক উপজাতীয় সুর পাওয়া যায়। মুণ্ডাদের ভূমিজ সম্প্রদায়ের গান শুনেছিলাম, তার সুর ত্রিস্বরিক। যেমন—

গা া া | সা গা া | রা রা া | সা া া | সা সা া | সা সা া | সসা া া |

আসামের বড়োজাতির গান চতুস্বরিক। যেমন (দ্রুতলয়)—

সা সা সা | গা রা া | রা রা রা | পা া া | গা গা া | রা রা া | প্‌ া া া |
সা সা সা | গা রা া | রা রা রা | পা-া-া | গা গা া | রা রা া | সা া া |

অধিকাংশ লোকসংগীতই পঞ্চস্বরিক বা ঔড়বজাতীয়। কিন্তু স্বরের আরোহণ,

অবরোহণ, সম্বাদী ও বিসম্বাদীর টানাপোড়েনে এক একটি জাতির লোকসংগীতে এমনি একটি melodic pattern বা সুর-নক্সা তৈরী হয় যে সেই বিশেষ জাতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে সেই সুরটি জড়িয়ে থাকে। যতোই তার নানারকমের গান থাকুক না—ঐ সুরটির ফ্রেম থেকে যেন সে বেরিয়ে যেতে পারে না। বিশেষ ভৌগোলিক সীমা ও ভাষানিবদ্ধ একটি জাতির সেটাই মূলসুর। আসাম উপত্যকায় যতো রকম গানই থাকুক তার প্রাণকেন্দ্র হলো বিহু। বিহু ঔড়বজাতীয়। সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা। স্বর, কোমলগান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ও কোমল নিখাদ। ধানিরাগের স্বরবিন্যাসের সঙ্গে এর সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। নেপালীদের যত গান আছে তা নীচের পর্দাগুলিকেই অনুসরণ করে :

সা রা মা পা ধা র্সা

হুবহু দুর্গারাগের পর্দায় তা পড়ে। যদিও চলনের ঢঙ কিছুটা পৃথক। কিন্তু বহু গোষ্ঠী ও উপজাতির মিলন ও সমন্বয়ে একটি ভাষানিবদ্ধ জাতি উপজাতিদের সুর সমন্বয়ে একটি বিশেষ melodic pattern-এর জন্ম দেয়। প্রাচীন সংহত গোষ্ঠী-সমাজের cohesion ভেঙে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে যে nationality গড়ে উঠে তার ধারা দ্বিবিধ। যেমন ভাষার দিক দিয়ে বিভিন্ন উপভাষা অতিক্রম করে একটি গৃহীত মাতৃভাষার সূত্রে একটি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়, পাশাপাশি তেমনি স্থানীয় উপভাষাগুলি নিজ প্রকাশভঙ্গীতে বেঁচে থাকে এবং উপরোক্ত ধারাকে সমৃদ্ধ করে। সংগীতের ক্ষেত্রেও national melodic pattern-এর মধ্যে zonal characteristics নিয়ে আঞ্চলিক লৌকিক প্যাটার্নগুলি বেঁচে থাকে। লোক-সংগীত গবেষকদের সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে :

বাংলাদেশের পুর্ববঙ্গের মূল মেলোডি হলো ভাটীয়ালী, উত্তরবঙ্গের তেমনি ভাওয়াইয়া, মধ্যবঙ্গের মূল গীতরীতি হলো বাউল। এখানে আমি বাউল দর্শনের কথা বলছি না, তার সুর-রীতির কথা বলছি। পূর্ববঙ্গেও বাউল আছে তবু ভাটীয়ালীর প্রভাবে তার নিজস্ব গীতরীতি হারিয়ে ফেলেছে। আর পশ্চিম প্রত্যন্ত রাঢ় বাংলার গীতরীতি—একে আমরা ঝুমুর রীতি বলতে পারি (যদিও তা বিচারসাপেক্ষ)। অবশ্য বাউল ভাটীয়ালী ও ভাওয়াইয়ায় যে ঐক্যসূত্র আমরা পাই ঝুমুরে তা পাই না। তার উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য বাংলা সুরের সাধারণ স্রোতে মিশে একটি ধারার সৃষ্টি করতে পারেনি।

বাংলাদেশের লোকসংগীতে একটা জিনিস লক্ষণীয়। তা হলো সপ্তস্বরের খেলা। তারও 'বন্দিশ' উপরোক্ত অঞ্চলগত ভাবে বিভক্ত; দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে

ভাটিয়ালীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। ভাটীয়ালীর সাধারণ রূপ হলো

সা রা মা—পা ধা ণা ধা পা ধা মা—পা মা গা রা স ণ্‌ ধ্‌—ধ্‌ সা—সা রা
গা—মা গা রা সা রা—সা।

প্রচলিত ঝিঁঝিট রাগের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যাহোক, ভাটীয়ালীর উপরোক্ত 'রাগে'র মধ্যে সিলেট, ত্রিপুরা, ময়মনসিং প্রভৃতি অঞ্চলে তার চলনের বিশেষ বিশেষ রূপ ও গায়কী নিয়ে ভাটীয়ালীর আঞ্চলিক নামকরণ করা যায়। পূর্ববাংলার কোন কোন অঞ্চলে ভাটীয়ালীতে অবরোহণে কোমল গান্ধারের স্পর্শ তাকে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। আবার কোন কোন অঞ্চলে উত্তরাঙ্গে টপ্পাঢঙে সূক্ষ্ম কাজ একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে। সাধারণত ভাটীয়ালীতে আস্থায়ী ও অন্তরা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না এবং খাদে ধৈবতের নীচে যায় না এবং সেখানে বিরতি নেয়। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে ভাটীয়ালীতে সঞ্চারীও দেখতে পাওয়া যায় যা খাদের পঞ্চম পর্যন্ত নেমে বিরতি নেয়। এ হলো ভাটীয়ালী 'রাগের' আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য। ভাওয়াইয়া অঞ্চলকেও এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন গোয়ালপাড়া ও কুচবিহার অঞ্চলের ভাওয়াইয়ার পার্থক্য। বাউলেও মধ্যবঙ্গের লালনশাহী এবং বীরভূমের বাউলের মধ্যে সুরের পার্থক্য লক্ষণীয়। আমাদের কানে যা বিহারের দেহাতী গান বলে পরিচিত তাদের কাছে তা মৈথিলী, মগধী ও ভোজপুরী 'ঘরানা'য় বিভক্ত। এই যে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লোকসংগীতের গায়কীর সেটাই প্রাণ। সেই প্রাণধারার বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখা আজ আমাদের একটি মৌলিক কর্তব্য। নগরের প্রতিকূলশক্তি এই বৈচিত্র্যকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হয়, লোকসংগীত থেকে যেমন রাগসংগীতের উৎপত্তি তেমনি রাগসংগীত লোকসংগীতকে চিরদিনই প্রভাবান্বিত করেছে। চর্যার কাল থেকে বাংলা দেশে যে রাগসংগীতের ধারা প্রবাহিত, সে সম্বন্ধে বলবার অধিকারী যাঁরা সেইসব গুণীব্যক্তিরা আলোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি সেই ধারা থেকে বাংলার লোকসংগীত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সমান্তরালভাবে চলেনি। চলতে পারে না। কারণ বাংলায় রাগসংগীতের বিকাশ দরবারী ঘরানায় আবদ্ধ ছিল না। পূর্ববঙ্গে ছোটবেলা থেকে আমরা দেখেছি বিয়েতে কিংবা কোন উৎসবে গ্রামের বাদ্যকর বা নাগার্চি শ্রেণীর শিল্পীদের বাঁশীতে বা সানাইতে চলতো বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর আলাপ ও বিস্তার। যাত্রাগানের বিবেক চিরদিনই বিশুদ্ধ রাগে গান করতো।

তাছাড়া লোকসংগীতের বাইরেও কিছু গ্রাম্য রচয়িতা ছিলেন যাঁদের রচিত গান গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঢাকার দ্বিজদাস কিংবা ত্রিপুরার মনোমোহনের কথা উল্লেখ করতে পারি। বিশুদ্ধ রাগরাগিণীতে তাঁরা গান রচনা করে গেছেন। তাঁদের রচিত সেইসব গান গ্রামের লোকের মুখে মুখে ছিল। তার প্রভাব আমাদের লোকসংগীতেও দেখতে পাই। সংগীতাচার্য সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় ভাটীয়ালীর সঙ্গে কসৌলী ঝিঁঝিট রাগিণীর সাদৃশ্যের কথা বলে বলছেন, বাংলাদেশে বিশেষত পূর্ববঙ্গের গীতরীতিতে ঝিঁঝিটের প্রভাব অসামান্য। এই কথা বলেই তিনি মন্তব্য করেছেন: 'আমাদের মনে হয়, এই শেষোক্ত প্রকার ঝিঁঝিটের মূল রয়েছে এই পল্লীসংগীতের মধ্যেই।' কাজেই নীচ থেকে লোক-সংগীতের বিকাশ এবং উপর থেকে রাগসংগীতের প্রভাব এই দুয়ের সমন্বয়ের সীমারেখা টানা খুব কঠিন। যাহোক বাংলাদেশের লোকসংগীতে ভৈরবী, দেশ, ঝিঁঝিট, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি রাগের প্রভাব পাওয়া যায়। কিন্তু যতোই তার প্রভাব থাক, লোকসংগীতের ছন্দ ও গায়কী তার নিজস্ব, এবং সেটাই তাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। তাকে কোন রাগিণী নিবদ্ধ সরগমে ফেলা যায় না।

লোকসংগীত এক জায়গায় বসে থাকে না। তা পরিবর্তনশীল। কিন্তু তার পরিবর্তনের একটা নিজস্ব ধারা আছে। বাইরে থেকে কেউ তা করতে গেলেই তা বিচ্যুত এবং বিকৃত হয়ে পড়ে। তাদের নিজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত তাদেরই আপন শিল্পী এক সামগ্রিক স্বীকৃতি ও অনুমোদনের মধ্যে অলক্ষ্যে এবং অচেতনভাবে সে পরিবর্তনের পথে কাজ করেন। বাইরে বসে কোন শিক্ষিত সুরকারের নিজের খুশিমতো লোকসংগীত সংস্কারের কাজে হাত দেবার কোন অধিকার নেই। কৃষিনির্ভর সমাজে ধনিকতন্ত্রী অর্থনীতি যে চরম অব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে তাতে লোকসংগীতে বিকৃতির অনবরত অনুপ্রবেশ ঘটছে। সেখানে পরিবর্তনের তত্ত্ব অনুসন্ধানের চেয়ে আত্মরক্ষাটাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে আজ।

এখানেই শহরের বিশেষ করে আকাশবাণী নিয়োজিত কিছু তথাকথিত লোকসংগীত রচয়িতার কথা বলতে চাই। তাঁরা কেউবা রচনা করেন কথা, কেউবা আবার সুর সংযোজনা করেন। 'পুরাতন' লোকসংগীতের পাশাপাশি এঁরা চালু করেছেন 'আধুনিক' লোকসংগীত। প্রথম কথা, লোকসংগীতে কথা ও সুরের রচয়িতা কখনো ভিন্ন হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, লোকসংগীতে জনতার যুগ আসার পরেও সুর সামগ্রিক সৃষ্টি হিসাবেই রয়ে গেছে—একক সুরদাতা কেউ হতে পারে না। ঐতিহ্যবাহী লৌকিকসুরে পরবর্তীকালে কোন কোন

পল্লীরচয়িতা নিজস্ব ঢঙ সৃষ্ট করেছেন। যেমন ময়মনসিংহের বিখ্যাত জালালের গান। আমরা ভাটীয়ালীতে একে জালালী ঢঙ বলি। কিন্তু মূলসুর লৌকিক সামগ্রিক সৃষ্টি। যদি গ্রামোফোন কোম্পানীর কোন লোকসংগীতের রেকর্ডে কিংবা আকাশবাণীর কোন লোকসংগীতে তথাকথিত রচয়িতা সুরে নিজের নাম ব্যবহার করেন তখন তা শুধু হাস্যকর অনৈতিহাসিক ব্যাপারই নয়, রীতিমত সামাজিক অপরাধ বলে আমি মনে করি। তাছাড়া এ ধরণের রচনাও অচল। প্রচলিত গানেরই সামান্য অদলবদল। শ্যামকে 'কালা' আর 'কালা'কে শ্যাম বলার মত। কেউ কেউ আবার গ্রাম্যভাষার সাথে সাধুভাষার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়ে শহরে লোকসংগীত রচনা করেন। আমাদের অফুরন্ত লোকসংগীতের ভাণ্ডার কি উজাড় হয়ে গেল? রেডিও ও গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষের এই যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ প্রয়োজন।

এবার লোকসংগীত পরিবেশন সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে চাই। যখনই মঞ্চ এবং মাইক এসে যায় তখনই মুক্তপ্রান্তরে গান গাইবার অবাধ ভঙ্গিটিকে সীমায়িত করার প্রশ্ন এসে যায়। তবু যে কয়টি উপকরণ লোকসংগীতকে জাতিচ্যুত হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করতে পারে সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হয়। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুরের ভাবানুষঙ্গ হিসাবে যে সব লৌকিক তার, শুষির, আনদ্ধ ও ঘন যন্ত্রের বিকাশ হয়েছে—যেমন একতারা লাউয়া, দোতারা, খমক, আড়বাঁশী, ঢোল, ঢোলক, খঞ্জনী, মন্দিরা প্রভৃতি—আজকাল শহরের লোক-সংগীতের আসরে প্রায় বর্জিত। তার স্থান গ্রহণ করেছে হারমনিয়ম ও তবলা। কমবেশী আমরা সবাই এ অপরাধে অপরাধী। হারমনিয়ম নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। কিন্তু লোকসংগীতের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি! লোকসংগীতের কতকগুলি শ্রুতির ও মীড়ের কাজ আছে যা হারমনিয়ম একেবারে নষ্ট করে দেয়। লোকসংগীতের একটা বিশেষ মুড্ বা মেজাজ আছে যার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হলো হারমনিয়ম। তবলার বেলাও সে কথা সত্য। ঢোলকের বা লৌকিক 'পারকাশন্' যন্ত্রের যে বোলবাণী—তবলার তা নয়। লৌকিক তালের ছন্দ তবলায় আসে না। সঙ্গে দোতারা বা একতারা বা লাউয়া থাকলে যে গ্রাম্য-পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় তা ব্যতিরেকে শুধু তবলা ও হারমনিয়ম লোকসংগীতে একটা sophistication বা নাগরিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার মাঝখানে লোকসংগীত আপন জলমাটি থেকে সহজেই বিচ্যুত হয়। শহরে তবলাবাদক পাওয়া যায়, ঢোলকবাদক বা দোতারাবাদক পাওয়া দুষ্কর। সেটাও

একটা অন্যতম কারণ বটে। কিন্তু তা বলে সহজে কাজ সারার নীতিকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমাদের গ্রামের গায়করা তাদের যন্ত্রেই নিজেদের স্কেল খুঁজে পান, কিন্তু আমরা হারমনিয়ম ছাড়া নিজেদের স্কেল পাই না। আমাদের কাছে আজ তা necessary evil হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্কেলের সাহায্যের জন্য হারমনিয়মকে পিছনে রেখে গায়ক নিজে একটি লাউয়া, একতারা কিংবা পারলে দোতারা নিয়ে বসলে এবং ঢোলক বা খমকে ছন্দ রাখলে তবু পরিবেশটা রক্ষিত হয়। কিন্তু তবলার রেলা আর হারমনিয়মের হুড়োর মধ্যে লোকসংগীতের যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটছে সেদিকে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের কর্তব্য। লোকগীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে লোকযন্ত্র চর্চারও সমধিক প্রয়োজন আজ দেখা যাচ্ছে।

এখানে আর একটা কথা বলতে চাই। সুরে আঞ্চলিকতা রক্ষা শুধু নয় আঞ্চলিক উপভাষার বিশেষ উচ্চারণভঙ্গিটি বজায় রাখার দিকে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। পূর্ববঙ্গে চান্ বা চান্দ-এর যে উচ্চারণ তাকে সাধুভাষায় চাঁদ বললে সমস্ত রসই নষ্ট হয়ে গেল। তারপর পূর্ববঙ্গে দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় নেই। আবার অনেক সময় 'ও'কার 'উ'কার হয়ে যায়। 'তুমার' জায়গায় সংশোধন করে 'তোমার' বললে হবে না। উত্তরবঙ্গের 'কয়া যাও'-কে 'কৈয়া যাও' বললে ভুল হবে। পূর্ববঙ্গের 'কেনে আইলাম'-কে 'কেন আইলাম' বললেও চলবে না। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই।

সংগ্রহ ও সমীক্ষা ঃ গ্রহণ ও বর্জন

আমরা সংগ্রহ করব সব কিন্তু গ্রহণ করব কি সব? আমাদের কাছে এটি একটি বড় প্রশ্ন। ঐতিহ্যবিচারে গ্রহণের সঙ্গে বর্জনের প্রশ্নও জড়িত আছে। সংস্কৃতিতে সমন্বয় যেমন আছে সংঘর্ষও তেমনি আছে। একথা মনে না রাখলে সমীক্ষা সঠিক হতে পারে না। লোকসংগীতে ওলাবিবি, বনদুর্গা, শীতলামাই থেকে শুরু করে অসংখ্য অপদেবতার স্তুতিগান আছে। এগুলি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু গানের সুরের মূল্যে এবং রচনায় সমাজচিত্রের দিক দিয়ে শুধু আমাদের তা বিবেচ্য। লৌকিক আচারের উপরে বহুস্থানে শাস্ত্রীয় আচার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণাধিপত্যে। লোকসংগীত জীবনমুখী, পৃথিবীমুখী। জীবন অসার, বা মানবদেহ অসার, এ হলো উপর থেকে চাপানো আমাদের লোকসংগীতের ঐতিহ্যের পরিপন্থী দর্শনচিন্তা। তাই উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়ার অপূর্ব মানবিক

আবেদনবাহী গানের মধ্যে যখন হঠাৎ শুনি—

হরি বলো মন রসনা
মানব দেহের গৈরব কইয়ো না।
এ দেহ মাটীর ভাণ্ড
ভাঙ্গিলে হইবে খণ্ডরে খণ্ড
ভাঙ্গিলে ভাণ্ড জোড়া লাগিবে না। —ইত্যাদি

তখনি খট্‌কা লাগে। 'বাংলার ব্রত' পুস্তকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন আমার মনে হয় সেই দৃষ্টিকোণই হবে আমাদের প্রধান পথ-প্রদর্শক। বাংলার ব্রতকথাকে লৌকিক ও শাস্ত্রীয়—দু'ভাগ করে তিনি খাঁটি ব্রত-কথাকে 'নৈবেদ্য ও দক্ষিণার লোভী ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত' থেকে উদ্ধার করেন। তিনি লিখেছেন: 'হিন্দুধর্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে লৌকিক ব্রতের চেহারা এমন অদলবদল হয়ে গিয়েছে যে, এখন যে ব্রতগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা অতি অল্প, এবং দু-চারটি ছাড়া সেগুলিও খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমরা পাই।' অবনীন্দ্রনাথ দুটি ব্রতের ছড়া তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। খাঁটি ব্রতকথা:

রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব
আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব॥

সেই সঙ্গে নিচের শাস্ত্রীয় প্রণাম মন্ত্র:

বসুমাতা দেবী গো, করি নমস্কার॥
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।

তুলনা করে অবনীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন: 'এই যে পৃথিবীর যা কিছু তার উপরে ঘোর বিতৃষ্ণা···এটা বেদেরও নয় ব্রতেরও নয়।'

অবনীন্দ্রনাথের যে বৈজ্ঞানিক এবং তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক দৃষ্টি বাংলার ব্রত বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, দুঃখের বিষয় তাঁর সমকালীন কিংবা পরবর্তী লোকসাহিত্য গবেষকদের মধ্যে তা পাই না। বর্ণসংঘাত ধর্মসংঘাত প্রভৃতির অন্তরালে যে শ্রেণীসংঘাতের পরোক্ষ ধারাটি লোকসংস্কৃতিতে প্রবহমান, সেদিকে কেউ দৃষ্টি দেন না। বাংলার প্রগতি লেখক ও শিল্পী আন্দোলনের প্রথম পর্বে ১৯৪৫ ইংরাজীতে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'সাহিত্যে প্রগতি' গ্রন্থে অসম্পূর্ণভাবে হলেও এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করেন। তিনি পাল-যুগের আলোচনা করে লেখেন: 'পরের যুগের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্যের ও গুণগরিমার চিহ্ন একেবারে মুছিয়া দিয়াছে। এখন 'ধান ভানতে মহীপালের গীত'-এর পরিবর্তে

'শিবের গীত' গাওয়া হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে দুঃখের সহিত বলা হইয়াছে,

জোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
শুনে সব লোকে আনন্দিত।...

'হাজার বৎসর পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধরাষ্ট্রিক প্রাধান্যের যে সব প্রতিভূ ছিল তাহার কোন চিহ্ন আজ নাই। ইহা হইতেছে ভীষণ শ্রেণীসংগ্রামের একটি নির্মম দৃষ্টান্ত। দশম শতাব্দীতে এই সংগ্রাম ধর্মসংগ্রামরূপে প্রকাশ পায়। বাংলায় ছড়া।

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে—
... ...
সাজতে সাজতে পড়ল সাড়া
সাড়া গেল বামুনপাড়া।

সেই সংগ্রামের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতেছে।'

ডঃ ভূপেন দত্ত বর্ণিত শ্রেণীসংগ্রাম যে কত সত্য তার প্রমাণ পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণাধিপত্যে এই ছড়া থেকে 'সাড়া গেল বামুনপাড়া' এই কলিটি একেবারে সেন্সরের কাঁচিতে গুম্ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ "লোকসাহিত্যে" এই ছড়ার যে কয়টি পাঠ লিপিবদ্ধ করেছেন কোথায়ও সেই কথাগুলি নেই। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'আগডুম-বাগডুম' এর আটটি পাঠ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য তারও কোথাও 'সাজতে সাজতে পড়ল সাড়া, সাড়া গেল বামুনপাড়া' এই দুই ছত্র নেই। সেই জায়গায় আছে, 'বাজতে বাজতে এল ডুলি, ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।' সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর "লোকসাহিত্যে" এ বিষয়ে মন্তব্য করেন: 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' এই ছত্রটির কোনো পরিষ্কার অর্থ আছে কিনা জানি না, অথবা যদি অন্য কোনো ছত্রের অপভ্রংশ হয় তবে সে ছত্রটি কী ছিল তাহাও অনুমান করা সহজ নহে।'......অথচ মূল ছত্র দু'টি থাকলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তার অর্থ উদ্ধার অতি সহজ হতো। যাহোক এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই আমরা 'পুনরুদ্ধার' ও পুনর্বিশ্লেষণের দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝতে পারি। বহু গান আছে যা আধ্যাত্মিক বা দেহতত্ত্ব বলে বলা হয় মূলত তা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রূপকের সাহায্যে পরোক্ষ প্রতিবাদ।

লোকসংগীত ও আন্তর্জাতিকতা

কিছুদিন আগে একটি বিশেষ লোকসংগীতের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তার সম্পাদক আমার কাছে আসেন সেই প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করতে। সেই

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা কয়েকজন অধ্যাপক। সেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঘোষণার প্রথম ছত্রেই আছে : 'বিষয়-বৈচিত্র্যে ও ভাব-ঐশ্বর্যে বাংলার লোকসংগীত ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের লোকসংগীত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।' আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম কোন মাপকাঠিতে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন ? বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যে উচ্চ ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল অন্যান্য প্রদেশের লোকসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি একেবারে অজ্ঞ। নিজের মনের বদ্ধমূল ধারণা ছাড়া কোন যুক্তিই তিনি হাজির করতে পারলেন না। সাহিত্যিক বিচার কিংবা সাংগীতিক বিচার যে কোন দিক দিয়েই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকসংগীত বাংলাদেশ থেকে নিম্নপর্যায়ের—একথা চিন্তা করা শুধু অজ্ঞতাপ্রসূত নয়, জাত্যভিমানজাত। যে বংলাদেশের বিদগ্ধ সাহিত্যে বা নাটকে 'কমিক রিলিফ' দেবার জন্য ওড়িয়া চরিত্র কিংবা বিহারী চরিত্র আনা হয়—সেই বাংলাদেশের কিছু লোকসংগীতদরদী বুদ্ধিজীবী নিজেদের লোকসংগীত সম্বন্ধে এ ধরনের দূষিত মারাত্মক ধারণা প্রকাশ করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের লোকসাধারণ তার সাহিত্যে এমনি জাত্যভিমানের পরিচয় দেয়নি কখনো। শত জাত-পাত ও ধর্মবিভক্ত সমাজে লোককবি গেয়েছেন :

নানা বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

বিভিন্ন সর্বভারতীয় সম্মেলনে আসাম থেকে আরম্ভ করে বাংলা বিহার উড়িষ্যা উত্তর প্রদেশ পাঞ্জাব গুজরাট রাজপুতনা মহারাষ্ট্র ভারতের কত প্রদেশের লোকসংগীত শুনেছি—ও বিস্ময়ে ভেবেছি একই প্রাণধারার কী বিচিত্র বর্ণাঢ্য অভিব্যক্তি ! সেখানে যে সুরের রামধনুটি রচিত হয় তাতে প্রত্যেক জাতি যে রঙ লেপন করে তার মেলোডির যে মেজাজ সে তার একান্ত নিজস্ব—অন্য জাতির চেয়ে তা নিম্ন না উচ্চ এ বিচার আসতেই পারে না। যদি কেউ বলেন বাংলা লোকসংগীতে সাতটি স্বরের খেলা কাজেই পঞ্চস্বর ঔড়বজাতীয় লোকসংগীত থেকে তা শ্রেষ্ঠ তাঁকে বলবো তাহলে ঔড়বজাতীয় মালকোষ রাগ সম্পূর্ণজাতি ইমন থেকে নিম্নশ্রেণীর। পাগল ছাড়া অন্য কেউ তা বলবে না। যাক পূর্বেই বলেছি বদ্ধমূল জাত্যভিমানজাত যা, তা যুক্তির ধার ধারে না। বিহারের কিছু ভোজপুরী গান আমার সংগ্রহের মধ্যে আছে। বাংলাদেশে শিক্ষিত সমাবেশে এ গান করে দেখেছি অনেকেই তাতে যতটা কৌতুক বোধে হাততালি দেন রসবোধে ততটা

নয়। ভাবটা যেন, বিদগ্ধ পরিবেশে ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, মুটিয়াদের গান—মজার ব্যাপারই বটে! অথচ কোলকাতা শহরে চলতে চলতে যদি কখনো লোকসংগীতের একক রেশ কানে আসে কিংবা সমবেত সমষ্টি আবেগমণ্ডিত লোকগীতি শুনতে পাই তা হলো হাড়ভাঙা পরিশ্রমের শেষে মিলিতভাবে গীত ঢোলক ও করতাল সমন্বিত বিহারের প্রাণস্পন্দিত দেহাতী গান; বাংলা লোকসংগীত তো কোলকাতায় বাঙালী বস্তিতে আর শুনতে পাওয়া যায় না। হোলীর সময় বসন্তের দুরন্ত প্রাণাবেগে গীত পূর্ববঙ্গের হোরী গান কোলকাতায় রঙ ছোঁড়াছুঁড়ির সময় আমরা শুনি না—আকাশবাণীতে ভদ্রসাজানো গান কয়েকটি ছাড়া, কিন্তু কোলকাতায় হোলীর সময় বিহারীদের হোলীগানে প্রাণ নেচে ওঠে। এ অভিজ্ঞতা আপনাদের সকলের আছে।

যাহোক আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং সমস্ত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ তা লোকসংগীতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ শুধু ভারত বা পাকিস্তান সম্পর্কে নয়। সারা বিশ্বের লোকসংগীত সম্পর্কে আমাদের হতে হবে এমনি শ্রদ্ধাপূর্ণ।

লোকসংগীতের ভবিষ্যৎ

আজকাল লোকসংগীত নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন: গরুর গাড়ির জায়গায় আজকাল রেলগাড়ি ও মোটরগাড়ি এসেছে। পরিবহনের সুব্যবস্থার ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের দূরত্ব ও ব্যবধানের সকল বাধা দূর হয়েছে। লোকসংগীত আগে ছিল নিরক্ষর পল্লীবাসীর রচনা। কিন্তু গ্রামে বর্তমানে দ্রুতগতিতে শিক্ষাসম্প্রসারণ ঘটছে।...তাই বিশ-পঁচিশ বছর আগেও বাংলার লোকসংগীতের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গী যে ধরনের ছিল আজকে তার কিছুটা পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আজকের লোকসংগীতের ভাব ভাষায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শ যেন ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেখানে চলতি কথায় বলতে গেলে হয়তো বলতে হবে কেমন যেন শহুরে শহুরে ভাব। এ ধরনের মন্তব্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যে ভাবের প্রাধান্য থাকে তাকে বিরূপতাই বলা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি বিরূপতার কারণ কিছু আছে এর মধ্যে? এই ধরনের চিন্তা লোকসংগীতের বিকৃতিরই সমর্থন করছে। কাজেই আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। পূর্বের আলোচনায় লোকসংগীতের সংকটের যে রূপটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি, উপরোক্ত বিশ্লেষণটি ঠিক

তার বিপরীত। গ্রাম ও শহরের দূরত্ব পরিবহনে কমে আসলেও আর্থিক বণ্টনে সে দূরত্ব বেড়ে গেছে অনেক। পল্লীতে শিক্ষার জৌলুস উপরে উপরে সংখ্যাতত্ত্বে কিছুটা বাড়লেও অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকার বেড়েছে অনেক বেশী। নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা এক জিনিস নয়।

পল্লী আগেরই মতো কৃষিনির্ভর এবং কৃষকসমাজে যদি কোন পরিবর্তন এসে থাকে তবে তা পরিবর্তন না বলে বলা উচিত বিপর্যয়। সাংস্কৃতিক দিক থেকে যদি কিছু পরিবর্তন এসে থাকে তবে গ্রামে গ্রামে সংস্কৃতির পুরাতন মাধ্যম যাত্রা-কথকতার চেয়ে আধিপত্য হাটে বা গঞ্জে সিনেমা ভবনগুলির—যেখান থেকে বিকৃত রুচি আজ পরিবেশন করা হচ্ছে। পরিবর্তন বলে যাকে বলা হয় তা হলো অরাজকতাপ্রসূত বিকৃতি। সেই কথা বলেই আজকের এই আলোচনা শুরু করেছিলাম।

জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের দুটি প্রধান ধারা। আপাতদৃষ্টিতে তা পরস্পর বিপরীত। কিন্তু এই বৈপরীত্যের ঐক্যই সুষ্ঠু বিকাশের গতিবেগ সৃষ্টি করে। একটি ধারা কেন্দ্রাতিগ (centrifugal), অন্যটি কেন্দ্রানুগ (centripetal)। ভারতবর্ষের মতো বহুভাষা, বহুজাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত দেশের পক্ষে এ আরো সত্য। উচ্চাঙ্গসংগীত, নৃত্য ইত্যাদির যেমন একটা সর্বভারতীয় কেন্দ্রমুখী রূপ আছে, তেমনি লৌকিক ঐতিহ্যের রূপটা কেন্দ্রাতিগ আঞ্চলিকতামুখী বৈশিষ্ট্য নিয়েই বিকশিত হচ্ছে। আমাদের দেশের অগণিত জনসাধারণ যেদিন সত্যি সত্যি নিজেদের ভাগ্যবিধাতা হবে সেদিন তার সংস্কৃতির বহুবিচিত্র সহস্রদল বিকাশ দেখে একতন্ত্রীরা প্রতিবাদ করতে পারেন কিন্তু ভারতের সেটাই সত্যিকার ভবিষ্যৎরূপ। বহু উপজাতি ও খণ্ডজাতি নিজেদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ফিরে পাবে। বহু হারানো লৌকিক ঐতিহ্যের দিকে চোখ ফিরবে। আজকের অরাজক ধনতান্ত্রিক বিকাশে লোকসংগীতে যেটুকু বিকৃতি এসেছে তা থেকে তাকে মুক্ত করার সংগঠিত প্রয়াস চলবে। আজ চারিদিকে বিভিন্ন ভাষার দাবী দেখে যাঁরা ভারতের বিভক্তির ভয় পাচ্ছেন তাঁরা জাতি বিকাশের এই স্বাভাবিক ধারাটিকে স্বীকার করেন না। হিন্দীভাষাভাষীর বিহার বলে যাকে আমরা জানতাম তার মধ্যে আজ ভোজপুরী, মগধী ও মৈথিলী ভাষার সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে।

ভাষার বিকাশের সাথে আমি সংগীতের বিকাশের ধারা মেলাতে চাইছি না। ভাষার সমস্যা আরো জটিল এবং স্বতন্ত্র। লোকসংগীতের যে স্বাভাবিক বিকাশ

ঔপনিবেশিক কৃষিব্যবস্থায়, শিক্ষিতের উন্নাসিকতায় ভ্রান্ত মূল্যবোধে নিরুদ্ধ হয়েছিল, বিশেষত ধনতান্ত্রিক অসম বিকাশে যে অনুন্নত উপজাতিগুলি উন্নত জাতির মধ্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল, আজকের সমাজব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যেদিন এদেশে সত্যি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে তখন নিজেদের হারানো ঐতিহ্যকে উদ্ধারের জন্য নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশের পথে এক বিরাট পদক্ষেপ শুরু করবে। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েটে অসংখ্য জাতি ও উপজাতির সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশের খবর আপনারা জানেন। সেখানে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তখন চলছিল অতিদ্রুত গতিতে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ। কাজেই 'গরুর গাড়ির জায়গায় রেলগাড়ি' আসার সঙ্গে সঙ্গেই লোকসংগীতে কিন্তু রেলের সিটি শুনা যায়নি। বিশেষত সদ্যোমুক্ত ঔপনিবেশিক এবং অর্ধ-ঔপনিবেশিক এশীয় দেশগুলি সম্বন্ধে তা আরো সত্য।

পাশ্চাত্যের কোনো কোনো ধনতান্ত্রিক দেশে যন্ত্রশিল্পের সামগ্রিক বিকাশের জন্য লোকসংগীত প্রায় গবেষণারই বস্তু হয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু আমাদের দেশ এখনো একান্তভাবে কৃষিনির্ভর এবং সেই কৃষিতে 'মেকানাইজেশন' কিছুই হয়নি। আজো আমাদের পল্লী অঞ্চলে অসংখ্য গানের জন্ম হচ্ছে। শুধু গানের নয়, উপকথার এবং গীতিকারেরও। মাত্র কিছুদিন আগে সমস্ত পূর্ববঙ্গে ঝড়ের গতিতে যে গীতিকাটি জনচিত্ত তোলপাড় করেছিল সে হলো 'রূপবান'। কে তার রচয়িতা কেউ জানে না, অথচ এ গীতিকা বা 'পালা গান' শোনেনি এমন লোক পূর্ববঙ্গে পাওয়া যাবে না। তারও কয়েক বৎসর আগে ঠিক এমনিভাবে 'গুনাইবিবির' গান ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রেমোপাখ্যানমূলক গীতিকাগুলি পাকিস্তানে মোল্লাদের এবং তাদের চাপে সরকারের আক্রমণের বস্তু হয়েছিল। সে খবর হয়ত আপনারা জানেন। কাজেই ফোক্‌লোর সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের গবেষক চার্লস ফ্রান্সিস পটারের উক্তি উদ্ধৃত করে: Folklore is a lively fossil, which refuses to die—অর্থাৎ লোকযান হচ্ছে 'মৃত অ-মৃত' বলে যাঁরা সংজ্ঞা দেন তাঁদের এই সংজ্ঞা আমাদের দেশে প্রযুক্ত হতে পারে না। লোকসংগীত গবেষণা ময়নাতদন্ত নয়। এ জীবন-বিজ্ঞান।

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ভবিষ্যতে যেদিন বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে শ্রেণীহীন সমাজে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য থাকবে না, কৃষি ও শিল্পের তফাত ঘুচে যাবে, কাঠের লাঙল এবং পালের নৌকা হবে মিউজিয়মের বস্তু, manual labour এবং intellectual labour—কায়িক ও মানসিক শ্রম বলে শ্রমের দুই সংজ্ঞা

থাকবে না, সেদিনও কি বিদগ্ধ সংগীত ও লোকসংগীতে কোন পার্থক্য থাকবে? এ প্রশ্ন আমাদের আজকের সমস্যার অন্তর্গত নয়। এর আলোচনা হবে নেহাত তত্ত্বগত, এবং abstract। আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন বিতর্ক উঠলে আমরা তা থেকে লাভবানই হবো, কিন্তু আমার বক্তব্য হলো, এই প্রশ্ন আজকের কোন শিক্ষিত লোকসংগীত গায়ক বা রচয়িতাকে যদৃচ্ছা পরীক্ষা ও নিরীক্ষার স্টীমরোলার চালাবার অধিকারী করে না।

চাঁদে মানুষ পৌঁছাবে বলে চকোরের দুশ্চিন্তার আপাতত কোন কারণ নেই।

বাংলা লোকসংগীতের সংকটের স্বরূপ

আমাদের দেশে লোকসাহিত্যের আলোচনা যতটা হয়েছে, সে তুলনায় লোক-সংগীতের আলোচনা হয়নি বললেই চলে। আবার সংগ্রহ যতটা হয়েছে, সমীক্ষা সে তুলনায় মোটেই হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা একাডেমি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের প্রকাশিত বই হিসেব করলে সংগ্রহটা নেহাত কম নয়। কিন্তু লোকসংগীতের আলোচনা কতটুকু হয়েছে? অথচ লোকসঙ্গীতে সাহিত্য ও সঙ্গীত অবিভাজ্য। একটা ছাড়া আরেকটার মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ এবং এতে লোকসংগীতের চরিত্রনিরূপণ ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে উইলিয়াম জন টমস্ ফোকলোর শব্দটি ব্যবহার করে লোকসংস্কৃতির চর্চার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। কিন্তু এই শব্দটির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছিল না। Popular Antiquities বা পুরাতনী বিদ্যা হিসাবেই শব্দটির ব্যবহার হতো। ইংলণ্ডে ফোকলোর সোসাইটি গড়ে ওঠে ১৮৭৮ সনে। স্যার লরেন্স গোম্ ও উইলিয়াম টমস্ হন তার কর্ণধার। তারপর এ ধরনের ফোকলোর সোসাইটি ইউরোপের স্থানে স্থানে গড়ে উঠতে থাকে। এর পশ্চাৎপট ছিল গণজাগরণ ও গণচেতনা। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মার্কস্ ও এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশিত হয় ইওরোপের ব্যাপক শ্রমিক অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। ইউরোপে শ্রমজীবী মানুষের এই জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে যদি ফোকলোর আন্দোলনকে না দেখি তবে তার সঠিক ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না। রাজারাজড়ার উত্থানপতনের লিখিত একাডেমিক ইতিহাসের পাশাপাশি শ্রমজীবী জনগণের অলিখিত ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসছে শ্রুতি ও স্মৃতির oral literature-কে অবলম্বন করে। হঠাৎ সেই নির্বিশেষ মানুষগুলি যখন সংঘবদ্ধ শ্রেণীচেতনায় অত্যন্ত সবিশেষ হয়ে ওঠে, তখনি তাঁদের অলিখিত লোকসাহিত্য শিক্ষিত নাগরিক বুদ্ধিজীবীর চেতনার দুয়ারে আঘাত হানে।

যাহোক, ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতির অধ্যয়ন যতই হোক, উনবিংশ শতাব্দীতে কিন্তু folk music বা লোকসংগীত কোনো স্বীকৃতি পায়নি। ইউরোপের সেসময়কার ধ্রুপদী সঙ্গীতের দিকপালরা লোকসগীতের থেকে রসদ

আহরণ করলেও লোকসংগীত তখনও স্বাধীন স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই পথে সত্যিকারের পথিকৃৎ হলেন সেসিল শার্প (Cecil Sharp)। ইংলণ্ডে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে সেসিল শার্পের আবিষ্কার—আবিষ্কারই বলবো—এক রীতিমতো সাড়াজাগানো ঘটনা। এর আগে ইংরেজ জাতির যে কোনো লোক-সংগীত আছে তা ইংলণ্ডে কেউ স্বীকার করতেন না। বিদগ্ধমহল lower classes-এর music-কে low class music বলে ভাবতেন—যা তাঁরা art music-এর vulgarisation বলেই মনে করতেন। কিন্তু সেসিল শার্প সমারসেটে এবং উত্তর আমেরিকার সেই অঞ্চলের লোকের আদিবংশধরদের মধ্যে দীর্ঘকাল অসীম অধ্যবসায়ে সংগ্রহ ও গবেষণা করে প্রায় ৫০০০ গানের নিজের হাতে স্বরলিপি করে ইংরেজি লোকসংগীত সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত ১৯০৭ সনে প্রকাশ করেন, তখন থেকেই সংগীতের এক বিশেষ শাখা হিসাবে লোকসংগীত ইংলণ্ডের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো।

সেসিল শার্পের পূর্ববর্তী কার্ল এঙ্গেল যাকে national music আখ্যা দিয়ে common people-এর সঙ্গীত বলতে চেয়েছিলেন, সেসিল শার্প তাকে জার্মান শব্দ volkslied-এর অনুবাদ করে folk song বলে চিহ্নিত করেন; এবং সাধারণ মানুষের গান না বলে স্পষ্ট করে peasant masses বা কৃষকশ্রেণীর সংগীত বলে সংজ্ঞা দেন। সেসিল শার্প ছিলেন সমাজতন্ত্রী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং শোষিত শ্রেণীর সংগীতের জন্য সমর্পিতপ্রাণ।

আমাদের দেশের লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেশ সেন প্রমুখ মনীষীরা লোকসাহিত্য ও সংগীতের অনুসন্ধানের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন গ্রামীণ মেহনতী মানুষের নবজাগরণ থেকে। সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে এযুগের প্রথম পাদ হতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় মুক্তি আন্দোলন—সেই অনুপ্রেরণার পটভূমিকা রচনা করেছিল।

এটা খুবই লক্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক গানের অধিকাংশতেই লোকসংগীতের সুর কেবল নয়, বাচনভঙ্গিও ব্যবহার করেছিলেন। এর আগে বিভিন্ন কৃষিবিদ্রোহের ও আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় গ্রাম্য কবিরা তাঁদের নিজস্ব সুরে গান ও ছড়া লিখেছেন গণমনের প্রতিধ্বনি হিসাবে। কিন্তু নাগরিক সাঙ্গীতিক-জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম অত্যন্ত সচেতনভাবে লোকসংগীতের খাঁটি সুর আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। এর

পেছনেও কাজ করেছিলো বিরাট গণজাগরণ। ত্রিশোত্তর বাংলায় আব্বাসউদ্দীন, শচীন দেববর্মণ এবং অন্যান্য অখ্যাত গ্রাম্যগায়কের জনপ্রিয়তা, তাঁদের রেকর্ডের অভূতপূর্ব চাহিদা প্রথম যুদ্ধোত্তর ভারতে গণজাগরণেরই সাক্ষ্য বহন করে।

রবীন্দ্রনাথই ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি লোকসংগীতের সাংগীতিক বিশ্লেষণ করে আমাদের পথ অনেকটা আলোকিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি লোক-সাহিত্য ও লোককাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিয়েই আলোচনা করেছেন বেশি এবং এর প্রয়োজনও ছিল অভিজাত সাহিত্যের রসপায়ী বিদগ্ধ শ্রেণীর ভ্রান্ত ধারণা বা অজ্ঞতা দূর করতে। তাছাড়া তখনো লোকসংগীতের সংগ্রহ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন শোষিত শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে অনাবিষ্কৃত জনসমুদ্রের সন্ধান আমাদের দিলেন। তিনি তার সাহিত্যিক গভীরতায় ডুব দিয়ে আমাদের জন্য মুক্তাভরা অনেক ঝিনুকের সন্ধান দিলেন। কিন্তু তিনিও সাংগীতিক বিচারের দিকে যেতে পারলেন না। তিনি সংগীতবিদ্ ছিলেন না এবং সে সময় টেপরেকর্ডারও ছিল না সত্য, কিন্তু তবু তিনি ময়মনসিংহ-গীতিকা ও অন্যান্য পূর্ববঙ্গগীতিকা কী সুরে গাওয়া হতো তার অতি সামান্য নমুনাও যদি রেকর্ড করিয়ে যেতে পারতেন তবে আমাদের কাজ অনেক এগিয়ে থাকতো।

তাঁর পরবর্তী যেসব পণ্ডিত ময়মনসিংহ-গীতিকার প্রামাণিকতা ও মৌলিকতা অস্বীকার করেছিলেন, তাঁদেরও অপচেষ্টার হাতে হাতকড়া পড়ত। পূর্ববঙ্গের ব্যালাড বা পালাগানের সুরগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গানের ভাঙা ভাঙা কলিকে আশ্রয় করে ছড়িয়ে ছিলো। আজও সব লুপ্ত হয়ে যায়নি। 'বাদ্যার গান' বা বাদ্যার সুরের সঙ্গে আমরা পরিচিত। জলের ঘাটে মহুয়া ও নদেরচাঁদ ঠাকুরের কথোপকথনকে অবলম্বন করে এই সুরটি যখন কোনো গ্রাম্যগায়কের কাছে শুনেছিলাম, তখন জানতাম না এটা ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তগত মহুয়াগীতিকার একটি অংশ। কিন্তু যে কলিগুলি প্রথমে শিখেছিলাম তার কয়েকটি কলি দীনেশচন্দ্র সেনের প্রেরণায় চন্দ্রকুমার দের সংগৃহীত গীতিকাটিতেও নেই। যেমন

মহুয়া : পুরুষ বেঙের জাতি ফালে ফালাও পাও
সাপের মাথার মণি দেইখ্যা হাত বাড়াইতায় চাও।
নদেরচাঁদ ঠাকুর : সাপও মারবাম সাপিনী মারবাম মণি লইবাম হাতে
যমের হাতো প্রাণটি থৈয়া প্রেম করবাম তোর সাথে।

সুরটাও লক্ষণীয়—ভাটিয়ালীর প্রভাবে আচ্ছন্ন পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতের ধারার মধ্যে এই সুরটি এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভ্রাম্যমান বেদে জাতিরই যেন সাক্ষ্য

বহন করছে। এই সুরের ধারা অনুধাবন করে অগ্রসর হলে দুসান জ্‌বাভিত্তেল প্রমুখ পণ্ডিতদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেতো।

যাই হোক, যা বলতে চেয়েছিলাম, লোকসংগীতের সাংগীতিক বা musico-liogical characteristics-এর বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা লোকসংগীত গবেষণাকে পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। লোক-সংগীতের কয়েকটি সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই আজ প্রধানত আলোচনা করতে চাই। তাহলে লোকসংগীতের বিকৃতির স্বরূপটা ধরতে আমাদের সুবিধা হবে, কারণ বিকৃতিটা আসছে প্রধানত সংগীতের দিক দিয়েই।

লোকসংগীতের কয়েকটি গোড়ার কথা

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে সেসিল শার্প Continuity—Variation—Selection এই যে তিনটি Principle নিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন—তারই ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে International Folk Music Council যে সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করেছেন, একটু দীর্ঘ হলেও আমাদের তা স্মরণে রাখা প্রয়োজন: 'Folk music is the product of a musical tradition that has been evolved through the process of oral transmission. The factors that shape the tradition are: (i) Continuity which links the present with the past; (ii) Variation which springs from the creative impulse of the individual or the group; and (iii) Selection by the community, which determines the form or forms in which the music survives.

The term can be applied to music that has been evolved from rudimentary beginnings by a community uninfluenced by popular and art music and it can likewise be applied to music which has originated with an individual composer and has subsequently been absorbed into the unwritten living tradition of a community.

The term does not cover composed popular music that has been taken over ready made by a community and remains

unchanged. for it is the re-fashioning and recreation of the music by the community that gives it its folk character."

ঐতিহ্য—উদ্ভাবন—নির্বাচন এই তিনের সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক ধারণাই আমাদের বিশ্লেষণের পথ-নির্দেশক।

আর্ট মিউজিক বা অভিজাত সংগীত থেকে লোকসংগীতের তফাত এইখানেই। আর্ট মিউজিক সচেতন ব্যষ্টিপ্রতিভার সৃষ্টি, লোকসংগীত সমষ্টি-সৃষ্টি।

সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের প্রকাশ হয় সুর বা সুরাংশকে অবলম্বন করে। হয়তো সে সুর দুটো স্বর বা তিনটে স্বরকেই কেবল আশ্রয় করে। ঠিক যেমন ভাষাশিক্ষার পথে শিশুর অর্ধস্ফুট বুলি। কিন্তু এই স্বরগুলিকে আমরা কোনোদিন সংগীতের পাতে তুলতে চাইনি। মিলিত শ্রমজীবনের ছন্দ থেকেই শ্রমের synchronisation-এর সুরের ও তালের উৎপত্তি। তারপর বিভিন্ন শ্রমবিভাগের ভাবে সুরেরও বিভাগ ও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। আজো শ্রমের synchronisation-এর সুর শুনতে পাওয়া যায়। শুনুন :

মার যোয়ানা—হেইও
জোরসে খিঁচো—হেইও
সাবাস বাহাদুর—হেইও···ইত্যাদি।

সা া া। া-প্‌া প্‌া। সা া-া। া া া।

দ্বিস্বরিক এই ধ্বনিসমষ্টির মধ্যেও যে সুর জাগে তা শুধু synchronisation of labour-process বা শ্রম-সমন্বয়ের ব্যাপারই নয়, এর মধ্যে যেন magical act-ও আছে। তারই উন্নত রূপ ছাদপেটানো গান বা সারিগান প্রভৃতি। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষা ও আকৃতিটিও কিন্তু সুরাশ্রয়ী—যেমন মেয়েদের লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ :

দোল পূর্ণিমার নিশি, নির্মল গগন
মৃদুমন্দ প্রবাহিত মলয় পবন
লক্ষ্মীসহ একাসনে বসি নারায়ণ
কৌতুকে করিছে কথা নানা আলাপন।

প্‌া সা সা সা। সা সা রে রে
দো ল পূ র্ণি মা র নি শি
সা রে রে রে। সা নি্‌ নি্‌ নি্‌।

নির ম ল গ   গ ০ ০ । ন
রে ম্ম ম্ম ম্ম ।   গা গা রে সা ।
মৃ দু ম ন্দ   প্র বা হি ত
সা রে রে রে ।   রে — — — ।
ম ল য় প   ব — — ন

গ্রামে আমাদের বাড়ির পাশে ছেলেহারা এক কিষানী মাকে তাঁর ছেলে উপেনের জন্য কাঁদতে শুনতাম। কাঁঠাল গাছের গোড়ায় বসে ভোরবেলায় তিনি যখন কাঁদতেন তা থেকে একটি স্বর বেরোত—স্বর ধরেই যেন তিনি কাঁদতেন, কান্নায় refrain ছিল 'ও আমার বাবাধনরে ডাকিয়া'—তখন তার মধ্যে স্বরের সন্ধান কেউ করলে অবশ্যই হাসতাম। কিন্তু আজ যখন সেই কান্নার স্বরটি মনে আসে তখন মনে হয় ভাটিয়ালীর একটি ক্ষীণ-ভ্রূণেরই কান্না আমার কানে ভেসে আসছে আজও।

মাঘ মাসে ধানকাটা হয়ে গেলে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে কোনাকুনি পায়ে পায়ে পথ তৈরি হতো। সেই পথে যেতাম গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলে। মাঠের মাঝখানে একটি বড়ো শেওড়া গাছ ছিল। তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দিনের বেলাই গা চমছম করতো। কারণ সেই গাছে নাকি অনেক 'দেবদেবীর ভর' ছিল। মেয়েরা বলতো 'রূপসী গাছ'। বিশেষত নবজাত শিশুর মঙ্গল-কামনায় রূপসী ঠাকুরাণীর কাছে গান গেয়ে গেয়ে মেয়েরা আসতো: 'রূপসীর দরিশনে যাইবায়নি গো সই।'

সা গা গা গা রে গা সা 'র রে সা নি্ ধ্ া
রূ প — সী — র দ রি — শ নে —
ধ্ া সা সা সা গা সারে সা— — — — —
যাই বা ই নি গো — সই— — — —

গাইবার চেষ্টা করতাম না। কেননা এগুলিকে গানই ভাবতাম না। কিন্তু কানে কানে স্বরটা মনে গাঁথা হয়েছিল। অনেকদিন পর আসামে মেয়েদের বিয়ানাম শুনে ছোটবেলাকার সিলেটের গ্রামাঞ্চলের সেই 'রূপসী'র গানের সাদৃশ্যে চমকে উঠি:

'প্রথম প্রহর রাত্রি ফুলি আছে চম্পা
উঠা রাধা গুণবতী তুলি বন্ধা খোপা।

ধ্‌া সা সা সা সাগা—রে গা সা রে
প্র থ ম প্র হ°—র—রা—
সা ধ্‌া সা রে গা রে সা ধ্‌া ধ্‌া সা
তি—ফু লি ই য়া ছে এ চম্‌ পা

প্রত্যেক মা-ই কিন্তু শিশুকে ঘুম পাড়াবার সময়ে হন অসচেতন গায়িকা। মাতৃত্বের গভীরতম আকুতি আন্দোলায়িত এই সব ঘুমপাড়ানীর মধ্যে :

ধন ধন ধন চম্পাফুলের বন,
এই ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন।

ধ্‌া ধ্‌া ধ্‌া	সা সা সা	রে গা গা	— — —
ধ ০ ন	ধ ০ ন	ধ ০ ন	০ ০ ০
গা গা্ রে	গা রে রে	সা সা সা	— — —
চ ম্‌ পা	ফু লে র	ব ০ ন	০ ০ ০
গা গা গা	পা পা পা	ধা ধা নি	ধা পা পা
এ ই ধ	ন যা র	ঘ রে ০	নাই ০
গা গা রে	গা রে রে	সা সা সা	সা সা সা
বৃ ০ থা	ই জী ০	ব ০ ন	০ ০ ০

একটি অসমীয়া নিচুকনি অর্থাৎ ধুমপাড়ানীয়া শুহুন :

আমারে মইনা শুবএ
সোনালী ধাননি দাবএ
ন' চাউলেরে চিড়া ভাজি দিম
বাটি ভরি ভরি খাবএ...

বেশিদিন আগের কথা নয় যখন আসামের শিক্ষিত সমাজ এগুলিকে গানের মর্যাদা দিত না। এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকে আসামের যুগস্রষ্টা জ্যোতিপ্রসাদ এই মেয়েলী গানের সুরকে আশ্রয় করেই আসামে আধুনিক অসমীয়া গানে যুগান্তর আনেন।

আমাদের সংগীতশাস্ত্রকাররা একটি স্বর, দুটি স্বর, তিনটি স্বরকে অবলম্বন করা সুরকে আর্চিক, গাথিক, সামিক ইত্যাদি বলে যে বিভাগ করেছেন তার রূপচিত্র আমি জানি না—তবে লোকসংগীতের শৈশবের ছড়ানো টুকরোগুলিতে আজও তার সাক্ষ্য মেলে। শিশুর অস্ফুট বুলিগুলি যেমন ভাষায় রূপ নেয়, তেমনি এই সুরের টুকরোগুলি ক্রমশ পরিপূর্ণ সংগীতের রূপ নেয়। লোকসংগীতের ব্যাপারেই

এই কথাটি কেবল সত্য নয়, আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সৌধটিও দাঁড়িয়ে আছে এই মূল ভিত্তিটির উপর। তবে উচ্চাঙ্গ সংগীতের superstructureটি সচেতন ভাবে ব্যাকরণভিত্তিক, codified।

পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন নৈনীতালের কাছে ভাওয়ালী পাহাড়ে স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলাম। পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্থানীয় গাড়োয়ালী মেয়েরা ঘাস কাটতো আর গুনগুন করে গান গাইত। একই সুর, কিন্তু মন টেনে নিতো। প্রায় ছয় মাস ধরে বারে বারে শুনে এক মুহূর্তের জন্যও একঘেয়ে মনে হতো না। যেন পাহাড়ী ঝিঁঝিঁর ডাক। এই ভালোলাগার কারণ কী জানতাম না। ভাবতাম হয়তো রুগ্নশয্যার নিঃসঙ্গতা আর হিমালয়ের মন কেড়ে-নেয়া প্রাকৃতিক পরিবেশই এর কারণ। সেই স্বাস্থ্যনিবাসে থাকতেন লক্ষ্ণৌ-এর একজন সংগীতবিশারদ। সেই গাড়োয়ালী সুরে আমার অনুরাগ দেখে তিনি আমাকে বললেন—এ তো দুর্গারাগের ঠাটে বাঁধা। একটি কলিতেই সুরটা বাঁধা ছিল—আর একটি কলিই আমার মনে ছিল—

"সৌরেকী পিরুলি পাধানি
পানি পী যা পানি।"

ধ্‌। সা সা সা সা সা ধা ধা ধা ধা
সৌ রে কী পি রু লি পা। ধা নি • •
মা পা। ধা পা মা রে সা। ধ্‌। সা
পা • নি পী • • যা পা। নি

যাহোক আমার সেই সংগীতজ্ঞ বন্ধুটি কিন্তু আমার সামনে এক জগৎ খুলে দিলেন। রুশ ধ্রুপদী সংগীতের পিতা গ্লিংকা-র সেই অমর বাক্যটির তাৎপর্যও যেন প্রথম আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হলো: 'It is the people who create music. We only arrange it.'

লোকসংগীতের অলিখিত নিয়ম

লোকসংগীত যতই স্বতঃস্ফূর্ত বা অসচেতন হোক, তার কতকগুলি unwritten laws বা অলিখিত নিয়মাবলী আছে। সেই নিয়মাবলীর মধ্যে সবচেয়ে মুখ্য বলে যে নিয়মটিকে আমি মনে করি তা হলো আঞ্চলিকতা।

"আঞ্চলিকানা": রাগসংগীতে আমরা ঘরানা কথাটা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু লোকসংগীতে কোনো ঘরানা নেই, আছে 'বাহিরানা'। একে আমি বলি

আঞ্চলিকানা। ঘরানা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পরিবারকেন্দ্রিক। কিন্তু লোকসংগীত গুরুমুখী বা বিদ্যালয়মুখী নয়। ঘরে বসে রেওয়াজ করে লোকসংগীত আয়ত্ত করা যায় না। একটা বিশেষ অঞ্চলের জনসমাজের জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকালের identification সেজন্য প্রয়োজন। লোকসংগীতের স্টাইলটা আঞ্চলিক জীবনধারা থেকে উদ্ভূত। এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে একটা বিশেষ স্বরসমষ্টি বা ঠাটকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গে মিশেছে আঞ্চলিক কণ্ঠভঙ্গি এবং পারি-ভাষিক উচ্চারণভঙ্গি। ভাষাভিত্তিক কোনো রাজ্যকে যান্ত্রিকভাবে নিয়ে এই অঞ্চলবিভাগ হয় না। যেমন বাংলাদেশকে মোটামুটি আমরা সুরের দিক থেকে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ এভাবে বিভাগ করি। গানের কথায়, ভাবে, এমনকি ভাষায়ও তফাত ততটা পাই না—পরিভাষার ছাপটাও সবসময় ততটা থাকে না, কিন্তু সুরের ছাপ অতি স্পষ্ট। সুরে আবার এইসব অঞ্চল বা region-এর / sub-region-এর ছাপটাও লক্ষণীয়, যেমন পূর্ববঙ্গের সাধারণ 'রাগ' ও স্টাইল মুখ্যত ভাটিয়ালী। আবার সেখানেও সূক্ষ্ম আঞ্চলিক ছাপ পাওয়া যায়। যেমন ময়মনসিংহের ভাটিয়ালী এবং ত্রিপুরা-সিলেটের ভাটিয়ালীর মধ্যে ঢঙের বা স্টাইলের পার্থক্য পাওয়া যায়। দুটি গান শুনুন :

আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কার জানে জানাই
সুখের স্বপন ভাঙলোরে চুরাইবাজারে।
ভাইরে ভাই···১৩৫০-এর কথা
মনে কি কেউর পড়ে—রে
মনে কি কেউর পড়ে
ক্ষুধার জালায় বুকের ছাওয়াল
মায়ে বিক্রী করে রে—
চুরাইবাজারে···ইত্যাদি ॥

ময়মনসিংহের এই ভাটিয়ালীর উত্তরাঙ্গের পুকারের আকৃতিটা লক্ষ্য করুন। এবার সিলেট-ত্রিপুরা অঞ্চলের একটি বিশেষ ধরনের ভাটিয়ালী শুনুন :

গুরু কি ধন, চিনলায় না মন দেখলায় না ভাবিয়া
মন পাগলারে—
সাধের জনম যায়রে গইয়া
খেলছরে মন দাবা পাশা

তাতে মন কইর‍্যাছ খাসা
নিজের বাসা আগে না বান্ধিয়া ;
সোনা থৈয়া রাঙের বেপার রে
মন করলাম কার লাগিয়া···ইত্যাদি ॥

ভাটিয়ালী সাধারণত শুদ্ধগান্ধার দিয়েই ওঠানামা করে, কিন্তু এখানে অবরোহণে কোমলগান্ধারের আন্দোলন এক অপরূপ মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। এটা এই অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য।

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়ার একটা সুস্পষ্ট রূপ আছে। যেমন আব্বাসউদ্দীন-গীত সেই বিখ্যাত গানটি :

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে !
ফান্দে পড়িয়া বগায় করে টানাটুনা
আহারে কুক্কুরার সুতা হৈল লোহার গুণারে···ইত্যাদি ॥

একই পরিভাষা হওয়া সত্ত্বেও এবং কোচ-রাজবংশী সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়েও গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়া সুরের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—সেই আঞ্চলিকতারই সাক্ষ্য বহন করে। টেপরেকর্ড-করা প্রতিমা বড়ুয়ার কণ্ঠে একটি গান শুনুন :

'হস্তির কন্যা হস্তিব কন্যা বামুনের নারী
মাথায় নিয়া তামকলসী হস্তে সোনার ঝারি
সখিও ও মোর হায় হস্তির কন্যারে—
খানিকো দয়া নাই মাহুতের লাগিয়া রে।

ঠিক তেমনি আসামে উত্তর আসাম ও নিম্ন আসামের পার্থক্যটা লক্ষণীয়। কামরূপ জেলায় উত্তর আসামের বিহুরাগ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসে ওজাপালীর প্রাধান্য মেনে নিয়েছে। আবার সীমান্তের ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়ার সাথে সমন্বয় সাধন করেছে। উত্তরভারতের লোকসংগীতে যাকে আমরা এককথায় বলি দেহাতী গীত—তাতে বিহারী বা উত্তরভারতীয় বলে কিছু নেই, আছে ভোজপুরী, মৈথিলী, মগধী প্রভৃতি আঞ্চলিক নাম ও সুরবৈশিষ্ট্য।

এই যে আঞ্চলিকতা তার মূল নিয়ামক শক্তি কী ? কতটা ভূপ্রকৃতি, কতটা সমাজব্যবস্থার স্তর, কতটা ethnic বা গোষ্ঠী-বা জাতিগত তা পণ্ডিতদের আলোচ্য বিষয়। তবে আমরা দেখছি এক একটি বিশেষ আদিম মানবগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এক একটি সুরের ঠাট গড়ে উঠেছে এবং আঞ্চলিকতার যে এটাই প্রধান নিয়ামক শক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার সাথে সমাজব্যবস্থার বিবর্তন এবং অর্থনৈতিক

কাঠামোতে শ্রমব্যবস্থার রূপান্তরের প্রভাবও অনস্বীকার্য। কিন্তু সমাজ-রূপান্তরে শুধু সমন্বয় দেখলেই চলবে না, শ্রেণীবৈষম্যজাত সংঘাতটাও সেখানে একটি আসল কথা। শুধু লোকসংগীতের দর্শনে নয় সুরেও তা অনুসন্ধান করতে হয়। অনেক সময় উপজাতীয় erotic এবং জীবনধর্মী সুরেও সামন্তসমাজের রক্ষক ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা তাদের আত্মসমর্পণকারী ভক্তিবাদী ভাবধারার সাথে সুরেরও এমন অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন—যা লোকসংগীতের অকৃত্রিম রূপটিকে উজ্জ্বল না করে মলিনই করেছে। যাহোক এখানে সে বিতর্কে ঢুকতে চাই না।

এই আঞ্চলিকতার বিকাশ আমাদের দেশে সুস্থভাবে হয়নি। আমাদের দেশে পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকশিত হলে প্রত্যেক উপজাতি, খণ্ডজাতি, অধিজাতি প্রভৃতি যখন স্বকীয় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন যার যার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ভারতীয় লোকসংগীতের যে বর্ণাঢ্য মণিহারটি গাঁথবে—আজকে আমরা হয়তো তার রূপটি কল্পনাও করতে পারছি না। এই বন্ধনহীন বিকাশই লোকসংগীতের আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যকে হাজারগুণ বিকশিত করে তুলবে। বহু হারিয়ে-যাওয়া অপ্রচলিত সুরকে আমরা খুঁজে পাব।

সারা ভারতে কৃষক আন্দোলনের সাথে সাথে লোকসংস্কৃতির শীর্ণ নদীতে যে নতুন জোয়ার ডেকেছিলো—গণনাট্য আন্দোলনের সংগঠক ও গীতিকার হিসাবে তাতে আমিও সামান্য অংশ নিয়েছিলাম। দেখেছি কোটি কোটি কৃষক ও গরীব জনসাধারণ তাদের বিচিত্র সংস্কৃতি ও সুরকে খুঁজে পেলো নতুন সম্মানে ও মর্যাদায়।

কিন্তু এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের কাছে তার উল্টো কথাও শুনতে হয়। তাঁরা আঞ্চলিক স্বকীয়তায় ভীত। এঁরা সংস্কৃতিতে 'অখণ্ডভারতপন্থী'।

'বাংলার লোকশ্রুতি' গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখছেন :

(১) "বিভিন্ন জাতি যদি নিজস্ব স্বকীয়তা বিসর্জন না দিয়া স্বাধীনভাবে বাস করিতে থাকে, তখন লোকসংস্কৃতি কিংবা সমাজবিজ্ঞানের দিক হইতে তাহার কোনো মূল্য প্রকাশ পায় না।"

(২) "ভারতবর্ষে নেগ্রিটো হইতে আরম্ভ করিয়া নর্ডিক পর্যন্ত জাতি নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই—বরং তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া এই বিপুল দেশের মধ্যে একাকার হইয়া বাস করিতেছে। যথার্থ লোকসংস্কৃতি এই পরিবেশেই বিকাশলাভ করিতে পারে।"

(৩) "বিভিন্ন জাতি একদেশে বাস করিয়াও যেখানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয় নাই, সেখানে কোনো সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে না।"

(৪) "পৃথিবীর বহু জাতি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার দুরন্ত প্রয়াসে নিজেদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারত এই পথে কোনোদিনই অগ্রসর হয় নাই।"

এ বক্তব্য শুধু অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক নয়, এই বক্তব্য আজ লোকসংগীতে বিকৃতির দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব বিকৃতিকারীরা সমস্ত আঞ্চলিকতাকে ভেঙে "সুরের সর্বজনীনতা" প্রচার করেন।

গ্রাম্যতা ও গায়কী

এই আঞ্চলিকতা থেকে লোকসংগীতের গায়কীর উৎপত্তি। অঞ্চলগত ভঙ্গিটা রেওয়াজী জিনিস নয়। জীবনে একবার এক দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিলো আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের এক আলোচনা-আসরে উপস্থিত থাকবার। আলোচনায় যোগ দেবার যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি ছিলাম সশ্রদ্ধ নীরব শ্রোতা। কিন্তু আমি জানতাম একেবারে গ্রামসংগীতের হালচষা মাটির রসে শিকড় ছড়িয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের শিখরচূড়ায় আলাউদ্দীন খাঁ যেমন উঠেছেন—ভারতে আর কোনো সংগীতগুরু সেভাবে পারেননি। কথায় কথায় তিনি লোকসগীতের প্রসঙ্গে এলেন। সমস্ত কথা আমার হুবহু মনে নেই, তবে একটি কথা তিনি বলেছিলেন যে, রাগসংগীত ও লোকসংগীতের মধ্যেকার প্রধান পার্থক্য হলো গায়কীর। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বললেন: "আমার ছোটবেলাকার শোনা একটি গান গাইছি: নিরলে, কইও গিয়া বন্ধুয়ার লাগ পাইলে।" খাঁ সাহেব যে অঞ্চলের—ত্রিপুরা জেলার সেই অঞ্চলটি হলো শ্রীহট্ট জেলার আমাদের অঞ্চলের সীমান্তবর্তী। মাত্র একটি খালের ব্যবধান। এ অঞ্চলের লোকসংগীতের গায়কী একই রকম। এই গানটি ছোটবেলা থেকে আমিও গেয়েছি। খাঁ সাহেব গাইছিলেন:

"এগো নিরলে, কইও দুঃখ বন্ধুয়ার লাগ পাইলে
আমার বন্ধু রঙ্গি চঙ্গি
হাওরে বান্ধিয়াছ টঙ্গি
তবু পরাণ না জুড়ায়ে বাতাসে, গো নিরলে।"

প্রথমবার স্থানীয় ঢঙে মৌলিক ভাটিয়ালী সুরে গেয়ে দ্বিতীয়বার সুর অক্ষুণ্ন

রেখে ঢঙ ও গায়কী বদলিয়ে প্রথম কলিটি আবার গাইলেন—বললেন : "দেখলে তো, শুনতে একেবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো। ভাটিয়ালীই ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজের রূপ নিলো।" সংগীতশাস্ত্রী পরলোকগত স্বরেশ চক্রবর্তী মহাশয় ভাটিয়ালীকে কসৌলী-ঝিঁঝিট বলে আখ্যা দিয়ে গেছেন।

এই ঢঙ ও গায়কীকেই আমি বলি স্বরের গ্রাম্যতা ও আঞ্চলিকতা। আব্বাসউদ্দীনের আত্মজীবনীতে আছে যে শচীন দেববর্মণ তাঁর কাছে ভাওয়াইয়া শিখতে চেয়েছিলেন—কিন্তু পরে বলেন : "আপনার এই গলাভাঙ্গাটা আমার উঠছে না মোটেই।" শচীন দেব সত্যিকারের স্বরশিল্পী তাই তিনি ভাওয়াইয়া গাইতে আর যাননি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাওয়াইয়ার জাদুকর আব্বাসউদ্দীন কিন্তু বুঝতে পারলেন না যে সত্যিকারের ভাটিয়ালী তাঁর গলায় খেলে না মোটেই। শ্রদ্ধেয় কবি জসিমুদ্দীন আমাকে বলেছিলেন—"অনেক চেষ্টা করে দেখেছি কিন্তু ভাটিয়ালীর বিশেষ খোঁচ ও ভাঁজগুলি আব্বাসের গলায় ওঠে না।" কিন্তু কবি জসিমুদ্দীনও কিন্তু এর কারণগুলো বুঝতে পারেননি। ইদানীং আব্বাসউদ্দীনের ভাটিয়ালী গানের একটি লং প্লে রেকর্ড বেরিয়েছে। অধিকাংশ গানই কবি জসিমুদ্দীনের রচনা। আব্বাসউদ্দীন ভাটিয়ালীর উপর এমন স্টীমরোলার চালিয়েছেন যে, গানগুলি শুনলে কাঁদতে ইচ্ছে করে—একজন এমন ভালো শিল্পী কী করে তাঁর সীমানার বাইরে যেতে গিয়ে ভাটিয়ালীর পালটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছেন। কবি জসিমুদ্দীনই বা কী করে তাতে সায় দিলেন। কিন্তু শচীন দেববর্মণ সংযম দেখিয়েছেন, কারণ এ বিষয়ে তিনি সচেতন। যাক, তাতে—'স্বরের আঞ্চলিকতা'-বিষয়ে আমার বক্তব্যই প্রমাণিত হয়।

যাঁরা দীর্ঘকাল কলকাতাবাসী কিংবা যাঁদের কণ্ঠ রেওয়াজী মসৃণতার শানানো, তাঁরা যে অঞ্চলেরই কোন লোকসংগীতের ঢঙটি প্রকাশ করতে পারেন না। কিছুদিন আগে H. M. V. প্রকাশিত লং প্লে রেকর্ড 'Folk Songs of Bengal' নিশ্চয়ই শুনেছেন। সেখান থেকে দুটি গানের উদাহরণ দেব। একটি গান প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া, অন্যটি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া। বাংলা দেশের এই দুটি স্বরেলা রেওয়াজী কণ্ঠ স্বদীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের মুগ্ধ করে এসেছে, এ বিষয় দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু সেজন্য কি লোকসংগীতও তাঁরা ভালো গাইবেন? প্রতিমা দেবী গেয়েছেন :

বন্ধু সময় জানো না
অসময়ে বাজাও বাঁশী মন তো মানে না।

সুমার্জিত গলায় এমন চিক্কণ অলঙ্করণ লোকসংগীতে পাই না। লোকসংগীতেও অলঙ্করণ আছে, কিন্তু গ্রাম্য মেয়ের পায়ের মল, গলার কামরাঙা মালার সাথে প্রতিমা দেবীর গলার নেকলেস একদম মানায় না। সেই গানের অন্তরায় :

এক প্রহর রাত্রে যাইও বন্ধু
বাঁশীতে দাও টান
ওগো ঘরে আছে কুলনারী উড়াইলা পরাণরে বন্ধু।

এখানে 'বাঁশীতে দাও টান' গাইতে এমন ঠুংরীর কাজ করেছেন যে সমস্ত গানটাই অত্যন্ত পরিশীলিত মনে হয়। ঠিক তেমনি ধনঞ্জয়বাবু যখন গান :

গুরু কই রইলা ও বাঁচি না পরানে
দিল দরিয়ায় ঢেউ উইঠ্যাছে
পাড়ি দেই কেমনে গুরু।

তখন একটি বিদগ্ধ কণ্ঠের পালিসে লোকসংগীতের সহজাত আঞ্চলিক ভঙ্গিকে পরিমার্জিত করে একটি 'ভদ্র' রূপ দেওয়া হয়। তাহলে লতা মুঙ্গেশকরের 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে' গাওয়ার পর আব্বাসউদ্দীনের রেকর্ডটি ভেঙে ফেলতে হয়। অথচ অনন্তবালা বৈষ্ণবী, ললিতা দেবী এঁদের আজও আমরা ভুলতে পারি না কেন? রেকর্ড কোম্পানি 'স্টারশিল্পী'দের দিয়েই এখন 'ফোকসং' গাওয়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—কারণ সেই লেবেলেই অর্থসমাগম বেশি।

আকাশবাণীর ভূমিকা আরও মারাত্মক, কারণ নিত্যনতুন বেতারী লোকসংগীত ও সংগীতজ্ঞ তাঁরা হাজির করছেন যাঁদের অধিকাংশ আজন্ম জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরে মানুষ হয়েছেন এবং কোনো শিক্ষকের কাছে গান শিখেছেন। তাঁদের গলায় খাঁটি ভঙ্গিটি পাব কী করে? এঁদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁরা নিজেদের অঞ্চলে মানুষ হয়েছেন এবং সাধারণ লোকগায়কদের গান শুনে শিখেছেন। তাঁরা এখন কলকাতায় থাকলেও তাঁদের অর্জিত কণ্ঠ হারাননি। যদিও কেউ কেউ কমার্শিয়াল সাফল্যে'র খাতিরে এবং হুল্লোড়ী শ্রোতার তাগিদে এবং নগরীর বিদগ্ধ পরিবেশে তাঁদের মেঠো গলা হারিয়ে ফেলেছেন। এর মধ্যে কেউ কেউ কোনো অঞ্চলের গান মোটামুটি ভালো গান, কিন্তু অন্য অঞ্চলের গান গাইতে গিয়ে হাস্যকর ব্যাপার করেন। পূর্ববঙ্গের ঢঙটি হয়তো তাঁর গলায় ওঠে কিন্তু তিনি উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গাইতে গিয়ে ও তার ঢঙ গলায় তুলতে গিয়ে 'প্যারোডি' করে ছাড়েন। সেসময় বিশেষ সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত ঢঙটি এক অসহ্য ম্যানারিজম-এ পরিণত হয়।

রেডিওতে গলা শুনলেই বলতে পারি 'গ্রাম্য' গলা না 'শহুরে' গলা। সুরের এই গ্রাম্যতা লোকসংগীতের মুখ্য কথা। কোনো গুরুর কাছে বসে তা আয়ত্ত করা যায় না। চাই গ্রাম্যজীবনের সাথে identification। রবীন্দ্রসংগীত, রাগসংগীত গুরুমুখী—শহরের শিক্ষকের কাছে বসে রেওয়াজ করলে আয়ত্ত করা যায়–কিন্তু লোকসংগীত গুরুমুখী নয়। তাকে আয়ত্ত করতে হলে জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য প্রয়োজন। তা থেকে আসে গলায় গ্রাম্যতা। শ্রমজীবী জনতার দুঃখে ও সংগ্রামে একাত্মতা থেকেই আসে সুরের আকুতি ও আর্তি। এই আর্তি আনতে যখন অনেকে কাঁদো-কাঁদো সুরে গান করেন তখন না হেসে থাকতে পারি না।

সংগীত সমালোচক সুপণ্ডিত শার্ঙ্গদেব মহাশয় দেশ পত্রিকায় "গানের আসরে" একবার লোকসংগীতের সংকট সম্বন্ধে আমার এক চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করেন। কিন্তু সেইসঙ্গে লোকসংগীতের পরিবেশনা সম্পর্কে যে মত উপস্থিত করেন দুঃখের বিষয় আমি তা সমর্থন করতে পারি না। তিনি বলেছিলেন 'লোকসংগীত—যা আমরা শুনি—তা কিভাবে পরিবেশিত হবে? একেবারে উৎপত্তিস্থলে যেভাবে গাওয়া হয় সেইভাবে, না একটু পরিমার্জিত আকারে? এক্ষেত্রে হয়ত নিতান্ত রক্ষণশীল ব্যক্তির সঙ্গে লেখকের মতের মিল হবে না। অলঙ্কারশাস্ত্রে বলে গ্রাম্যতা একটা দোষ। অনেক সময় লোকসংগীতে এই গ্রাম্যতার আতিশয্য থাকে। খাঁটি গ্রামীণ পরিবেশে যাঁরা গান শুনেছেন, তাঁরা জানেন অনেকের মধ্যেই নানারকম 'ম্যানারিজম' আছে—সে উচ্চারণেও হতে পারে অথবা গাইবার ভঙ্গিতেও হতে পারে। এটাকে দোষই বলতে হবে এবং গ্রামীণ গীতিতেও গ্রাম্যতাদোষ বহুল পরিমাণে থাকে। এটাকেও যদি কেউ লোকসংগীতের একটা যথার্থ রূপ বলে ধরে নেন, তাহলে অনুমান ভুল হবে। এটুকুকে একটু শুধ্‌রে নিতেই হবে রসিকসমাজে পরিবেশনের খাতিরে। এর জন্য লোকসংগীতে বিকৃতি ঘটবার সম্ভাবনা নেই। বলা বাহুল্য এটি সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে, কেননা স্বাধীনতার সুযোগ এতে সামান্য। নিতান্ত আদিম লোকসংগীত তাঁদের কাজে লাগতে পারে যাঁরা একেবারে থিয়োরেটিকাল দিক থেকে কাজ করেন; কিন্তু শিল্পের জগতে একটু মার্জনা করে না নিলে চলে না—খুব সামান্যভাবে হলেও এটা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।*

শার্ঙ্গদেব অনেক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেও যেটুকু অসাবধানী উক্তি করেছেন তার সুযোগ নিয়ে "গ্রাম্যতা' পরিত্যাগ করে সচেতন urbanisation-এর

ভেজাল ব্যাবসায়ীরা—আঞ্চলিক ভঙ্গিকে (যা তাঁদের কণ্ঠে অসাধ্য) আয়ত্ত করার অপারগতাকে শিল্পের জগতে পরিমার্জনা বলে চালিয়ে নিতে পারেন। এখানে প্রশ্ন, পরিমার্জনা করার অধিকারী কারা? যে রসিকসমাজে পরিবেশনের কথা বলেছেন, সেই রসিকসমাজটিই বা কারা? অলঙ্কারশাস্ত্রে কোন্ গ্রাম্যতাকে দোষাবহ বলেছে—অন্তত লোকসংগীতের ক্ষেত্রে আমি তা জানি না, বুঝতেও পারছি না। শত শত লোকসংগীত গায়ককে "একেবার উৎপত্তিস্থলে" দেখেছি যাদের মতো গাইতে পারি না বলে আমার আফশোসের অন্ত নেই; গ্রামে গান গাইলেই সবাই গায়ক বলে স্বীকৃত হয় না। সেখানেও রসিকসমাজ আছে—সেখানেও গ্রহণ-বর্জন আছে। জনসাধারণই এই গ্রহণ-বর্জনের মালিক। কাজেই যাঁরা গায়েন, বায়েন, ওজা, ইত্যাদি বলে গ্রাম্যসমাজে গৃহীত—তাঁরাই সত্যিকারের প্রতিনিধি। এঁদের কণ্ঠে যে গ্রাম্যতা আমি তারই কথা বলছি। এর মধ্যে কোনো ম্যানারিজম নেই—বরং ম্যানারিজমটা ঘটে শহরের লোকসংগীত গায়কদের—যা আসে গ্রাম্য ভঙ্গি নকল করার অপচেষ্টা থেকে। জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কলকাতার আধুনিক রসিকসমাজে পরিবেশনের খাতিরে চোখের সামনে কত লোকশিল্পীর অকালমৃত্যু দেখলাম আর অসহায়ভাবে দেখছি লোকসংগীতের উপর নিষ্করুণ অস্ত্রোপচার। শার্ঙ্গদেব যদি ভাবেন আমি নিতান্ত রক্ষণশীল ব্যক্তি, তবে আমি নাচার। গ্রাম্য শিল্পী কিন্তু রক্ষণশীল নয়। একই গান একই অঞ্চলের এক এক শিল্পীকে নিজের স্বকীয় ঢঙে উপস্থিত করতে দেখেছি। সুরের রক্ষণশীলতা ও ভাবের গতিশীলতা হলো লোকসংগীতের রূপান্তরের রূপরেখা। কিন্তু সুরের এই রক্ষণশীলতা বলতে অপরিবর্তনীয়তা বোঝায় না। শাস্ত্রীয় সংগীতের উৎপত্তিস্থল যেমন লোকসংগীত, তেমনি শাস্ত্রীয় সংগীতের সর্বভারতীয় রূপটিও লোকসংগীতের আঞ্চলিক রূপকে কখনও কখনও প্রভাবান্বিত করেছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে কোনো one way road নেই। গ্রামের শিল্পীর কানেও বিভিন্ন সুর ভেসে আসে। সার্থক শিল্পীর হাতে যখন সমন্বয় ঘটে—তখন জনসাধারণ তা গ্রহণ করে নেয়। একটি গানে ভাটিয়ালীর সাথে ভূপালীর সুন্দর সংমিশ্রণ লক্ষণীয়—যদিও ঢঙটা পুরো ভাটিয়ালী রয়ে গেছে।

(আমি) কেমনে জানিব গো ও গুরু
কার মনে কি?
আমি যার লাগিয়া আইলাম ভবে
সে দিল ফাঁকি।

কার মনে কি।
আমি দেশবিদেশ ভ্রমণ করি,
মনের মানুষ তালাস করি।
পাই না দেখিতে
আমি সমদুঃখের দুঃখী পেলে গো—
আমি হৈতাম তার সাথী—
কার মনে কি?

এমনি পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো লোকসংগীতে ভীমপলশ্রী, দেশ প্রভৃতি রাগের সুস্পষ্ট প্রভাব পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমন্বয়টারও একটা পদ্ধতি আছে—যা জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতায় কোনো একক সংগীত প্রতিভার experiment দিয়ে ঘটানো যায় না। কোনো কোনো সময় সুরে experiment-এর অনুপ্রবেশ পল্লীসংগীতে ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে অতীতে। কিন্তু আজ তা একচেটিয়া কবলিত গণমাধ্যম—বেতার, চলচ্চিত্র, রেকর্ড ইত্যাদি—সহযোগে অত্যন্ত সংগঠিত ও সচেতনভাবে করা হচ্ছে। বাজারের জন্য, পণ্যসৃষ্টির মতোই এ হলো manufactured folk song এবং এর আক্রমণটা আজ আমাদের সামনে ভয়াবহ হয়ে দেখা দিয়েছে।

Improvisation ও লোকসংগীত

লোকসংগীতে গলার গ্রাম্যতা বা একটি বিশেষ tonal quality-র কথা বলেছি—যা ঘরে বসে রেওয়াজ করে আয়ত্ত করা যায় না। এবার আর একটি বিশেষত্বের কথা বলবো।

অনেকদিন আগে যখন প্রথম কলকাতায় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে গান গাইতে আসি তখন একদিন একজন সংগীতজ্ঞ আমার কাছ থেকে একটি পূর্ববঙ্গের লোকসংগীত স্বরলিপিবদ্ধ করতে আসেন। আমি একটি ভাটিয়ালী গাইছিলাম। কিন্তু তিনি স্বরলিপি করতে গিয়ে ভীষণ ফাঁপরে পড়েন আমাকে নিয়ে। বার বার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন "আপনি কিন্তু আগের বার যে রকম গাইছিলেন এবার ঠিক সেরকম গাইছেন না—।" কিন্তু আমি আমার ভুল ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। পরে সংগীতজ্ঞ ভদ্রলোক একরকম হাল ছেড়ে দিলেন। সে সময় আমি ভীষণ লজ্জিত হয়েছিলাম সংগীতবিজ্ঞান সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা ধরা পড়ে যাওয়ায়। অনেকদিন পরে বুঝলাম, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক

যেমন বলেছিলেন এক নদীতে একজন দুবার স্নান করে না, ঠিক সে ভাবে বলা যায় একজন লোকসংগীত-গাইয়ে একই গান দুবার একই ভাবে গান না। কেউ হয়ত বলবেন একজন খেয়াল-গাইয়ে বা ঠুংরী-গাইয়েও একই গান একইভাবে দুবার গান না, improvisation-টাই তার আসল বাহাদুরী। কিন্তু তফাতটা হলো, ক্ল্যাসিকাল-গাইয়ে অত্যন্ত সচেতনভাবে improvise করেন আর লোকসংগীত-গাইয়ে এ ব্যাপারে অসচেতন। অথচ তার মূল local musical mode বা ঠাটের ভেতরেই সেটা করেন।

George Thomson তাঁর বিখ্যাত বই Marxism and Poetry-তে প্রাচীন লোকগীতিকারদের 'মুহূর্তের অনুপ্রেরণায় উদ্ভাবনের' বা inspired improvisation-এর দৃষ্টান্ত সহ বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন "Evey minstrel with any skill at all always improvises, so that he cannot recite a song twice over in exactly the same form…"

আমাদের দেশেও আমি সে রকম বহু কবিয়াল বা স্বভাব লোককবিদের গাইতে গিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে আসরে দাঁড়িয়ে কাব্যরচনা করতে দেখেছি এবং গায়কদের মুখেও বিশেষ কোনো উৎসবের জনসমাবেশে উন্মাদনার মুহূর্তে এই ধরনের উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া দেখেছি। আসামের বিহু উৎসবে গ্রাম্য গায়কদের সুরে ও রচনায় এই প্রক্রিয়া এখনও দেখা যায়। অথচ সুরের melodic pattern -এ যতই নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করুক, তা কিন্তু বিহুর সা জ্ঞা মা পা ণা এই পঞ্চ-স্বরের ঔড়ব জাতীয় ঠাটের কাঠামো ও বিহুর বিশেষ ঢঙটির মধ্যেই থাকে। এই উদ্ভাবন বা improvisation কিন্তু একটা collective creation বা যৌথ সৃষ্টি। যৌথ চেতনার বিশেষ একটি অনুপ্রাণিত মুহূর্তে জনগণের কোনো শিল্পী প্রতিভা এটি করেন। আজকাল কলকাতায় একদল সুরকার ও রচয়িতা আছেন যাঁরা রেকর্ড কোম্পানির ও আকাশবাণীর ছত্রছায়ায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় লোক-সংগীতের কারখানা খুলেছেন ও commercialised লোকগীতি সেখানে উৎপাদন করছেন। এই সমস্যার সবচেয়ে ট্র্যাজিক দিকটা হলো—কলকাতায় অধিকাংশ সংগীতশাস্ত্রী ও রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞ এই ভেজাল ব্যাবসায়ের স্বরূপটা বুঝতে পারেন না। তাঁদের এই অজ্ঞতার সুযোগে প্রহরীহীন গ্রাম্যগীতির এই urbanised ব্যাবসায় আরও সহজ হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে যাঁরা শহরের কোনো গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং স্বরলিপি করে তা ধরতে চান তাঁরা লোকসংগীতের এই স্বাধীনতার কথা জানেন না—

যার নাম improvisation ; একমাত্র গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থেকেই সেই গায়কার স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। স্বরলিপিসহ যেসব লোকসংগীতের বই বের হচ্ছে সেগুলিকে নির্ভর করে কোনোদিনই লোকসংগীতের খাঁটি রূপ পাওয়া যেতে পারে না। গবেষকদের তা সাহায্য করতে পারে মাত্র।

মিউজিক, ছন্দ ও তাল

আর মাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করবো। সেটি হলো লোকসংগীতে মিউজিক ও তালের হুল্লোড়ী দৌরাত্ম্য এবং ছন্দের স্বেচ্ছাচার। লোকসংগাত বিকৃতির এটি আর একটি নমুনা।

যৌথ শ্রমপ্রক্রিয়া থেকেই ছন্দ ও সুরের উৎপত্তি। শ্রমধ্বনিই কালক্রমে দুটি থেকে তিনটি বা চারটি স্বরে বিস্তারিত হয়ে সংগীতে বিকাশ লাভ করে। ছন্দেরও বিকাশ শ্রমজীবনের ছন্দ থেকে। আজও নৌকাবাইচ ছাদপেটা ইত্যাদিতে তার সাক্ষ্য মেলে। যৌথজীবনের সাথেই নৃত্যগীত ও সংগীত অবিচ্ছেদ্যভাবে ছিল। আজও বহু লোকসংগীত নৃত্যসম্বলিত। আদিবাসীদের মধ্যে দেখেছি তারা গান গাওয়ার সময় না নেচে পারে না, আবার নাচের সময় না গেয়ে পারে না। এটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। আদিবাসী কেন, আমাদের বর্তমান গ্রাম্য জীবনেও অধিকাংশ সময়েই দেহসঞ্চালন ছাড়া লোকসংগীত করতে দেখা যায় না। কিন্তু শহরের গায়করা যখন মাইকের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসেন তখন কোনো নৃত্যসম্বলিত গানকে তিনি যেভাবে উপস্থিত করেন তাতে দেহভঙ্গিমার সুযোগ নেই। কিন্তু গায়কের মানসপটে মূল গানের ছবিটা যদি পরিষ্কার থাকে তবে সেই প্রাণশক্তি আনবার জন্য মূল ছন্দকে বলি দিয়ে 'রক-এন-রোল' জাতীয় ছন্দে তাকে ফেলতে চেষ্টা করবেন না। একদিকে ছন্দপ্রধান বাউল গান যেমন শহরের আড়ষ্ট গাইয়েদের গলায় এবং তবলার তালে পড়ে ভগ্ন পায়ে চলতে থাকে, তেমনি ছন্দহীন ভাটিয়ালীকে তাদের গলায় ও তবলার রেলায় পড়ে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। ৩ মাত্রা ও ৪ মাত্রার টানাপোড়েনেই পৃথিবীর সব তাল। কিন্তু তথাপি এত বৈচিত্র্য কিসে? বিশেষত ছন্দে ও চলনে। বিশেষ লোকসংগীতের বিশেষ চলন আছে। যেমন অধিকাংশ লোকসংগীতেরই চলনটা আড়া।

এইখানেই আসে লৌকিক বাদ্যযন্ত্রগুলির কথা। আজকাল তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। এই মহানগরীতে সাধারণভাবে ভালো সেতারী অনেক পাবেন, কিন্তু ভালো দোতারা বাজিয়ে পাওয়া দুষ্কর। অথচ দোতারা ছাড়া বাংলা লোক-

সংগীতের কথা ভাবা যায় না। প্রত্যেক দেশে এবং অঞ্চলে তার নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র নানা রকমের আছে। এগুলির বিবর্তন আমাদের সংগীতের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায়। এ শুধু গানে 'অ্যাকম্পেনিমেণ্ট' ভাবা ঠিক নয়। এক একটি যন্ত্র এক এক প্রকারের মুড বা মেজাজ সৃষ্টি করে। পূর্ববঙ্গের 'লাউয়া' বা একতারা যন্ত্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একতারা যন্ত্রের পার্থক্য আছে। পূর্ববঙ্গের দোতারার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের দোতারার পার্থক্যও লক্ষণীয়। এ সবই বিশেষ সুরের প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু আজকের গায়করা অধিকাংশই সেসব লৌকিক বাদ্যযন্ত্র পরিত্যাগ করে হারমনিয়াম ও তবলার আশ্রয় নিয়েছেন। লোকসংগীতের পক্ষে এ দুটোই বিসংবাদী যন্ত্র। লোকসংগীতের শ্রুতিকে নষ্ট করছে হারমনিয়াম ও ছন্দকে মার্জিত করছে তবলা। ঢোল ও ঢোলকের মেজাজ তবলায় পাওয়া যায় না। শুধু একটি একতারা হাতে নিয়ে গাইলে কোনো কোনো লোকসংগীতের যে আমেজ পাওয়া যায় অন্য যন্ত্র হাজির করলে তা নষ্ট হয়ে যায়। দেশী বিদেশী অত্যধিক যন্ত্রের যন্ত্রণায় আজ আমাদের সংগীত পীড়িত, কণ্ঠ ক্রমশই গৌণ হয়ে পড়ছে। অর্কেস্ট্রেশনের অবৈধ প্রণয়ে লোকসংগীত চরিত্রহীন হয়ে পড়ছে। আর একটি ব্যাপার আপনারা লক্ষ করেছেন। আজকাল কোরাসে লোকসংগীত গাওয়া হচ্ছে। কোনো কোনো যৌথক্রিয়ামূলক গান আছে যা দলবদ্ধভাবে গাওয়া হলে ভালো। কিন্তু যেগুলি একক গীত তা দলবদ্ধভাবে গাইতে গেলে মূল সেণ্টিমেণ্ট নষ্ট হয়ে যায়। ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া যদি কোরাসে ফেলা যায় তবে আর কিছুই থাকে না।

উপসংহার

আমাদের লোকসংগীতের সাংগীতিক বিকৃতির প্রধান কয়েকটি রূপ আলোচনা করলাম। বিকৃতির আরও অন্যান্য দিক আছে। বিশেষত পদরচনার ব্যাপারে পরিভাষাকে সংস্কার করে যে ভদ্ররূপ দেওয়া হচ্ছে তা, কিংবা পরিচ্ছদের মাঝে মাঝে যে ইচ্ছাকৃত চাষাড়ে পোশাক পরানো হচ্ছে—তা আলোচনা না করলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু তথাপি আজ শুধু সুরের দিকটাই আমার জ্ঞান-বুদ্ধিমতো আলোচনা করলাম। মূলত লোকসংগীতের পদরচয়িতা সুরকার ও গায়ক একই ব্যক্তি। তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কিন্তু আজ আকাশবাণী ও গ্রামোফোন কোম্পানীর দৌলতে শহরের কিছু specialised পদরচয়িতা উৎপাদিত হয়েছেন, যাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিশেষ শিল্পী বা রচয়িতাকে সামনে রেখে আমি কথা বলছি না। আক্রমণটা আজ আসছে একচেটিয়া-করায়ত্ত গণমাধ্যম মারফৎ। অন্যদিকে গণচেতনা যেখানে গণঅভ্যুত্থানে পৌঁছেছে, সেখানে মুমূর্ষু ধনিকশ্রেণীর হাতে সংস্কৃতির গণমাধ্যমগুলি গণসংস্কৃতির বিকৃতির জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসাধারণের বিশেষ করে তরুণশ্রেণীর সাংস্কৃতিক রুচিকে তারা অন্তত সাময়িকভাবে নষ্ট করে দিতে সমর্থ হয়েছে। লোকসংগীত সেভাবেই আক্রান্ত। তবে আমাদের বিচ্ছিন্নতা-বিলাসী শিক্ষিত শ্রেণী, যাদের প্রত্যেকের শিরায় শিরায় সামন্ত ও ক্ষুদে সামন্তশ্রেণীর রক্ত প্রবহমান, লোকসংগীতের স্রষ্টা নিঃস্ব জনসাধারণের সঙ্গে যাদের যোগসূত্র নেই—তাদের অজ্ঞতা লোকসংগীতের সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

'সংগীত সংসদ'-এ উপস্থাপিত আলোচনাকে ভিত্তি করে লিখিত

পল্লীসমাজের সংগীত ও সংঘাত (এক)

দীর্ঘদিন চীনে থাকাকালীন সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত শুনবার সুযোগ ঘটেছিল। চীন-প্রবাসের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে গ্রামাঞ্চলে। সেজন্য কেবল শহরের অনুষ্ঠানগুলিতেই নয়, গ্রামাঞ্চলের ঘনিষ্ঠ পরিবেশে সেখানকার লোকসংগীত ও ধারাবাহী লৌকিক অপেরা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ও দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি ও অপেরার গান শুনবার সময় আমার যে জিনিসটি বিশেষ করে মনে লেগেছিল, সেটি হল চীনাদের লোকসংস্কৃতির ইহজাগতিকতা ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখিনতা। রাশিয়া বা ইয়োরোপের যেসব লোকসংগীত আমরা বিভিন্ন লেখকের লেখা মারফত দেখতে পাই সেখানেও দেখি বস্তুবাদী জীবনমুখিতার প্রাধান্য। শোষকশ্রেণীর ভাবাদর্শের সঙ্গে সংঘাতই লোক-সংগীতের বিচার ও বিকাশের মূল চালিকা-শক্তি। কিন্তু এদেশের, বিশেষত বাংলার লোকসংগীত—জীবন-বিমুখী অধ্যাত্মবাদের দ্বারা এমন আচ্ছন্ন কেন?

আমাদের কোনো কোনো তত্ত্ববিদ্ হয়ত তার কারণ দেখাতে গিয়ে বলবেন আমরা 'অন্তর্মুখী', 'অধ্যাত্মবাদী'—আর অন্যান্য দেশ হল 'বহির্মুখী', 'বস্তুবাদী'; আমরা ধর্মপ্রাণ—অন্যরা 'সেকুলার' ইত্যাদি। তবে কি এদেশে অত্যাচারী জমিদার, মহাজন, রাজরাজড়া ছিল না? না, শোষণ নিপীড়নের একটানা ঘা খেয়ে খেয়ে ওরা ভাগ্যের কাছে অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর ভাববাদী দর্শনের কাছে এমনি আত্মনিবেদন করেছে যে প্রতিবাদের ভাষা তারা হারিয়ে ফেলেছিল? না যাঁরা সংগ্রহকারী বা বিশেষজ্ঞ গবেষক বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁদের দৃষ্টিকে ভাববাদ এমনি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তাঁরা আমাদের লোকসংগীতের ধুলোমাখা পরশপাথর ফেলে নুড়িই কুড়িয়েছেন বেশি? বিষয়টা একটু বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

ভারতের সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার মানসিক প্রতিফলন

শ্রেণীসমাজে দারিদ্র্যের গর্ভেই লোকসংগীতের জন্ম। অন্যান্য দেশে যেমন আমাদের দেশেও দারিদ্র্য, শোষণ ও শাসন ছিল এবং আছে। কিন্তু সমাজ-বিকাশে ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি ছিল, যেজন্য তার ভাবাদর্শে ভাববাদের

প্রাধান্য ভারতের শোষিত সমাজের লোকায়ত দৃষ্টিকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল। এবিষয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'লোকায়ত'তে বিশদ আলোচনায় বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় চিন্তার দুটি পরস্পর-বিপরীত ধারা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : 'ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেন দুটি স্পষ্ট ধারা স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। একদিকে অধ্যাত্মবাদের মহিমামুখর শাসক-শ্রেণীর সংস্কৃতি। অপরদিকে প্রাক্-আধ্যাত্মবাদের এবং অতএব প্রাক্‌বিভক্ত পর্যায়ের স্মারক-বহুল গণসংস্কৃতি। দ্বিতীয়টি লোকেষু আয়ত এবং সেই অর্থে লোকায়ত।' লোকসংস্কৃতি দ্বিতীয় ধারটিরই অন্তর্গত। গণ-সংস্কৃতির নামান্তর হিসাবে লোকায়ত শব্দটি ব্রাহ্মণ্যনীতির প্রচারকদের কাছে গালিগালাজের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকায়ত দর্শন ও চিন্তাকে অবদমন করার জন্য যে সংঘবদ্ধ প্রচার পুরাণকারেরা করেছিলেন এবং কঠিন সন্ন্যাসী বিধানের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তা আমাদের দৃষ্টিকোণে না রাখলে আমরা আজ আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ব্যর্থ হব।

আমরা সাধারণত যেসব লোকসংগীত ক'রে থাকি, কিংবা যা আমাদের আলোচনায় সাধারণত উদ্ধৃত হয়ে থাকে তা কালগতভাবে দু-শতাব্দীর পরিধি অতিক্রম করে যায়নি। এই কালটায় ভারতের সমাজব্যবস্থার কী প্রকৃতি ছিল তা জানতে হলে আমাদের কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক লেখার দিকেই চোখ ফেরাতে হবে। ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্থাণু, আত্মমুখী গ্রাম্যসমাজের স্থায়িত্বের শক্তি ও অন্যদিকে তার দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে মার্কস বলেন :

'...We must not forget that this undignified, stagnatory, and vegetative life, that this passive sort of existence evoked on the other part, in contradistinction, wild, aimless, unbounded forces of destruction and rendered murder itself a religious rite in Hindostan. We must not forget that these little communities were contaminated by distinctions of caste and by slavery, that they subjugated man to external circumstances instead of elevating man to be the sovereign of circumstances, that they transformed a self-developing social state into never changing natural destiny, and thus brought about a brutalising worship

of nature, exhibiting its degradation in the fact that man, the sovereign of nature, fell down on his knees in adoration of *Hanuman*, the monkey, and *Sabbala* the cow.'

যে অতীত গ্রাম-সমবায়গুলি একদিন ছিল লোকশক্তির ঘাটি—উৎপাদন-পদ্ধতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন না হওয়াতে ক্রমশ তার প্রগতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং শাসকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে থাকে। এই অচলায়তন গ্রাম্যসমাজেরই বনিয়াদের উপর ভাবগত উপরিসৌধে নানাপ্রকারের জীবনবিরোধী তত্ত্ব ও চিন্তা দানা বেঁধেছিল। আমাদের লোক-সংগীতেও তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের অচলায়তনকে প্রথম আঘাত করেছিল ব্রিটিশ শাসন। তাই কার্ল মার্কস ব্রিটিশের নৃশংসতম ধ্বংসলীলার কঠোর নিন্দা করেও ভারতের এই সনাতন সমাজকে ভাঙার ব্যাপারে 'unconscious tool of history' বলে ব্রিটিশ শাসনকে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে কৃষিসমাজকে মুক্ত করার গণতান্ত্রিক বিপ্লব এগিয়ে গেল না। সিপাহী বিদ্রোহ—মার্কস যাকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন—ব্যর্থ হল, কৃষক অভ্যুত্থানগুলিও বিফল হল। তাই ভারতের জনসাধারণের ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণকে প্রাচীন অদৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্মবাদ সাহায্য করতে লাগল। আত্মসমর্পণের জীবনদর্শন, জীবনের অনিত্যতার দর্শন জনজীবনকে প্রভাবিত করতে লাগলো—

'বড় সাধে বাইন্ধাছ ঘর, বড় করছাও আশা
রজনী পরভাত কালে পঙ্খী ছাড়ব বাসা।'

কিন্তু পাশাপাশি জনসাধারণের আর একটি ইতিহাস আছে। বিদেশী শাসক ও তার দেশীয় মুৎসুদ্দির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী জনশক্তি বারে বারে পরাজিত হয়েও বারে বারে আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীসুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' নামক অমূল্য গ্রন্থে অসংখ্য কৃষক-অভ্যুত্থানের বীরগাথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার সাথে সাথে জনসাধারণের নতুন মূল্যবোধ, নতুন গণধর্ম প্রভৃতির ইতিহাসও আমরা পাই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, লোকসংগীতে তার প্রতিধ্বনি সে রকম আমরা পাই না কেন? তিতুমীর, দুধুমিঞা বা সমশের গাজীদের নিয়ে 'ব্যালাড' বা গীতিকা পেলাম না কেন? ভাবজগতে অধ্যাত্মবাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাই কি তার একমাত্র কারণ? তাছাড়াও অন্য প্রশ্ন মনে জাগে।

তা হল আমাদের জনগণ-সৃষ্ট বীররা যেমন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ঐতিহাসিকদের ইতিহাসের পাতায় ছিল চিরদিন বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত, তেমনি আমাদের লোকসংস্কৃতির বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের পথে ছড়ানো আদিম রুক্ষ গ্র্যানাইট পাথরগুলি আমাদের পল্লীসংস্কৃতির ভিজেমাটির গবেষকরা ও সংগ্রাহকরা কোনোদিন আদর করে কুড়িয়ে ঝোলায় ভরতে রাজি হননি। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আবার ব্রিটিশ-ভক্ত কিংবা সরকার-অনুরাগী, সেদিক দিয়েও বাধা ছিল তাঁদের মানসিকতায়। আজও অনেকাংশে একথা প্রযোজ্য। তাছাড়া ভক্তিবাদী আত্মসমর্পণের ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক ধারাটিকেই তাঁরা 'ভারতীয় ধারা' বলে মেনে নিয়ে সেই দৃষ্টিতেই সংগ্রহ করেছেন। সামান্য অনুসন্ধান করলে আজও অনেক টুকরো ছড়া, গানের ভাঙাকলি, গীতিকার ছিন্নমালা খুঁজে পাওয়া যায়—শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের সর্বত্র। বাংলাদেশে পলাশীর রণাঙ্গনে পরাজয় থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি গণজাগরণের কিছু কিছু সাক্ষ্য আমাদের লোকসংগীতে আছে। লোকসংগীতের অনুরাগীরা সকলেই পলাশীযুদ্ধের স্মৃতিবহনকারী একটি লোকগীতির খবর রাখেন :

কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরান।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়
হাঁটুগেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।
কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরান।
নবাব কাঁদে, সিপুই কাঁদে, আর কাঁদে হাতী
কলকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান।
ফুলবাগে ম'ল নবাব খোসবাগে মাটি
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান।

পলাশীর প্রাঙ্গণ থেকে ক্ষুদিরামের ফাঁসির মঞ্চ অনেকদূর। পলাশীর 'মোহন-লালের বেটী'র পরাজয়ের কান্না আর ক্ষুদিরামের 'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি'র গৌরবের চোখের জলের তফাত অনেকখানি। অজ্ঞাত লোককবি-রচিত সেই গানটি লক্ষ লক্ষ লোকের সংগ্রামী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার স্পন্দনটি ধরে রেখেছে।

শ্রী পি. সি. যোশী সিপাহীবিদ্রোহের আলোড়নে রচিত উত্তরভারতের কিছু লোকগীত সংগ্রহ করে তার ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। ঝান্সীর রানী সম্পর্কে তাতে কিছু গীত আছে :

মাটি আর পাথর থেকে
রানী গড়েছেন তাঁর সৈন্য,
কাঠ থেকে
তিনি বানিয়েছেন তরবারি
পাহাড়কে করেছেন তিনি ঘোড়া
সোজা ছুটছেন গোয়ালিয়র।...

আর একটি গীতিকাতে আছে :

গাছগুলো কেটে ফেল
ঝাঁসীর রানী আদেশ দিলেন।
যাতে ফিরিঙ্গীরা আমাদের সৈন্যদের
ফাঁসি দিতে না পারে।
কাপুরুষ ব্রিটিশ যেন চিৎকার করে
বলতে না পারে
ফাঁসি দাও! গাছে ঝুলিয়ে দাও!
গাছগুলো কেটে ফেলো
যাতে রোদ্দুরে তারা ছায়া না পায়।...

ভারতের সর্বত্রই ব্রিটিশবিরোধী অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে কিংবা জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে বহু লোকগীতি রচিত হয়েছে। কোনো কোনো রাজ্যে পুরো গীতিকা আজও আছে; যেমন আসামে মণিরাম দেওয়ানের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে রচিত গীতিকাটি :

সোনার ধোঁয়াখোয়াত খালি ঐ মণিরাম
রূপর ধোঁয়াখোয়াত খালি

কিনো রজাঘরত দ্রোহ আচরিলি
ডিডিত চিপেজরী ললি।...

সোনার হুঁকোয় খেতি মণিরাম, রূপোর হুঁকোয় খেতি তামাক ; রাজার বিরুদ্ধে কি বিদ্রোহ করলি—তোর গলায় লাগলো ফাঁসির রশি।

ভারতবর্ষের ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহের মধ্যে একটি হল নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১)। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে ও সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আলোড়নকারী ঘটনাটি লৌকিক ছড়ার কয়েকটি কলিতে অমর হয়ে আছে, যা আমাদের সকলেরই জানা : 'নীলবাঁদরে সোনার বাংলা/করলে এবার ছারখার'...ইত্যাদি।

কৃষক সম্প্রদায় যখন জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যস্ত তখন তার প্রতি শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশ সহানুভূতিশীল হলেও, অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। গ্রাম্যকবির গানে তাই বিদ্রূপ ব্যক্ত হয়েছিল :

মোল্লাহাটির লম্বালাঠি রইল সব হুদোর আঁটি
কোলকাতার বাবুভেয়ে এল সব বজরা চেপে
লড়াই দেখবে বলে।

'অর্থাৎ মোল্লাহাটির কুখ্যাত নীলকুটির বিপুল লাঠিয়াল দলের লাঠির বোঝা অকেজো হইয়া রহিল। বিদ্রোহী কৃষকের সহিত নীলকুঠির লাঠিয়াল দলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নীলকুঠির লাঠিয়াল দল পরাজিত ও বিধ্বস্ত। আর কলিকাতার বাবুভাইগণ মজা দেখিবার জন্য বজরায় চাপিয়া যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছেন।' (সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম')।

ভারতের সবচেয়ে সুসংগঠিত ও ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহের অন্যতম সাঁওতাল-বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭)। জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের আরম্ভ হলেও সামন্তশোষণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়ে তা ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে তুলেছিল। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার সাঁওতাল উপজাতি অসীম বীরত্বে তীর-ধনুক নিয়ে বন্দুকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের নায়ক ছিল চার ভাই—সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। সেই সিধু ও কানু আমাদের ইতিহাসে স্থান না পেলেও লোকসংগীতে অমর হয়ে আছে।

সাঁওতাল উপজাতিদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ সিভিলিয়ান **W. G. Archer** সাঁওতাল বিদ্রোহ-জাত কিছু লোকসংগীত সংগ্রহ করে তার অনুবাদ *Santhal*

Rebellion Songs নামে একটি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। সেখানকার একটি গানের অনুবাদ হল :

Sido why are you bathed in blood ?
Kanu, why do you cry hul, hul ?
For our people we have bathed in blood
For the trader thieves
Have robbed us of our land.

[সাঁওতাল ভাষায় 'হুল' মানে বিদ্রোহ।]

এভাবে সমস্ত ভারতবর্ষেই বিভিন্ন ভাষায় ছড়া, প্রবাদ, গীতের ভাঙা কলি ছড়িয়ে আছে। একটি ওড়িয়া গান শুনেছিলাম,

পারাদ্বীপ নয়ী পিপ্পড় নাসি
লক্ষে মুণ্ড গলা ভাসি···

গায়ক বললেন সেটা ওড়িষ্যার প্রথম গণবিদ্রোহ পাইকবিদ্রোহ (১৮১৭-২০)-এর গান। কিন্তু তিনি সে গানের মাত্র কয়েকটি কলি জানেন। জনৈক বন্ধু দার্জিলিং জেলার ওঁরাওদের কিছু গান সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। সাদ্রীভাষায় 'মাটিকে বানাল কায়া মাটিমে গিয়া'—অর্থাৎ মাটির দেহ মাটিতেই মিশে যাবো—ধরনের কয়েকটি গান শোনার পর ওঁদের মৌলিক ওঁরাও ভাষার গান শুনতে চাইলে একজন বয়স্ক আদিবাসী শুনালেন একটি গান :

নাগপুরিয়া লাড়াই চোচা
গোড়ায় তারা নামাকে মালা ;
ভায়ারে জিনগিরে টুয়ার
মানোয় জিনগিরে টাপার।···

এই গানের ভাঙা কলিটি ১৮৫৫ সালে নাগপুরে ওঁরাও বিদ্রোহের স্মৃতিবহনকারী।

নিম্ন আসামের একটি ঘুমপাড়ানীয়া গান :

শুনৃছাম্রি আপিগিলা খাজনা লগাইছি
দিবা নল্লি নিব ধরি পেদা লগাইদি।···

আমাদের কাছে রঙ্গিয়া কৃষক বিদ্রোহের (১৮৯৪-৯৫) স্মৃতি বহন করে আনে। দরং ও কামরূপের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে নিম্ন আসামের জনগণ তাঁদের যে পাল্টা কর্তৃত্ব গড়ে তোলেন, তার নাম 'রাইজমেল' বলে খ্যাত। আসামের সমতলে এটাই ছিল সবচেয়ে

ব্যাপক ও সুসংগঠিত বিদ্রোহ। রঙ্গিয়ার এক চারণের কাছ থেকে আসাম গণনাট্য সংঘ এ বিষয়ে এক অসম্পূর্ণ গীতিকা সংগ্রহ করেছিল।

আমাদের গ্রাম্য কবিয়াল গান, পটের গান, ঢাকির গান, ভাটের গান, গম্ভীরা ইত্যাদি গীতের ধারার মূল প্রাণশক্তিই হল সমকালীনতা। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলি তাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। একসময় গম্ভীরা গানের উপর ব্রিটিশ শাসকদের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার-বিরোধী বাংলা-ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লেগে সীমান্তবাংলার ফসলকামনার টুসু গানের চিরাচরিত বক্তব্য কখনো বদলে গিয়েছে এবং টুসু গায়ক বা গায়িকারা হয়েছেন নিগৃহীত। পণ্ডিত গবেষকরা হয়ত বলবেন—এটা হল প্রচলিত ধারার বিচ্যুতি বা তার উপর প্রক্ষিপ্ত।

যদিও কেউ এ ধারাটিকে স্বীকার করেও নেন তবু তিনি বলতে পারেন বাংলা লোকসংগীতের মহানদীর মূলধারা এটা নয়—এটা মাত্র একটা উপনদী। তাছাড়া এই ধারার সাহিত্য ও কাব্যিক গুণ ও শিল্পকর্ম খুব দুর্বল। মূলধারাটি হল রাধা-কৃষ্ণলীলা, দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক গীতের ধারা। আপাতদৃষ্টিতে এতে যৌক্তিকতা আছে মনে হলেও বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাব, তা আংশিক সত্য মাত্র।

লোকসংগীতের বিভাগ ও বিচার

সাধারণত দেখা যায়, সংগ্রাহকরা ও গবেষকরা লোকসংগীতকে প্রণয়, প্রকৃতি, বিবাহ, ব্রত, পূজা, শ্রম, স্বদেশ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভাগ করেন। আঞ্চলিক ঐতিহ্য, আঙ্গিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বুঝবার জন্য এ ধরনের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ ধরনের vertical বিভাগ না করে আমাদের বিভাগটা হওয়া উচিত horizontal। কারণ তা থেকেই বেরিয়ে আসবে class contents বা তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যের শ্রেণীসংগ্রামগত চরিত্রটি। তা থেকেই জানতে পারব লোকসংগীতের সামগ্রিক ধারাটির অন্তর্লীন ভাবাদর্শের সংঘাতের স্বরূপটা কি।

যাঁরা শ্রমজীবনের গান বলে একটা আলাদা category করে থাকেন, তাঁরা ছাদপেটা, ধানভানা, ইত্যাদি গান—প্রত্যক্ষভাবে শ্রমের ছন্দসংগীতের জন্য সৃষ্ট ধ্বনিযুক্ত গীত একসাথে জড়ো করে শ্রমজীবনের গানের শ্রেণীবিভাগ ক'রে—অন্য গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে—আলোচনা করে থাকেন। আমার মতে তাঁরা গাছ দেখেন কিন্তু বন দেখতে পান না।

লোকসংগীত সামগ্রিকভাবেই শ্রমজীবনের ও শ্রমকামনার সংগীত। যেখানে শ্রমের সঙ্গে, শ্রমজাত উৎপাদনের ফলশ্রুতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা—সেখানেই লোক-সংগীত স্বধর্মচ্যুত।

'বানর থেকে মানুষে উত্তরণের ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকা' বিষয়ে ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্-এর ঐতিহাসিক নিবন্ধটি এ বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক :

'...Before the first flint could be fashioned into a knife by human hands, a period of time may have elapsed in camparison with which the historical period known to us appears insignificant. But the decisive step was taken, the hand had become free and could henceforth attain ever greater dexterity and skill, and the greater flexibility thus acquired was inherited and increased from generation to generation.

Thus the hand is not only the organ of labour, it is also the product of labour. Only by labour, by adaptation to ever new operations, by inheritance of the thus acquired special development of muscles, ligaments and, over longer periods of time, bones as well, and by the ever renewed employment of this inherited finesse in new, more and more complicated operations, has the human hand attained the high degree of perfection that has enabled it to conjure into being the pictures of a Raphael, the statues of a Thorwaldsen, the music of Paganini···

The mastery over nature, which began with the development of the hand, with labour, widened man's horizon at every new advance...the development of labour necessarily helped to bring the members of society closer together by multiplying cases of mutual support, joint activity. and by making clear the advantage of this joint activity to each individual. In short, men in the making arrived at the point where they had something to say to one another. The urge created its organ ; the undeveloped larynx of the ape was slowly but surely transformed by means

of modulation in order to produce constantly more developed modulation, and the organs of the mouth gradually learned to pronounce one articulate letter after another...First labour, after it and then with it speech—these were the two most essential stimuli under the influence of which the brain of the ape gradually changed into that of man...'

শ্রম-প্রক্রিয়ার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ কর্মোদ্যমে গড়ে ওঠে সমাজ, তারই সাথে কণ্ঠ, ভাষা, শ্রুতি, তাল, ছন্দ ইত্যাদি। কাজেই প্রকৃতি জয় করার সংগ্রামে শ্রম-প্রক্রিয়া থেকেই প্রথম সংগীতেরও জন্ম। শ্রেণীহীন আদিম সংহত সমাজের মেহনতের সংগতি রাখতে এবং যৌথশ্রমের ফল কামনার ঐন্দ্রজালিক প্রেরণায় উদ্দীপিত নৃত্য, গীত, বাদ্যের সাথে মিলিত হতো দ্বিস্বরিক বা ত্রিস্বরিক কণ্ঠস্বরের ঐক্যতান। কিন্তু এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা বুঝতে হলে কার্ল মার্কসের একটি কথা মনে রাখতে হয়। তিনি মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রাণী-জগতের মৌলিক পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে পাথরের হাতিয়ার গড়া আদিম মানুষের চেয়ে একটি মাকড়সার দক্ষতা ও নৈপুণ্য অনেকগুণ বেশি, কিন্তু তবু আদিম মানুষের অধিকতর উৎকর্ষের প্রধান কারণ হল, মাকড়সা, সহজাত প্রবৃত্তিতে (instinct) গড়ে তোলে —কিন্তু মানুষ একটা কিছু তৈরি করার আগে তাকে কল্পনায় প্রথম গড়ে নেয়।

মানুষের কর্ম-কল্পনার এই সম্পর্কটা আমাদের মনে রাখতে হবে লোক-সংগীতের আলোচনার সময়েও। কর্ম-জগৎ যেমন কল্পনা-জগতে পরিপূর্ণতায় প্রক্ষিপ্ত হয়—তেমনি আবার কল্পনা-জগৎ কর্মজগৎকে উদ্দীপিত করে। এখানেই আসে magic এবং music-এর সম্পর্ক। কারণ ঐন্দ্রজালিক mimesis বা-চুচুকৃতিই কণ্ঠসংগীতের আদি উৎস—'Magic may be described as an illusory technique supplementing the deficiencies of the real technique; or, more exactly, it is the real technique in its subjective aspect. A magical act is one in which savages strive to impose their will on their environment by mimicking the natural process that they desire to bring about. If they want rain, they perform a dance in which they imitate the gathering clouds, the clap of thunder, the falling shower'...(*Marxism and Poetry*, George Thomson)

লোকসংগীতের ঐন্দ্রজালিক কল্পনার জগৎ আজও নানাভাবে বর্তমান। প্রত্যক্ষ শ্রমের কথা বা ধ্বনি থাকলেই তা শ্রমসংগীত এবং না থাকলে তা অন্যশ্রেণীর সংগীত বলে সীমারেখা টেনে দেওয়াটা অবৈজ্ঞানিক এবং চিন্তা ও দৃষ্টিকোণের দিক থেকে ভ্রান্ত। যাকে বলেছি প্রণয়ের গান তার অধিকাংশই ফসল-উৎপাদনের ঐন্দ্রজালিক কল্পনার সঙ্গে আজও পরোক্ষভাবে জড়িত। কৃষি-সমাজের উৎপাদন থেকে প্রণয়জীবন আলাদা নয়। অর্থাৎ শ্রম ও প্রেম একসাথে মিশে আছে। কিন্তু নাগরিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার মানসিকতায়, প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদ প্রভৃতি শ্রমজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন phenomenon। সে দৃষ্টিতেই সাধারণত তাঁরা লোকসংগীতের আলোচনা করে থাকেন ; এবং যান্ত্রিক শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন। তাতে আমাদের সমাজের অন্তর্লীন সংঘাতকে সচেতন বা অচেতনভাবে গোপন করা হয়।

লোকসংগীতে শ্রেণীসমাজের সংঘাত

আমাদের দেশে একটা কথা আছে ধান ভানতে শিবের গীত। আদতে কথাটা ছিল ধান ভানতে মহীপালের গীত। সে যাহোক মহীপালের বা শিবের গীত গাওয়ার সঙ্গে ধানভানার মধ্যে প্রসঙ্গহীনতা ও বৈপরীত্যই যাঁরা দেখেন তাঁরা লোকসাহিত্যের খাঁটি সমজদার নন। ছাদ পিটোতে গিয়ে যদি দল বেঁধে গান করে :

ও আমার চান্দের কণা আন্ধাইর কইর‍্যা কই গেলিলো
আন্ধার কইর‍্যা কই গেলিলো পাগল কইর‍্যা কই গেলিলো।
তোর লাগি যাইমু ঢাকা
বাক্স ভইর‍্যা আনমু টেকা
দোতালাতে রাখবো তোরে খেড়ী ঘরে রাখবো না লো॥
কিন্যা আনমু ঢাকাই শাড়ি
পিন্ধ্যা যাবি বাড়ি বাড়ি
রাস্তার লোকে দেইখ্যা তোরে বুক থাপড়াইয়া মরবে ওলো॥

তাহলে তা অপ্রাসঙ্গিক নয় মোটেই। ছাদ-পিটোনোর শ্রমে, অন্যের পাকাদালান গড়তে গড়তে তাদের নিজের কামনাকেই প্রক্ষেপ করছে—যা এই ধনতান্ত্রিক সমাজে কোনোদিন পূর্ণ হবার নয়।

ছাদ-পিটোনো বা নৌকাবাইচের গান সারিগানকে যদি বলা হয় কর্মমুখী গান

তবে কি তালহীন বিলম্বিত ভাটিয়ালিকে বলবো আধ্যাত্মিক? সেই একই মাঝি বা ক্ষেতের কৃষক কর্মবিরতির সময় যে গান গায় তা কর্মের বিরতিমাত্র এবং বিরতিতে কর্মটাই প্রক্ষিপ্ত, সেটা কর্ম থেকে বিচ্ছিন্নতা বুঝায় না। সারিগান—তা রচনার দৈনন্দিন বিষয়বস্তুতে, ছন্দ ও সুরের মাত্রাশ্রয়ী খাড়া ওঠানামায় ও সমবেত কণ্ঠের উল্লাসে—যদি হয় বহির্মুখী তবে ভাটিয়ালির একক বিলম্বিত বিস্তারে ও রচনার বক্তব্যে তা অন্তর্মুখিন। কিন্তু অন্তর্মুখিন হলেই তা আধ্যাত্মিক হয় না। এখানে ব্যষ্টি সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শ্রমজীবনের বঞ্চনা তাতে আর্তি ও অনুযোগ এনেছে কিন্তু তাতে শ্রমজীবন-বিমুখতা ব্যক্ত হয়নি। যেখানে সেই বিমুখতা এসেছে—এবং 'অনিত্যসংসার' ছেড়ে পরলোকের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে—সেখানে শোষকশ্রেণীর আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে ভাটিয়ালি স্বধর্মচ্যুত হয়েছে। প্রত্যক্ষ শ্রমের সাফল্যের আনন্দ যখন ব্যক্ত হয় ভাটিয়ালিতে:

সেলাম চাচা, সেলাম তোমার পায়
বড় নাওএর মাঝি মোরে বানাইছে আল্লায়।
কইও গিয়া চাচীর কাছে
আল্লায় মোরে দিন দিয়াছে
গুণটানাটান ঘুইচ্যা গেছে বইসাছি পাছায়।···

'গুণটানা নাইয়া' নৌকার 'হাইলধরা' প্রধান মাঝির পদে 'প্রমোশন' পেয়েছে। শ্রমজীবনের এর চেয়ে বড়ো সাফল্য আর কি থাকতে পারে? তাই বাপ-মা-মরা ছেলেকে যে-চাচী মানুষ করেছিল, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা সুরে সুরে নির্জন পল্লীর বাতাসকে মুখর করে তুলছে। কিন্তু শ্রমের ফল থেকে যখন সে বঞ্চিত হল তখন শুনতে পেলাম:

মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমিতো আর বাইতে পারলাম না॥
আমি সারা জনম বাইলাম বৈঠারে
নদীর কূল কিনারা পাইলাম না॥
একে আমার ভাঙা তরী
পাপের বোঝা হৈল ভারি
এখন উপায় কি করি
আমি আর কতকাল বাইবো বৈঠারে
নৌকা ভাইট্যায় ছাড়া উজায় না॥···

যদিও সামন্তবাদী ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে 'পাপের বোঝা' ভারি হওয়ার ধারণা এসেছে তবু সমস্ত গানটিই কিন্তু তার বঞ্চনার ইতিহাস। দিনরাত্রি শ্রম করেও তার ফল থেকে সে বঞ্চিত। বহির্জীবনে এই বঞ্চনার কারণ সে জানে না, শোষণের স্বরূপ সে বুঝতে পারেনি—তাই অন্তর্জীবনে গুমরে মরছে। সারাজীবন বৈঠা মেরে নদীর কুলকিনারা না-পাওয়াটাতে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বেড়ানোটা শোষণব্যবস্থার উপর আবরণ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে মনে পড়ে কার্ল মার্কসের উক্তিটি: 'Religious suffering is at the same time an expression of real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the sentiment of a heartless world, and, the soul of soulless conditions'. যাকে আধ্যাত্মিক বলা হয় সেই সব গানে জীবনের বঞ্চনাই ব্যক্ত।

আর একটি জনপ্রিয় ভাটিয়ালির কথা ধরা যাক:

এ ভবসাগরে রে ক্যামনে দিমু পাড়ি রে
দিবানিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইয়া॥
ও মনরে—ভবেরি বাজারে আইলাম
যোল আনা লইয়া
আমার সর্বস্বধন লুইট্যা নিল
ডাকাইতে লগ পাইয়া॥···
ও মনরে—ভবসাগরের ঢেউ দেখিয়া
প্রাণপাখি যায় উড়িয়া রে
শূন্যঘাটে পইড়্যা রইলাম
ভাঙাতরী লইয়া রে॥···

ভবের বাজারে সর্বস্ব অপহরণকারী ডাকাতটি কে? আর সর্বস্ব হারিয়ে ভাঙাতরী নিয়ে শূন্যঘাটে পড়ে থাকার কারণটি কি? এর পিছনে যাঁরা আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বেড়ান—খুঁজুন, কিন্তু আমরা জানি এর পিছনের ইতিহাসটা।

আর একটু এগিয়ে গেলে আমরা ভাটিয়ালিতে গুরুবাদের রূপকে যে-ছবিটি পাই তা আরও পরিষ্কার:

তোমার শ্রীচরণে এ নালিশ জানাই—দয়াল গুরু ও
বড় দুঃখে দুঃখী আমিও গুরু, ভবে কেউ নাই আপনার॥

গুরু ও—আমার বাড়ির চারিধারে
ডাকাইতের দল বসত করে—ও
মনা ডাকাইত দলের সর্দার, ও
তারা লুটে করে ছারেখার ॥
গুরু ও—আমার সাতপুরুষের বাড়িখানা
তাতে জমিদারের খাজনা দেনা—ও
আমায় কখন জানি উচ্ছেদ করে—ও
খাজনার যমরাজা তহশিলদার ॥

এর আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে কি ? 'জমিদার' ও 'তহশিলদার' কথাগুলিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে পণ্ডিতরা হয়ত এগিয়ে আসবেন, কারণ তাঁদের কানে এই কথাগুলি 'অকাব্যিক' ঠেকবে নিশ্চয় । বহু মুরশিদি ভাবধারাপ্রভাবিত ভাটিয়ালিরও শ্রেণীশোষণের চরিত্রটি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না । যেমন :

আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না
শুনেন গো মুরশিদ ।
মুরশিদ ও—কারো বা আছে হাতী গো ঘোড়া
আমার আছে কানা মেড়া—ও
মেড়ায় পুব চিনে পচিম চিনে না—ও
শুনেন গো মুরশিদ ॥
মুরশিদ ও—কারো বা আছে দলান গো কুঠা
আমার আছে ভাঙা ডেরা—ও
ডেরায় মেঘ মানে তুফান মানে না—ও
শুনেন গো মুরশিদ…॥

মুরশিদের কাছে নালিশটা অত্যন্ত স্পষ্ট । এতে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই । শোষণের বিরুদ্ধে এই পরোক্ষ প্রতিবাদের গানগুলি আমাদের নিগ্রো স্পিরিচুয়্যালের কথা মনে করিয়ে দেয় ।

কিন্তু ক্রমশ দেহতত্ত্বের মিষ্টিক সাধনপদ্ধতির কূট ধাঁধায় এবং বৈষ্ণবী আত্ম-সমর্পণে সমাজসচেতনতা গেল হারিয়ে । এবং যতই গান দেহতত্ত্বের কুলকুণ্ডলিনীর পাকে জড়িয়ে পড়ল ততই একশ্রেণীর গবেষক 'ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা'র আস্বাদ পেয়ে খুশি হয়ে উঠতে লাগলেন, আর প্রচার করতে লাগলেন আহা, এই তো আসল লোকসংগীত !

তত্ত্ব ও সত্য

সাধারণভাবে আমাদের লোকসংগীতে যেসব তত্ত্বমূলক গান আছে—সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব ইত্যাদি—সকলকেই এককথায় আমরা দেহতত্ত্ব বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। বাউল ও সুফিদের নিগূঢ় তত্ত্বকথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।

যদি সেই নিগূঢ় তত্ত্বকথাই বাউলগানের আসল বক্তব্য হত তাহলেও তা লোকসংগীতের আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য হত না; কারণ লোকসংগীত একটি জনসমাজের সৃষ্টি, তা গুহাবাসী বা আখড়াবাসী যোগী বা তন্ত্রাচারীর সৃষ্টি হতে পারে না। বাউল গানের তত্ত্ব একটা সমাজসত্যের উপরেই একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার রচনায় ও সুরে সেই সহজিয়া সত্যটিই নিঃস্ব জনসাধারণের যৌথ আবেগকে আন্দোলিত করতে পেরেছিল। সেই সহজিয়া সত্যটি কী? কেনই বা আমাদের দেশের সমাজপতিরা একদিন বাউল-খেদা আন্দোলনে মেতে উঠেছিলেন?

শ্রেণীসমাজের উৎপত্তির পর থেকেই শোষকের ধর্মের পাল্টা শোষিতের ধর্ম নানা নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। বুনিয়াদের শ্রেণীসংঘাতটা উপরিসৌধে এসে বাহ্যত ধর্মের সংঘাত বলে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের দেশের অগণিত কৃষক-বিদ্রোহের বিদ্রোহী নেতারা বিশেষ বিশেষ গণধর্মের পতাকার তলে জনতাকে জড়ো করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু বা কানুও তেমনি এক বিশেষ ভগবানের দূত হিসেবেই সাঁওতাল জনসমাজে গৃহীত হয়েছিলেন। ফরিদপুরের ফরাজি বিদ্রোহ ও তাদের নেতা দুধুমিঞার মোল্লাতন্ত্র-বিরোধী ধর্মমত কিংবা ধর্মসংস্কারক ওয়াহাবিদের বিদ্রোহের কথা আমরা জানি। অন্যান্য রাজ্যেও তেমনি বহু দৃষ্টান্ত আছে। মুণ্ডাবিদ্রোহ ও বিরশা 'ভগবানে'র নতুন ধর্মমত প্রচারের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। আসামে আহোম রাজাদের বিরুদ্ধে মোয়ামারিয়া বিদ্রোহীরা ছিল রাষ্ট্রীয় শক্তিধর্মের বিরুদ্ধে শঙ্করদেব-শিষ্য অনিরুদ্ধ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী।

বাউল মতবাদের বিকাশ হয় সামন্তসমাজের শাসকশ্রেণীর প্রতিকূল মতবাদ হিসাবেই। বাউলরা প্রচলিত ধর্ম, জাতি বা বর্ণবৈষম্য, দেবদেবী, পূজাআচার, নামাজ-রোজা, মন্দির-মসজিদ কণ্টকিত সামন্তসমাজের ধ্যানধারণাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতেন, এবং সেই ভাবধারাতেই আপ্লুত তাঁদের 'মনের মানুষ' এক নতুন মানবতাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সামন্তসমাজে নিপীড়িত জনমানসে

তাই সেই মানুষটি আসন পাততে পেরেছিল। সমাজের অতিদরিদ্র, ভূমিহীন, নিঃস্ব চাষী ও তথাকথিত নিম্নজাতি থেকেই বাউলরা এসেছিলেন। কিংবদন্তি আছে, সুফিসাধক পারস্যের মনসুর হল্লাজকে গোঁড়া শরিয়তিরা পুড়িয়ে মেরেছিল—কারণ তিনি বলেছিলেন 'আনাল হক্'—আমিই সেই ঈশ্বর। ঠিক তেমনি সমাজপতিদের হাতে লালন ফকির প্রমুখ বাউলদের নিগ্রহের কাহিনীও প্রচলিত আছে। বাউল দর্শন মানুষমুখী, ইহজীবনমুখী, তবু কেন তারা বিবাগী, কেন নিজেরা বলে : 'আমরা পাখির জাত'! তার কারণ আচারবিচারের প্রহরী-ঘেরা বর্ণহিন্দুর সমাজের অচলায়তনে মুক্তমতি বাউলদের বাসা বাঁধবার কোনো সুযোগ ছিল না। এই 'মুক্তডানা' পাখির জাত ছিল সামন্ততন্ত্রী শেকলে বাঁধা মেহনতকারী মানুষের মুক্তিকামনারই প্রতীক ও প্রতিনিধি।

সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন না আসায়, সামন্তসমাজের বিরুদ্ধে কৃষিবিদ্রোহগুলি সব ব্যর্থ হওয়ায়—জনজীবনে সামন্তবাদী আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেজন্য লোকায়ত বাউল মতবাদে বিভিন্ন পশ্চাদমুখী ধর্মীয় মিশ্রণ ঘটতে থাকে। বাউলরা শ্রমজগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আখড়াবাসী হতে লাগলেন এবং আত্মকেন্দ্রিক তন্ত্রাচারী যোগী হয়ে উঠলেন।

সেজন্য বাউল বা মুরশিদি গানকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এক মানবতাবাদী প্রতিবাদে ধ্বনিত—যাকে protest songs বা 'প্রতিবাদী গীতে'র পর্যায়ে ফেলতে পারি। অন্য ধারাটি হল কেবল গুহ্যতত্ত্বাশ্রয়ী জীবনবিমুখী প্রতিক্রিয়াশীল ধারা। আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক প্রজননের প্রক্রিয়ার ধারণা থেকেই বাউলদের দেহতত্ত্বের উৎপত্তি। প্রথম ধারায় বৃহত্তর কৃষিসমাজের উৎপাদনের মধ্যে সেই তত্ত্বটি অন্তর্লীন, কিন্তু উপরোক্ত দ্বিতীয় ধারায় সেই তত্ত্বটি উৎপাদনের শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তন্ত্রাচারী বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। এইসব বাউলরা এক গুহ্যসাধনমার্গের অন্ধকার পথে সমাজচেতনতা হারিয়ে ফেলে ষটচক্র, ছয়লতিফা বা ত্রয়ী নাড়ী, ঈড়াপিঙ্গলাসুষুম্নার ত্রিবেণীসঙ্গমের বা 'আবহাওয়াতে'র কূট তত্ত্ব নিয়ে উপমার হেরফের করে একই ধরনের অসংখ্য গান রচনা করেছেন যা বক্তব্য হিসেবে অসার ও রচনা হিসেবে অসার্থক।

বাউল সংগীত ও সাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। সবাই জানেন বাউল সংগীত ও বাউল দর্শন রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এ-প্রভাব এত গভীর ছিল যে পোশাকে-পরিচ্ছদে, ভাবে ও সুরে তাঁকে বলা হতো রবীন্দ্র-বাউল। তিনি নিজেও অনেকবার সেকথা ব্যক্ত

করেছেন। বাউলদের মুক্তমতি মানবতার দর্শনই রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল। বাউলের মানবিক আবেদনে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : '…এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায় ভাবের গভীরতায় সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।'

'যাঁরা …প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন,' সেই শিক্ষিত শ্রেণীর সভাসমিতিকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ নিরক্ষর পল্লীবাউলের 'মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের' সাধনায় 'ইস্কুল কলেজের অগোচরে' 'বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে' হিন্দুমুসলমানের মিলনের চিরস্থায়ী আসন অলক্ষ্যে রচনার কথা ব্যক্ত করেছেন। আবার সেই একই প্রবন্ধে (মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি'র আশীর্বাদ-পত্রে) রবীন্দ্রনাথ বলছেন : 'সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেমনি, তার ভালোমন্দের ভেদ আছে।… অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের শস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেকস্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ,—তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টানবার প্রচারকগিরি।…এই জন্যে সাধারণত যে-সব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার, কি সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশি নয়।'

বাউলগানের দুটো দিকই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের কিছু কিছু গবেষককে এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসর্বস্ব হাস্যকর উপমাযুক্ত বাউলগানের ভাবে বিভোর হয়ে 'খাঁটি লোকসংগীতে'র সন্ধান পেয়ে আত্মহারা হয়ে যেতে দেখেছি।

বাউল-দুনিয়ার মধ্যমণি লালন ফকিরের জীবনকাহিনী ও তাঁকে ঘিরে নানা কিংবদন্তির মধ্যে বাউলের মর্মকথা রূপায়িত হয়েছে। মেহনতি জনসাধারণ তার মানসমূর্তিকেই কিংবদন্তির মধ্যে রূপায়িত করে। কিন্তু কাঙাল হরিনাথের অপ্রকাশিত 'দিনপঞ্জি'তে দেখি সত্যি সত্যি লালন-চরিত্র—ভোলা বাউল আবার প্রয়োজন হলে হতে পারেন জাঁদরেল লাঠিয়াল। হাতের একতারাটি রেখে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাঠিও ধরতে পারেন। কাঙাল হরিনাথ তাঁর পত্রিকা 'গ্রামবার্তা'য় জমিদারের প্রজানিপীড়নের খবর ছাপানোর জন্য সেই জমিদার যখন কাঙাল হরিনাথকে শায়েস্তা করার জন্য লাঠিয়ালের দল পাঠান, তখন লালন তাঁর দলবল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে টিট্

করে সুহৃদ কৃষক-বন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করেন। [কাঙাল হরিনাথের দিনপঞ্জি—শ্রীঅরুণ রায়ের সৌজন্যে]। লালনের গান ও জীবনে এখানেই মিল। এ মিল না দেখলেই লাগে তত্ত্ব ও সত্যের গরমিল।

লালন যখন জাতকে পদাঘাত মারেন :

সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন কয় জেতের কিরূপ দেখলাম না এ নজরে ॥...
জগৎ বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা তথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে ॥

তখন সামন্তসমাজের বর্ণাশ্রমের বুকেই সে-লাথিটা গিয়ে লাগে। শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের সমষ্টিগত ঐক্যের জন্য, কর্ম ও জাতের গণ্ডিকে ভেঙে ফেলার বাণী ছিল সংগ্রামেরই বাণী। তার অনেক পরে গণতান্ত্রিক চেতনার ব্যাপক বিকাশের পর কাজী নজরুল লিখেছিলেন : 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাতজালিয়াত খেলছে জুয়া।'

লালনের মানুষতত্ত্বে সবরকমের মূর্তিপূজা নিন্দিত ও পরিত্যক্ত

মাটির ঢিপি, কাঠের ছবি
ভূত ভাবে সব দেবাদেবী
ভোলে না সে এসব জপি
ও যে মানুষ-রতন চেনে।...ইত্যাদি।

কিংবা :

ফকিরি করবি ক্ষেপা কোন রাগে
আছে হিন্দুমুসলমান দুইভাগে ॥
থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন
ভেস্ত স্বর্গ ফাটক সমান
কার বা তা ভালো লাগে ॥

যে দেশে ঔপনিবেশিক শাসকদের সহায়তায় সামন্তীয় সংস্কৃতি-সংক্রমিত গ্রাম্য সমাজে 'ইহসংসারে পাপের বোঝা খালাস করার জন্য' স্বর্গ আর বেহেস্তের সন্ধানে মানুষকে ধাওয়া করানো হতো, সেই সমাজে 'ভেস্ত স্বর্গ ফাটক সমান'

বলার দুঃসাহসিক বলিষ্ঠ জীবনবাদের গীত গেয়ে জনসংস্কৃতির নতুন চেতনা এনেছিলেন বাউলরা। কখনো কখনো লালনের গানে রূপকের ছলে যে-ছবিটি পাই তা প্রত্যক্ষ শ্রেণীশোষণের :

রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরেরও সে শিরোমণি
নালিশ করবো আমি
কোনখানে কার নিকটে।…
গেল ধনমান আমার
খালিঘর দেখি জমার
লালন কয় খাজনারো দায়
কখন যেন যায় লাটে॥

অনেক সময় তত্ত্বকথার আশ্রয় না নিয়ে তাঁরা সোজাসুজি ভাবাদর্শের সংগ্রামে নেমেছেন। পরবর্তী বাউলদের মধ্যে লালনের শিষ্য দুদ্দুশাহ ছিলেন এ-বিষয়ে অগ্রণী, যদিও লালনের রচনার কাব্যগুণ তাঁর ততটা ছিল না। দুদ্দুশাহ বলছেন :

বল্লালসেন শয়তানী দাগায়
গোত্রজাত সৃষ্টি করে যায়
বেদান্তে আছে কোথায়. আমরা দেখি নাই।
জাতি আর সম্প্রদায় মিলে
ভারত শ্মশান করিলে
বিনয় করে দুদ্দু বলে বুঝে দেখ ভাই॥

অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বাউলরা শাণিত যুক্তিবাদের হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়েছিলেন অসীম সাহসে। যেসব মুসলমান মাতৃভাষা থেকে আরবিভাষাকে বেশি পবিত্র মনে করেন—কারণ, কোরাণ সেই ভাষাতেই লেখা—তাঁদের বিরুদ্ধে দুদ্দুশাহ মোক্ষম যুক্তি হাজির করেছেন :

মহম্মদের জন্ম যদি হতো এদেশে
বেহেশ্‌তের কোন ভাষা হতো বলতো এসে।
মাতৃভাষা ত্যজে সবাই
আরবিভাষা শিখলেরে ভাই
তাতে ভাই ফয়দা তো নাই অবশেষে॥

প্রত্যেক জাতির স্বাধীন সত্তার প্রধান অভিব্যক্তি যে ভাষা—অনেক রক্তদানে

যেকথা বাংলাদেশের লোকে শিখেছে—আশ্চর্য লাগে বাউলদের গণতান্ত্রিক তত্ত্বে সে-চেতনা অনেকদিন আগেই এসেছিল।

কিন্তু আমাদের অর্ধ-ঔপনিবেশিক সমাজে, ভূমিতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় নব্য-ভূম্যধিকারীর নিরঙ্কুশ শোষণে পল্লীজীবনের কৃষিসংকটের আবদ্ধ জলাশয়ের গেঁজলায় বাউল তত্ত্বেরও সামাজিক চেতনার বহির্মুখিতা তন্ত্রাচারী যোগাসনের গুহ্যদুর্বোধ্যতা এবং অর্থহীনতায় ডুবে গেল। যে-বাউলরা বলতেন 'দেবের দুর্লভ মানবজন্ম তোমার' সেই বাউলরা আবার যখন দেখলেন 'মানবজনম সফল হইল না' তখন তাঁরা ভাগ্যের কাছে বৈষ্ণবীয় আত্মসমর্পণের আশ্রয় নিলেন। দোষী করলেন 'ষড়্‌রিপুকে', তাকাতে পারলেন না পরশ্রম-অপহরণকারীদের দিকে। উৎপাদনকারী শ্রমজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মরতিতে নিমগ্ন হলেন। এমনকি যে-লালন পরজন্মের চিন্তাকে পশ্চাৎ করে মনুষ্যজীবনকে শ্রেষ্ঠ জীবন বলেছেন—দীর্ঘজীবী সেই লালনকে দেখি পরপারের ভাবনায় আকুল :

পথেরো গোলমালে পড়ে
ডুবলাম কূপজল মাঝারে
লালন বলে কেশে ধরে
কূলে নাও গুরু আমায়।

কিংবা :

কলির জীবকে হয়ে সদয়
পারে যেতে ডাকছে নিতাই
অধীন লালন বলে, মন চলো যাই
এমন দয়াল মিলবে না।

যে-বাউলরা একসময় গাইছিলেন :

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমার পথ রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।...

সেই বাউলরাই পরে নমাজ, রোজা, শরিয়তের প্রচার করতে লাগলেন। পরলোক-প্রত্যাশী ধর্মের বিরুদ্ধে যে-বাউলরা ইহজীবনের জয়গান গেয়েছিলেন :

আমি এমন জনম পাব কিরে আর
এমন চাঁদের বাজার মিলবে কিরে আবার?

সেই বাউলদেরই কেউ কেউ একেবারে যমরাজের প্রচারক হয়ে উঠলেন :

একূল আর ওকূল, হারায়ে দুকূল
কবে ফুটিবে মন তোর বিয়ের ফুল।
যাব চলন করি বাঁশের দোলায় চড়ি
জাতবেহারীর স্কন্ধে চড়ি
সকল হবে ভুল ;
আগে পাছে কাষ্ঠের বোঝা
ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা
শ্বশুরবাড়ী হবে রে তোর নদীর কূল।...
বরণ কুলাতে দিবে, বরশয্যায় শোয়াইবে
আট কড়াকড়ি দিবে তুলসীর মূল...
উত্তর শিয়র করে হাত পা ভাঙ্গিয়া তোরে
অনল জ্বালিয়া শেষে করিবে নির্মূল।...

এ একটি বীভৎস গীত। শ্মশানঘাটের চিতাশয্যায় বিয়ের বাসর। মনুষ্যদেহের অগ্নিদাহনের এই নারকীয় বর্ণনা—লোকসংগীতের লোকায়ত জীবনদর্শনের এক বিকট ব্যঙ্গ।

আবার বহু বাউল-গানের দেহতত্ত্ব আধুনিক জগতের উপমার চমৎকারিত্বে এবং কখনো কখনো ধাঁধা সৃষ্টি করেই চলতে লাগলো :

বাপের যখন হয় নি জনম
নাতি এলো তিনজনা
প্রেম কারিগর রসিক সুজন
গড়লো প্রেমের কারখানা।

পূর্বেই বলেছি বাউলের দু-ধারার কথা। শেষোক্ত ধারায় বিচ্ছিন্নতাব্যাধি-পীড়িত একদল শহুরে বুদ্ধিজীবী বেশ মজেছেন। কোনো বঙ্গদর্শী বুদ্ধিজীবী হিপি-দর্শন ও বাউল-দর্শনের মধ্যে এক সাদৃশ্য আবিষ্কার করে এক অভিনব 'থিসিস' হাজির করেছেন। তিনি লিখছেন : 'এযুগের হিপিদের সঙ্গে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব সহজিয়াদের অনেকদিক থেকে মিল আছে। প্রেম-ভালবাসা হিপি-জীবনের বড় আদর্শ। হিপিদের আস্তানায় ও জমায়েতে 'লভ' কথাটা তাই বড় করে ব্যানারে লেখা থাকে। ভাবাশ্রিত হবার জন্য হিপিরা 'পট'-ধূম (কতকটা গাঁজা-সিদ্ধির মতো), নানারকম ড্রাগ ও সুরা পান করেন, সহজিয়ারাও গঞ্জিকা-সিদ্ধি সেবনে অভ্যস্ত। উভয়েরই মতে তাছাড়া নাকি 'ভাব' আসে না এবং ভাবের বায়ুলোকে বিচরণ

করা যায় না। সহজিয়ারা সমাজ-পরিবার বর্জন করতেন এবং কোনো বাহ্যাচার বা নীতিবন্ধন মানতেন না। হিপিরাও তাই, তাঁরা বর্তমান সমাজ ও পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে যত্রতত্র সহজিয়াদের মতো চলেফিরে বেড়ান। নিজেদের আহার-বিহারে ও মেলামেশায় স্ত্রী-পুরুষ হিপিরাও ভ্রাম্যমাণ বাউলের মতো কোনো সামাজিক নীতিবন্ধন মানেন না। সহজিয়াদের মতো হিপিরাও গুরু-বিশ্বাসী এবং মাথার চুলদাড়ি পোশাকপরিচ্ছদের দিক থেকেও তাঁদের বাউল-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। হিপিবিদ্রোহকে তাই আধুনিক যন্ত্রযুগের সহজিয়া বিদ্রোহ বলেছি।'

বাংলাদেশের জমিদারী শোষণ, বর্ণহিন্দু শাসিত সমাজের নিপীড়নে নিঃস্ব, ঘর-ছাড়া বাউলদের সংসার-নিরাসক্তির সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ-শোষণজাত, ধন-প্রাচুর্যের অপজাত কোটিপতি সন্তান হিপিদের মারিজুয়ানার 'সাইকেডেলিক' তুরীয়মার্গের সম্পর্ক খুঁজে পেয়ে বর্তমান বাংলার বিচ্ছিন্নতা-ব্যাধি ক্লিষ্ট কিছু পণ্ডিত গবেষক আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। এই যুক্তিতেই তাঁরা পুরী বা কোনারকের মন্দিরগাত্রের মৈথুনরত যুগলমূর্তির সঙ্গে আজকের শিক্ষিত সমাজের ব্যভিচারের সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন, কিংবা ভারতের কোনো কোনো উপজাতির মেয়েদের বক্ষাবরণহীনতা থেকে আজকের ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমী নাগরিক জীবনের মেয়েদের 'টপলেসে'র সাদৃশ্যটাও খুঁজে পাবেন।

পল্লীসমাজের সংগীত ও সংঘাত (দুই)

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে যে আলোচনা করেছি তাতে দেখাতে চেয়েছি গ্রাম্যজীবনে সামাজিক শ্রমের সাথে যুক্ত সমাজের পিরামিডের পাদদেশের 'শূদ্র' আর পিরামিডের তুঙ্গে বসা শ্রমজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 'ভদ্রে'র জীবনদর্শনের সংঘাত কিভাবে লোকসংগীতে প্রতিফলিত হয়েছে। শূদ্রেরা যখনই সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছে, তখনই ভদ্রের দর্শন তাকে অভিভূত করেছে। অতি গোপনে অতি সূক্ষ্মভাবে চলেছে এ সংগ্রাম—ভাবে, ভাষায়, এমন কি সুরে। ভদ্রশ্রেণী লোকসংগীতকে তার ভাবধারায় বিকৃত করে তার শ্রেণীস্বার্থে জনসাধারণের আফিম রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছে। যেখানে পারেনি, সেখানে ভদ্রশ্রেণী সেই লোকসংগীতকে সংগীতের মর্যাদা দিতেই অস্বীকার করেছে, এমনকি নিষিদ্ধ করেছে। শুধু আমাদের দেশে নয় সব দেশেই তা ঘটেছে।

ইয়োরোপের ধ্রুপদী সংগীত-স্রষ্টারা লোকসংগীত থেকে প্রচুর আহরণ করলেও সেসিল শার্প, বেলা বারটক্ প্রমুখ চিরস্মরণীয় লোকসংগীত-গবেষকরাই গত শতাব্দীতে লোকসংগীতকে স্বাধীন স্বতন্ত্র সংগীতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। উচ্চাঙ্গ মিউজিকের ছিটেফোঁটাতেই লোকসংগীত গড়ে উঠেছে—এর আগে অধিকাংশেরই ছিল এই বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাস। আমাদের দেশে লোকসংগীতকে নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথই। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে গণমনে যে দোলা উঠেছিল তাতে হুবহু লৌকিক সুরের মুক্ত হাওয়ায় গানের পাল খাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তথাপি তাঁর নিজের সাধু রচনাকে আশ্রয় করেই তা সম্ভব হয়েছিল। লোকসংগীতের আঞ্চলিক ভাষার ও স্টাইলের স্থান ছিল না। ত্রিশ দশকে আব্বাসউদ্দীন যখন কোচবিহারী ভাওয়াইয়া গান 'নদীর নাম সই কচুয়া, মাছ মারে মাছুয়া' গানটি রেকর্ড করতে গেলেন, তখন কোম্পানির কর্তারা কিছুতেই এই 'ইতর' ভাষায় রেকর্ড করতে রাজি হলেন না। অবশেষে সুর ঠিক রেখে কাজী নজরুলকে দিয়ে ভদ্রভাষায় তার রূপান্তর করলেন : 'নদীর নাম সই অঞ্জনা, নাচে তীরে খঞ্জনা'—তারপরে রেকর্ড করলেন। কিন্তু আব্বাসউদ্দীনের সহজাত গ্রাম্য সংগীত-মানস উপলব্ধি করেছিল, এই ভদ্রভাষার ব্যবহারটা পাখির ডানা কেটে নেওয়ার মতোই হয়েছে। তিনি

সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন, তাঁর সহায় ছিল ত্রিশোত্তর গণজাগরণ। অবশেষে 'ফান্দে পড়িয়া বগায় কান্দেরে' এবং 'ওকি গাড়ীয়াল ভাই' রেকর্ড প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সংগীত-জগতে এক বিপ্লব ঘটল—যার তাৎপর্য আজকের পরিশীলিত, বিকৃত ও ভদ্রীকৃত লোকসংগীতের ব্যবসায়িক হল্লায় হারিয়ে গেছে। সেদিন নতুন গণচেতনার সাড়া পাওয়ায় 'আনকোরা' মেঠো গানের প্রচার সাময়িকভাবে হলেও কোম্পানি হাতে তুলে নিয়েছিল—পল্লীগীতির প্রতি অনুরাগে নয়, বিরাট অর্থকরী সাফল্যের খাতিরে। অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লী-শিল্পী টেপু মিঞা বা অনন্তবালা বৈষ্ণবীদের কণ্ঠে বাংলার পল্লীর সোনারকাঠির স্পর্শ পেয়েছিল বিচ্ছিন্ন বিদগ্ধ নাগরিক সমাজ।

শচীন দেববর্মণও তাঁর সংগৃহীত লোকসংগীত প্রথমে গাইতে সাহস পাননি। তাঁর প্রথম রেকর্ড,

ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে
মাঠের বাটে যাই,
আকাশ তখন উষার সিঁথায়
সিঁদুর মাখায় ভাই।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা একটি 'ভদ্রায়িত' লোকসংগীত।

আজকে আবার শাসক শ্রেণী এবং একচেটিয়া পুঁজিপতির করায়ত্ত mass media বা গণমাধ্যমগুলি স্টার শিল্পীর লেবেল দিয়ে 'ভদ্রীকৃত' লোকসংগীতের ঢালাও প্রচার শুরু করেছে। অবক্ষয়ী নাগরিক ভদ্রসমাজের অবজ্ঞা, অজ্ঞানতা ও সুবিধাবাদ তাতে সাহায্য করছে। আজ কায়েমী স্বার্থের পাবলিসিটি ও 'সংস্কৃতি'-প্রচারের শাখা-প্রশাখা এমন বহুধা বিস্তারিত এবং তার সাথে জীবিকা ও আর্থিক সাফল্য এমনিভাবে ওতপ্রোত জড়িত যে লোকসংগীতের গবেষক-পণ্ডিতেরা প্রায় সবাই তাতে আবদ্ধ হয়ে আছেন; তাঁদের মুখ খোলার উপায় নেই। তাই তাঁদের সেমিনারে লোকসংগীতের আলোচনা—যেন মৃত জীবের 'ফসিল' নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডার মতো শোনায়। আজকের বিপদটা তাঁরা দেখেও দেখেন না—বলতে গিয়েও বলেন না।

শ্রম, প্রকৃতি ও প্রণয়

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে শ্রম ও শ্রমকামনার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বাউলগান সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেখানে যাঁরা শুধু বাউলের তত্ত্বটা দেখেন কিন্তু তার সমাজ-

সত্যটা না-দেখে বাউলগানকে লোকসংগীতের পর্যায়ে ফেলতে চান না, তাঁদের বক্তব্যকে যেমন খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছি, আবার যাঁরা বাউলের তত্ত্বসর্বস্ব তান্ত্রিক বিকৃতিকেই বাউল-দর্শনের সার কথা ভেবে হিপি-দর্শনের সাথে সান্নিধ্য খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের পাণ্ডিত্যের ভ্রান্তিকেও দেখাতে চেষ্টা করেছি।

আজ সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের লোকসংগীতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ—নরনারীর প্রেম নিয়ে সামান্য আলোচনা করব।

সংহত-উপজাতি ও অর্ধ-উপজাতি সমাজে ফসল ও সন্তান, শ্রম ও প্রণয়—এদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হতো। তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের বিভিন্ন আদি লোকসংগীতে আছে। নাগা পাহাড়ের কনিয়াক নাগাদের গোয়াং দেবতাদের উদ্দেশ্যে গান আছে, যার মর্মার্থ হল :

হে গোয়াং দেবতা,
আমাদের পাথর ও নারীকে করুণা কোরো
পুরুষ যেমন নারীকে জড়িয়ে ধরে
তেমনি ফসলের বীজ মাটিকে জড়িয়ে ধরুক।

এখানে প্রণয় ও ফসল প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে। যেখানে আদি কৌম সমাজের অনেক প্রকৃতি অব্যাহত আছে, সামন্ত সমাজের শ্রমবিভাগ খুব দানা বাঁধেনি, সেখানে আজও লোকসংগীতে তার স্বাক্ষর মেলে। আমাদের প্রান্তবর্তী রাজ্য আসামের প্রধান লোকসংগীত 'বিহু'তে তা অম্লান রয়ে গেছে। সে-গীতের ধারায় শ্রম, প্রণয়, প্রকৃতি সব অঙ্গাঙ্গি মিশে আছে। নদনদী, পাহাড়-পর্বত, পশুপাখি, লতাফুল, বনের দোলা, নরনারীর মিলিত নৃত্যগীতের দোলায় মিশে সবই আকাঙ্ক্ষিত শ্রমোৎপাদনের ছন্দে বাঁধা। আজও সেখানে ধান রোয়া ও ধান কাটার একচেটিয়া অধিকারী হল মেয়েরা। আসামে সমাজের উপরতলার শৈব বা শাক্ত ধর্ম এমনকি রাষ্ট্রশক্তি-বিরোধী ব্যাপক মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব থেকেও আশ্চর্যজনকভাবে বিহুগীত মুক্ত। রাধাকৃষ্ণ তো দূরের কথা ঈশ্বরের স্থানও সেখানে নেই। মাঝে মাঝে কখনো ঈশ্বরের নাম এসেছে নেহাৎ বক্তব্যের পরিপূরক হিসাবে--

প্রথমে ঈশ্বরে জগৎখন সৃজিলে
তার পিছত সৃজিলে জিও
সেই জন ঈশ্বরে পীরিতি করিলে
আমিনো ন করিম কিয়।

যে জন ঈশ্বরে জগৎটা সৃষ্টি করল তারপর সৃষ্টি করল জীব, সেই জন ঈশ্বর যদি পীরিতি করতে পারল তবে আমরা করতে পারব না কেন? পীরিতি ছাড়া সৃষ্টি হয় কি করে? বিহুগীতে প্রকৃতি ও প্রণয় পরস্পরের পরিপূরক—

চরাই কুমলীয়া উরিব নোয়ারে
ঘুরি ঘুরি ডালত পরে
চেনেহ্ কুমলীয়া পাহরিব নোয়ারো
ঘুরি ঘুরি মনত পরে।

পাখির কচি ছানা উড়তে জানে না' উড়তে গিয়ে ঘুরে ঘুরে ডালেতেই এসে পড়ে। কচি প্রেম ভুলতে গেলেও, ঘুরে ঘুরে মনেই এসে পড়ে।

পর্বতে পর্বতে বগাব পারো মই
লতা বগাবলৈ টান
বলিয়া হাতিক বলাব পারো মই
চেনাইক বলাবলৈ টান।

পবতের পর পর্বত আমি বেয়ে উঠতে পারি, লতা পারি না বাইতে। পাগলা হাতিকেও বশ মানাতে পারি, আমার সখীকে পারলাম না বশ মানাতে।

জোনর লগত তরাটি ওলালে
পরবত শুয়নী করি
আমার লগত সরু চেনাই ওলালে
আলিবাট শুয়নী করি।

চাঁদের সঙ্গে তারাটির উদয়—পর্বতের শোভা। আমার সাথে প্রেয়সীর গমন—পথের শোভা।

কর্মজীবনে প্রকৃতির সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব—কিন্তু কাব্যলোকে সে প্রকৃতিরই অঙ্গ। ফুল ফোটে, ফুলে ফুলে মিলন হয়ে ফল হবে বলে, পাখি গান গায়, পাখিতে পাখিতে মিলন হয়ে শাবক জন্মাবে বলে; নরনারী নৃত্যগীতে মত্ত হয়, তাদের মিলনে সন্তান জন্মাবে বলে। লোকসংগীতে প্রেম ও প্রকৃতির এই মর্মকথা—প্রকৃতির সঙ্গে identification বা অবিচ্ছিন্নতা।

তুমি হইও বটবৃক্ষ, আমি হইব লতা।

ভাওয়াইয়া গানে যেমন আছে:

দিনের শোভা সুরুযরে রাইতের শোভা চান
হালুয়ার শোভা হালকৃষি জমিনের শোভা ধান।

ধানের শোভা সবুজ রঙরে মাটির শোভা ঘাস
কাশিয়ার শোভা ধগ্‌লাফুল আসিলে ভাদ্দর মাস।
সড়কের শোভা বটবৃক্ষ বৃক্ষের শোভা ছায়া
বনের শোভা রসের ফুলফল মনের শোভা মায়া।
ফণির শোভা মণি হায়রে গজের গজমতি
মোর আঙ্গিনার শোভা হইলেন তুমি রূপবতী।

প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও মিলনের সম্পর্ক যে জনসমাজের, তাদের কণ্ঠেই এই ধরনের গান জাগতে পারে। যে-শিকারীর বাণে হরিণ বিদ্ধ হয় হরিণীর দুঃখে সে-ই আবার গান রচনা করে। যে-শিকারীর ফাঁদে বক ধরা পড়ে 'বগী'র দুঃখে সে-ই আবার গান গায়:

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে।
উড়িয়া যায়রে চকোয়া পঙ্খি
বগীক বলে ঠারে
তোমার বগা বন্দী হইছে ধর্লা নদীর পারে।
এই কথা শুনিয়া বগী দুই পাখা মেলিল—
ওরে ধর্লা নদীর পাড়ে যায়া, দরশন দিলরে;
বগাক দেখিয়া বগী কান্দেরে
বগীক দেখিয়া বগায় কান্দেরে।...

এইসব ছবি কালিদাসের বা রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে কোনোদিনই আসতে পারে না। কারণ মহাকবিরা দূরের ধ্যানস্থ দর্শক আর লোক-কবিরা প্রকৃতির লীলাখেলার সক্রিয় অংশীদার।

প্রণয় ও প্রতিবাদ

কৌম গোষ্ঠী-সমাজের সমানাধিকারের স্থলে এল সামন্তসমাজের পুরুষপ্রাধান্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যপ্রথা, বংশকৌলিন্য, শাঁখা, সিঁদুর, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি। তারই সমর্থনে এল নতুন মূল্যবোধ, নতুন ধ্যানধারণা ও ধর্মচিন্তা। কিন্তু শ্রমজীবী সমাজ তা সহজে মেনে নিল না। এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদে গানে, গল্পে, গাথায় নানাভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রথম দিকে কোনো রূপকের আশ্রয় না নিয়েই তা ব্যক্ত হয়েছে। তাই প্রেমে বিচ্ছেদ ও বিরহই প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতের লোকসংগীতের প্রণয় গীতে সর্বত্র এই সুর।

এ বিষয়ে বাংলাদেশে কাব্যে, সুরে, আর্তি ও আকুতিতে সবচেয়ে আবেগময় হল উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান। তার আবেদন প্রত্যক্ষ, তার উপমা ও প্রতিমা অতি জীবনঘনিষ্ঠ। কারণ উত্তরবঙ্গের কোচরাজবংশী সমাজ আদি ট্রাইব্যাল সমাজের প্রাণশক্তি অনেকখানি বজায় রাখতে পেরেছে।

ওকি একবার আসিয়া
সোনার চান্দ মোর যাও দেখিয়ারে
কুড়া কান্দে কুড়ি কান্দে কান্দে বালি হাঁস
ওরে ডাহুকীর কান্দনে মুই
ছাড়নু ভায়ার দেশ্ রে ॥
আইলত ফুটে আইল কাশিয়া
দোলাত ফুটে হোলা
ওরে বাপমায় বেচেয়া খাইছে
সোয়ামী পাগেলারে ॥

উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ভাষায় 'বেচেয়া খাওয়া' মানে বিয়ে দেওয়া। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাপ-মা পাগলা স্বামীর কাছে টাকা খেয়ে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। এখানে নিজের মা-বাবার বিরুদ্ধেও অভিযোগ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ভাওয়াইয়া গানকে তাই এক কথায় সামন্ত-সমাজের বিরুদ্ধে নারী জাতির প্রতিবাদের গান বলা চলে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে গানগুলি সব মেয়েদের রচনা। মেয়েদের মুখ দিয়ে গ্রাম্য সমাজের পুরুষেরাও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ও মোর ভাবের দেওরা
থুইয়া আয় মোক বাপ ভাইয়ার দেশে রে।
বাপ ভাই মোর দুরাচার
বেচেয়া খাইছে মোক দূরান্তর রে
বেচেয়া খাইছে মোক মদকিয়ার ঘরেরে ॥
মদকিয়া মদ খায়
আগুন দিতে মোর রাতি পোহায় রে—
নলের ডালে শরীল কইল মোয় কালারে ;
কাশিয়া আর ঘাগের ফুলেরে
নদী করছে দেওরা হুলুস্থুল রে—

কোন জনায় করিবেক পার মোক
এ দরিয়ার পার রে ॥

আমাদের পল্লীসমাজে নিজের মতে নয়, নিষ্ঠুর প্রথায় যেখানে মেয়ের বিয়ে হয় সেখানে স্বামীর চেয়েও আপন হল দেওর। মনের দুঃখের কথা কেবল দেওরকেই বলা চলে। বাপ ভাই জবরদস্তি করে মাতাল স্বামীর কাছে বিয়ে দিয়েছে—তার সেবাতেই মেয়েকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ভাবের দেওরা এই কারাগারে দেবদূত। তার কাছেই নালিশ ও আবদার। গানের শেষ স্তবকে আকুতিভরা যে অনুপম ছবিটি মাত্র দুটি কলিতে ফুটে উঠেছে বিদগ্ধ কাব্যে তার তুলনা নেই। সুরাশ্রিত হয়ে সেইসব কাব্য পল্লীসমাজের ঘরে ঘরে বহু গৃহবধূর গোপন চোখের জলে মিশে যে অলিখিত মহাকাব্যের অধ্যায়গুলি রচনা করেছে, ত্রিশোত্তর বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলে একদিন তার আবিষ্কারের আনন্দ-বিস্ময় দেখেছিলাম। কিন্তু আজ শিক্ষা ও সংগীত সাহিত্য ও সংস্কৃতির গণমাধ্যমের বহুমুখী প্রচারে—আকাশবাণীর শত শত লোকসংগীত-গায়কের কণ্ঠে সেই আনন্দ-আকুতির রেশটুকুও মেলে না। কারণ আজ তাঁদের অধিকাংশই দরদী আবিষ্কারক আর নন—তাঁরা আত্মপ্রচারক, এমন কি প্রতারক।

তিন তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং গ্রাম-উন্নয়নের গালভরা পরিচালনায় গ্রাম্যজীবনের উৎপাদন সম্পর্কের কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি এবং তার সাথে superstructure বা উপরিসৌধের ধ্যানধারণা ও সামাজিক সম্পর্কের কোনো রূপান্তর ঘটেনি। কাজেই কাব্যিক বা সাংগীতিক আবেদনের দিক দিয়েই কেবল নয়—সামাজিক দিক দিয়েও এই গানগুলির আবেদন অক্ষুণ্ন আছে।

আবার কখনো এই বিরহের কারণ, চরম দারিদ্র্য। ধনীর বাথানে দূরে যুবতী স্ত্রীকে বাড়িতে ফেলে গ্রামের যুবককে মহিষের সঙ্গেই জীবন কাটাতে হয় জীবিকার তাগিদে—

বাথান বাথান করেন মৈষালরে
মৈষাল, বাথান কইরচেন বাড়ি—
যুবা নারী ঘরে থুইয়া,
কায় করেন চাকিরি মৈষাল রে।
ছোট্টকালে হইচে বিয়ারে
ও মৈষাল বয়স ভাটি গেল্

না হইলং মুই ছাওয়ার মাও
মনে দুখ মোর রৈল, মৈষালরে।
উজান খাইলে মেঘ মেঘালীরে
দক্ষিণ খাইলে বাশে
কেমন ধনীর চাকিরি করেন
বিদায় না দেয় কেনে, মৈষাল রে।
অকারি চাউলের ভাতরে, মৈষাল
বকনা ভৈষের দুধ
তুই মৈষাল বাথানে থাকিস
আমার পোড়ে বুক, মৈষালরে।
বাথান ছারেক, বাথান ছারেক রে
ও মৈষাল ঘুরিয়া আইসেক বাড়ি,
গলার হার বেচেয়া দিম মুঞি
ঐ চাকিরির কড়ি মৈষাল রে।

'না হইলং মুই ছাওয়ার মাও'—একটি যুবানারীর বঞ্চনার এই অভিযোগের মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক শাসনের যে অনুপম গ্রাম্য ছবিটি কাব্যময় মানবিক আবেদনে ফুটে উঠেছে, নাগরিক বিদগ্ধ কাব্যে ও গীতিতে তার তুলনা কোথায়? পরবর্তী সময়ে আমাদের লোকসংগীতে যখন রাধাকৃষ্ণের আগমন ঘটল, তখন থেকে এই ছবিগুলি হারিয়ে যেতে লাগল।

শুধু অনুযোগ ও আকুতি নয়—তীব্র ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও শ্লেষে নারীমনের কষাঘাতে পল্লী-গীতি শানানো ছুরির মতোই ঝলসে উঠতে দেখি। যে-সমাজে সমাজপতিরা শাঁখা-সিঁদুরের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, সেখানেই আবার লোকসংগীত শুনি—

ও মা মুঞি না যাওং, সেন্দুর দেখিয়া মোকে ভয় নাগে।

যে-মুসলমান সমাজে শরিয়তী বিধানে পুরুষের বহুবিবাহ আইনত সিদ্ধ এবং পুরুষ তিনবার মুখে তালাক বললেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায়—সেই সমাজের মেয়েদের গানেই আবার শুনি—

হাউস্ত থাকি বসিনু কাইনত রে,
ও মুঞি ধানের ভাতের আশে রে, মুঞি ধানের ভাতের আশে;
ঐ ধানো নাই, চাউলো নাই কিলায় মাসে মাসেরে।

কিলাইতে কিলাইতে মুনসারে,
মোর পিঠিত করিলে কুঁজরে, মোর পিঠিত করিলে কুঁজ
ঐ গাঁওবুড়া উঠিয়া কয় কাইনের মজা বুজ।

ধান আর ভাতের আশে সখ করে বিয়ে করেছিলাম; এখন ধানও নাই, চাউলও নাই—পরিবর্তে খাচ্ছি কেবল কিল। কিল খেয়ে খেয়ে পিঠে পড়েছে কুঁজ, আর গাঁয়ের মোড়ল এসে বলে এবার বিয়ের মজা বোঝ।…

ভাঁওতা দিয়ে বিয়ে করার বিষয়ে উত্তরবঙ্গের এই তীব্র শ্লেষাত্মক বিখ্যাত চটকা গানটি অনেকেই জানেন :

নাক ডাঙ্গেরার বেটা টা
চোখ ডাঙরীর নাতিটা
মোক ভোলালু সতের খাড়ু দিয়া।
তকনে না কইচিস্ তুই রে
মোটা চাউল খাইনা
সরু চাউলের নেকায় জোকায় নাই।
ওরে বাড়ি আসিয়া দ্যাখোং মুই
চাতুরালি করিলু তুই
ঘরৎহীনা তোর খুদির গুড়ায় নাই॥…

বিয়ের আগে বলিছিলি তুই মোটা চাল খাস্ না, ঘরে তোর সরু চালের অন্ত নাই। বিয়ের পর বাড়িতে এসে দেখি তুই আমাকে ধাপ্পা দিয়েছিস—তোর ঘরে ক্ষুদের গুঁড়াও নেই। এ-গানে সামন্তসমাজের 'পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে'র ভণ্ডামিকেই যেন উদ্‌ঘাটিত করে 'স্বামী-দেবতা'কে সাধুভাষায় যার অনুবাদ হয় না এমন গালাগালিতে ভূষিত করা হয়েছে। এমনকি 'চেংরা বন্ধু'র ভাবের টানে বৃদ্ধ 'স্বামীদেবতাটি'র মৃত্যুকামনা করা হচ্ছে :

দশাপড়া সোয়ামীটা মোর মরিয়াও না যায়
তবে সেনে মনটা মোর চল্‌চলা হয়,
ছেকায় খইলায় মাথা ঘসিনু হয়
পানিয়া মরা যদি এ্যালায় মরিল হয়॥
সোনার বন্ধুরে, ভাবের বন্ধুরে, চেংরা বন্ধুরে,
হাট যায়া বিলাতি ছাবন আনিয়া দে মোকে।

পূর্ববঙ্গের বিশেষ করে সারিগানের রঙ্গ-রসিকতায় ঠিক এই ভাবটিই ফুটে উঠতে দেখি :

ছোট দেওরা তোর আওড়া কথা
প্রাণে সহেনা
ভাতার গেল ধান দাইতে
বাঘে ধইরা খাউক
সোনার দেউরা বাইচ্যা যাউক।···

পল্লী-গীতির এইসব রঙ্গ-রসিকতায় মনুসংহিতার কালো অক্ষরগুলি বুঝি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে!

কিন্তু পুরোহিততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রের সেন্সর যখন খুব কড়া হয়ে উঠল, তখন ব্যক্তিপ্রেমে উত্তম পুরুষের অভিব্যক্তি কৃষ্ণ-রাধার রূপকে রূপান্তরিত হল। কৌম-সমাজের স্বকীয়া প্রেম হল সামন্ত সমাজে পরকীয়া।

'কানুবিনা গীত নাই'

রাধাকৃষ্ণের আগমনে লোকসংগীতে এল একটানা একঘেয়েমি—ব্যক্তিমানসের অভিব্যক্তির তীব্র আবেগ ও বৈচিত্র্য স্তিমিত হয়ে এল। কালা, বাঁশি, যমুনা, তমাল প্রভৃতি বিমূর্ত ভালবাসার প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো। লোকসংগীতের ধর্লা নদী বা তোর্ষা নদী হয়ে গেল যমুনা এবং চিলমারীর বন্দর হল মথুরার হাট; বৃক্ষ শিমিলা হয়ে গেল কদম, বগাবগী কিংবা ডাহুক ডাহুকী হয়ে গেল শুকসারি; গাড়ীয়াল বা মৈষাল বন্ধু হল বংশীধারী কালা। কানু আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পল্লীচিত্রের প্যানোরামার ঐশ্বর্য আমরা হারিয়ে ফেললাম। তথাপি পল্লী-গীতির প্রণয়, প্রতিবাদে পরকীয়া হয়েই রইল! প্রেম রূপ পেল বিরহে।

লোকগীতের 'কানু'র বিবর্তনের তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে গ্রাম্য রাখালিয়া কানাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, তৃতীয় অধ্যায়ে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ।

প্রথম পর্বের কানুটির দিকে তাকালেই সে যে অন্য নামে পল্লীবধুর সেই 'ভাবের দেওরা'টি সে কথা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। এই কানাইটি কখনো মাছ মারে, আবার কখনো ক্লান্ত পল্লীবধুর ঘাম মুছিয়ে দেয়।

রাধা গেল জল আনিতে, কানাই লাগিল পাছ
হাতের বাঁশি ভূমে থুইয়া কানাই মারে মাছ।

কিংবা আজকে যদি থাকতো আমার শ্যাম,
আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিত ঘাম।

কিংবা আরও একটু কাব্য করে যখন বলে :

তোর কালার যেমন টেরিয়া সিতা
মোর নারীর তেমন ঢালুয়া খোপা রে ;
তুই কালা যেমন দান্তাল হাতি
মুঞিও নারী তেমন ভর যুবতীরে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পদকর্তারা কালার 'টেরিয়া সিতা', বিশেষ করে দান্তাল হাতির সঙ্গে তুলনার কথা ভাবতেও পারতেন কি ? কালার বাঁশি আর ঘরের বধূ যখন পল্লীসংগীতের প্রধান উপজীব্য হল, তখনো এই সম্পর্কটি অতি স্পষ্ট। ঘরের বধূ চিরবিরহিণী। সমাজ-কারাগারের দ্বাররক্ষিণী শাশুড়ি, ননদী। কালার বাঁশির সুরে চিরধ্বনিত পরাধীন নারীর মুক্তির আকুতি।

আমি যখন রানতে বসি
তখন কালায় বাজায় বাঁশি
ভিজাকাষ্ঠ চুলায় দিয়া ধোঁয়ার ছলে কান্দি।

কিংবা

কালারে, শাশুরী ননদী বৈরী
আইনের বড় কড়াকড়ি
ঘাটে না পারি যাইতে,
আমি নারী হৈয়া কতো পারি সইতে,
আর বাঁশি বাজাইও না রাইতে।

শুধু গৃহবাসী নারীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই কি এ বাঁশি ? তবে এমন দরদ দিয়ে গ্রামের পুরুষ গায়ককে কেন গাইতে শুনি :

প্রাণনাথ গো, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি,
তোমার বাঁশির তানে
ভাট্যাল নদী উজান টানে—ও
আমি নারী হৈয়া কোন পরানে রব গৃহবাসী—

সমগ্র সামন্তসমাজের বন্ধন ও শোষণের বিরুদ্ধেই এই মুক্তির আকুতি সর্বজনীনতা লাভ করেছে। অবশ্য পণ্ডিতরা বলবেন—এ হল পরমাত্মার জন্য চিরবিরহী মানবাত্মার ক্রন্দন। তারপরে কানাই হলেন শ্রীকৃষ্ণ—প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের

শ্রীকৃষ্ণ নয়। কিন্তু লক্ষণীয় জিনিস, শৃঙ্গার-রসমত্ত কৃষ্ণকে লোকসংগীত কখনো গ্রহণ করেনি। রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যে প্রেমিক কৃষ্ণের যে-বিশ্লেষণ করেছেন তা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। তিনি সমাজবাধা-অতিক্রমকারী প্রেমকে দেখেছেন, কিন্তু সেই সমাজের আভ্যন্তরীণ সংঘাতকে এবং তার শ্রেণীসংস্থানকে দেখেননি। তিনি বলেছেন: "বৈষ্ণবদের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছৃঙ্খলতা সৌন্দর্যবন্ধনে হৃদয়বন্ধনে নিয়মিত।...বৈষ্ণব গাথার প্রেমপ্রবাহেও তেমনি একমাত্র প্রবল বাধার উল্লেখ আছে, তাহা সমাজ। বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে, অধ্যাত্ম-লোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সমাজের সেই চিরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কল্পনার বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কাব্যের প্রেমকে মূলত সমাজের safety-valve বা মুশকিল আসান হিসাবেই দেখছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম-শাসিত সমাজের জাতিকুলধর্মের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধেই একদিন বৈষ্ণব জাগরণ এসেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। প্রেম যেখানে প্রতিবাদী, সেটুকুই লোকসংগীত গ্রহণ করেছে। প্রেম যেখানে ভক্তিমার্গে অধ্যাত্মবাদী, লোকসংগীতে তাঁর প্রতিফলন অত্যন্ত ক্ষীণ এবং তা এসেছে অনেক পরে। পরবর্তী সময়ে লোকসংগীতে যে ভক্তের শ্রীকৃষ্ণকে দেখি, তা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া। আদি-রসাত্মক বৈষ্ণব পদাবলি যেমন আত্মনিবেদনকারী সংকীর্তনের ভক্তিভাবের রূপ নিল, তেমনি সনাতন স্থাণু সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কে যখন কোনো পরিবর্তনই এল না তখন social protest-এর অর্থাৎ সামাজিক প্রতিবাদের সুরকে আচ্ছন্ন করল surrender বা ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণের সুর: ভক্তিবাদী রচয়িতারা ভণিতাযুক্ত গান লিখে লোকসংগীতে প্রবেশ করলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় তাঁরা 'কাস্তে ভাঙিয়া করতাল গড়িয়া লইলেন'।

শুধু ভাবে নয়, লোকসংগীতের সুরের ক্ষেত্রেও আমরা পরিবর্তন লক্ষ করি। যাকে আমরা এক কথায় কীর্তনাঙ্গ লোকসংগীত বলতে পারি।

ভক্তিবিনা সে ধন মেলে না
আছে ভক্তিরতন অমূল্য ধন
অযতনে পাবে না।

দ্বাপর যুগে গোপী কৃষ্ণধনে
তাঁদের অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ বই আর জানে না···

এ বিষয়ে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার আদিবাসী গীত ঝুমুরের পরিণতি আর একটি দৃষ্টান্ত। 'ঝুমুর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের গান বা নাচের নাম হিসাবে ব্যবহৃত। ঝুমুর শব্দটি মুণ্ডাদের মধ্যে এত বেশি প্রচলিত যে, সেখানে গান অর্থেই অনেক সময় ঝুমুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কারও কারও মতে মুণ্ডাদের মধ্য থেকেই ঝুমুরের উৎপত্তি। আবার কারও মতে ঝুমুরের উৎপত্তি সাঁওতালদের গান থেকে। সে যা-ই হোক, ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের থেকেই যে তার উৎপত্তি সেকথা আদি-ঝুমুরের musical structure বা সাংগীতিক ঠাট ও ছন্দ বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারি। ঝুমুর যে-অঞ্চলের ফসল, তার আদি উৎপাদকরা আছেন আসামের চা-বাগিচায়। সেখানে ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি চা-কুলির ঝুমুর নাচ-গান। সেখানকার ওরাওঁ, মুণ্ডা, ভূমিজ, সাঁওতালী চা-শ্রমিকরা একই সাথে সাদ্রিভাষায় আজও গান গেয়ে নাচে :

আম ধরে থোকা থোকা তেঁতুল ধরে বেঁকা গো
আসাম দেশে দেইখে এলাম রাড়ীর হাতে শাখা গো।

আসামে সেই গানের ধারায় এসে মিশলো বাগিচার কর্মজীবনের ছবি :

কোর মারা যেমন তেমন
পাতি তোলা মনের মতন
কলম করা বড়ই জঞ্জাল—
চাউলভাজা চাহের পানি, বাচাইল পরান।

সেখানেও বংশীধারী প্রবেশ করেছেন, তবে হাড়িয়ার নেশায় মাতাল হয়ে।

কিংবা

চল মিনি আসাম যাব
দেশে বড় দুখ রে
আসাম দেশে রে মিনি
চা বাগান হরিয়ার।

'হরিয়ার' মানে সবুজ। জমিদার আর মহাজনের শোষণে নিঃস্ব হয়ে আসামের সবুজ বাগিচার স্বপ্ন দেখছে। বাগিচা-কোম্পানির দালাল যদুরাম তাদের ঐশ্বর্যের প্রলোভন দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ; গিয়ে দেখল, ওরা দাসশ্রমে বন্দী। তাই গাইছে

কোর মারা যেমন তেমন
পাতি তোলা টান গো।
হায় যদুরাম,
ফাঁকি দিয়ে পাঠাইলি আসাম।

ছোট দুটি কলিতে যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তার ন্যূনতম স্পন্দনও পরবর্তীকালের সহস্র কৃষ্ণলীলা-মার্কা ঝুমুরের মধ্যে মেলে না।

আসামের একটা সবচেয়ে জনপ্রিয় ঝুমুর গানে 'শ্যাম' তো একেবারে বিদেশী সাহেবের আড়কাঠিই বনে গেছেন :

কি নিঠুর শ্যাম,
ফাঁকি দিয়ে আনিলি আসাম।
সাহেব বলে কাম, কাম,
বাবু বইলে ধইরে আন
সর্দার বলে লিব পিঠের চাম্।
রে নিঠুর শ্যাম,
ফাঁকি দিয়ে আনিলি আসাম।

এসব গানের রচনা ও সুরের প্রকৃতিতে আমরা পাই আদি ঝুমুরের রূপটি, তার অনুপম মানবিক ধারাটি। উচ্চবর্ণের হিন্দুশ্রেণীর প্রভাবে শাসকশ্রেণীর ভাবধারায় পশ্চিম-সীমান্ত বাংলাতেই দেখি সুরে ও রচনায় সেই ঝুমুরের আমূল পরিবর্তন। কর্মজীবনের ছোট ছোট সুন্দর টুকরো ছবির জায়গায় এসেছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। তাতে আবার অশিক্ষিত অথচ শিল্পজ্ঞানসমৃদ্ধ, অকৃত্রিম, অজ্ঞাত রচয়িতাদের স্থল এসে দখল করলেন ভণিতাযুক্ত শিক্ষিত পাণ্ডা-পুরোহিত, এমন কি রাজা-জমিদার শ্রেণীর লোক। তাঁরা এখানেও 'কান্তে ভাঙিয়া করতাল গড়িয়া লইলেন'। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন দেওঘরের প্রধান পাণ্ডা ভবপ্রীতানন্দ ওঝা। তাঁর রচনাগুলি বৈষ্ণব কবিদের ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়—

সুমধুর স্বরে ভ্রমর গুঞ্জরে
কুঞ্জে চুমি নব ফুল রে।
সুধাকর কর অনল প্রখর
গরল ভেল তাম্বুল রে।

অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক যেমন
সাপিনী নিল দুকুল রে।
কণ্টক সমান শয্যা অনুমান
দহিছে কুঞ্জ মঞ্জুল রে ॥
মরি যার তরে সে মজিল পরে
পরপ্রেমে প্রেমাকুল
ভবপ্রীতা ভণে মানস দর্পণে
হেরি সে রূপ অতুল।

কিংবা

শুন শুন সহচরী, তোদিগে বিনয় করি
বাঁচাহ আনিয়া সে নাগরে।
বিনা সেই শ্যামধন না রাখিব এ জীবন
ভবপ্রীতা হরিপদ ধরে।

শুধু ভাব ভাষা রচনাতেই নয়, সুরের দিক দিয়েও এ ধরনের গীত যে কটি শুনেছি, তাতে দেখেছি আদিবাসী ঝুমুর-গীতের staccato বা কাটা কাটা স্টাইলের চতুস্বরিক বা পঞ্চস্বরিক সুরের স্থলে এসেছে legato বা টানা আঁশযুক্ত স্টাইলে সম্পূর্ণ জাতির সুর। শুনলেই বোঝা যায় যে এ সুস্থ সংমিশ্রণ নয়, এ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া। অন্তত একে লোকসংগীত আখ্যা দেওয়া চলে না। লোকে যা গায় তা-ই লোকসংগীত হয় না। ভাবের ও সুরের ক্ষেত্রের সংগ্রামকে যাঁরা বোঝেন না তাঁরা 'একে অনিবার্য বলেই' মেনে নেন, কারণ তাঁদের মতে 'বিবর্তনের ধারায় মূল জিনিসের অস্তিত্ব এমনি করেই বিলুপ্ত হয়'। কিন্তু এইসব গবেষকদের শুধু একটি কথাই বলতে পারি, সংস্কৃতির বিবর্তনে গ্রহণ যেমন আছে বর্জনও তেমন আছে। ভদ্রসমাজের পণ্ডিতকুল ইতরজনের যে ভাষা ও সুরকে একদিন স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত ছিলেন—তাদের সংগ্রামী জাগরণের সাথে সাথে তাদের এক সময়ের 'বিলুপ্ত' ভাষা ও সুরের মর্যাদা ফিরে এসেছে। দু-দিন আগেও যা ছিল লিপিহীন উপভাষা, আজ সেরকম কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষা পূর্ণ ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। আর সুরের তো কথাই নেই। সমাজের উপরওয়ালাদের অবজ্ঞায় প্রায় লুপ্ত সুরকে পুনরুদ্ধার করে কিংবা বিকৃত সুরকে সংস্কার করে অনেক জাতি বা উপজাতি নিজের সুরে নিজের সত্তাকে ফিরে

পেয়েছে। লোকসংগীতের সুরের বিচার ও বিশ্লেষণের সময় এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

পরবর্তী পর্যায়ে এলেন ভাগবতের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। লোকসংগীত এই লর্ড-কৃষ্ণ থেকে নিজেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে অবক্ষয়ী সমাজে 'পাপী-তাপী' লোক 'কলিকল্মষঘ্নং' কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, হরি সব একাকার হয়ে গেল। ভাটিয়ালিতেও শুনলাম :

হরিনামের তরী ভবের ঘাটে লেগেছে···

কিংবা বাউল গানে শুনলাম :

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলরে মন রাধে রাধে বল···

আবার কোনো বাউল 'কলির ম্যালেরিয়া জরের যাতনা' থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ভর্তি হলেন 'নদীয়াপুরে গৌরচাঁদের হাসপাতালে', সেখানে 'নিতাইবাবু সিবিল সার্জন', 'শ্রীনিবাস তার কম্পাউণ্ডার'।

আজ Krishna-consciousness বা কৃষ্ণ-চৈতন্য বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রাচুর্যের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সবাই লর্ড কৃষ্ণের হাসপাতালে আশ্রয়প্রার্থী হচ্ছেন। কয়েকদিন আগে সাহেব বৈষ্ণবদের সম্পর্কে স্টেট্‌সম্যান খবর দিয়েছেন :···'Their guru had established 40 Radhakrishna temples in West Virginia and the centre there, 150 miles from Washington, had been named New Vrindaban, where Vedic culture and cow protection had been taken up as two prime themes for propagation.'

লণ্ডনও এখন কৃষ্ণচৈতন্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে লোকসংগীতজ্ঞ হিসাবে হয়ত আমাদের কিছু বলবার নেই, কিন্তু মুশকিল হয় যখন সে দেশে সমস্ত ভারতীয় সংগীত হয়ে যায়—divine psychedellic music' এবং লোকসংগীতের চাষাড়ে কৃষ্ণটি নামাবলি গায়ে হয়ে যান Lord Krishna—যাঁর সাথে transcendental communication বা তুরীয় মার্গে বিচরণের জন্যই সংগীতের মাধ্যমকে গ্রহণ করতে হয়। আমাদের দেশের যেসব লোকসংগীত-শিল্পী সে দেশে যান তাঁরাও সে দেশের একশ্রেণীর শ্রোতাদের মন বুঝে অতি সহজ লৌকিক প্রেমগীতিকেও অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার পোশাক পরিয়ে পরিবেশণ করেন। শ্রীহট্টের অতিপরিচিত ধামাইল জাতের গীত :

আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া, নাগরীগো…
হেরি মুখচান্দে পড়িয়াছি ফান্দে,
আমার প্রাণপাখি কান্দে রইয়া রইয়া নাগরীগো…
ঘরে গুরুজনার ভয়, কর্মে মন নাহি রয়,
আচম্বিতে উঠি চমকিয়া,
আমার চলেনা চরণ, হইবে বুঝি মরণ,
মনের দুঃখ কার ঠাইন কইমু গিয়া নাগরীগো…ইত্যাদি।

বাংলা লোকসংগীতের এই চিরন্তন কুলবধুর জলের ঘাটের প্রেমকেও সেখানে ঐশ্বরিক প্রেমের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হচ্ছে : 'Lord Krishna is a God of great beauty and eternal youth. The story of this song reveals this incident. Once, the singer went to the river bank to fetch some water and by chance he saw the beautiful moonlike face of the God Krishna !'

তাই হিপিরাও কৃষ্ণচৈতন্যে বিভোর হয়ে—খোলকরতাল নিয়ে 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম' গানে মেতে উঠেছে।

লোকায়ত ঐতিহ্যই লোকসংগীতের মূলধারা

পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলাম, কিভাবে বাউলতত্ত্বের মানবিক ধারাটি আত্মরতিতে বিকৃতি লাভ করেছিল, যেজন্য হিপিরা তার মধ্যে তাদের উদ্ভট আচরণ-বিধির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে। সামন্তসমাজের অচলায়তনের প্রতিবাদী মুক্তপ্রেমের প্রতীক লোকসংগীতের রাখালিয়া-কৃষ্ণ কী করে প্রভু-শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত হল এ প্রবন্ধে তার কিছুটা আলোচনা করা হল। পূর্বতন বাউলরাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুগামী হয়ে বৈষ্ণব-বাউলে রূপান্তরিত হল। গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ, হরি সব একাকার হয়ে আত্মসমর্পণের অধ্যাত্মবাদী ধারায় বাংলা লোক-সংগীতকেও অনেকটা আচ্ছন্ন করে দিল। বহু দেবদেবী আচার-বিচার ও জাত-পাতের কাঁটাতারের বেড়ায় বর্ণহিন্দু-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধ মতবাদ হিসাবে মধ্যযুগের বৈষ্ণব জাগরণের একটা প্রগতিশীল মানবিক দিক ছিল—যে কারণে আমাদের গণমানসে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, ঠিক যেমনি সুফী-বাউলদের মানবতাবাদ ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করেছি উৎপাদন-

ব্যবস্থার কোনো বিকাশ লাভ না ঘটায় সেই বিরুদ্ধতা আধ্যাত্মিক আত্মসমর্থনের পথ বেছে নিল।

আমাদের লোকসংগীতের বলিষ্ঠ লোকায়ত ধারাটিও এই আধ্যাত্মিক আত্ম-সমর্পণের দর্শনে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হল। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ও সংগ্রাহকরা হাজার হাজার লোকগীতি সংগ্রহ করেছেন—যা দেহতত্ত্ব ও তার সাধন-প্রক্রিয়ার কিংবা গৌর নিতাই অদ্বৈতের লীলাখেলার একঘেয়েমিতে' একই ধরনের উপমার পুনরাবৃত্তিতে অত্যন্ত কৃত্রিম ও ভাবাবেগহীন। ঐ গানগুলি যেন কেবল নিগূঢ় তত্ত্বকথা শোনাবার জন্যই—প্রায়ই কাব্যগুণ তাতে থাকে না। এবং আর এক শ্রেণীর গান আছে যার অধিকাংশই হল রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগী দলে টানবার প্রচারকগিরি।' লোকজীবন ও জনপদ, প্রেম ও প্রকৃতিকে ছেড়ে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের দিকেই যেন আমাদের লোকসংগীত ধাওয়া করল।

আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও মূল লোকায়ত ধারাটি আধ্যাত্মিক কুয়াশার অন্তরালে চিরপ্রবহমান রয়ে গেছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রায় ৭০ বছর আগে লিখেছিলেন: 'যাহাতে কোন আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের সমাবেশ নাই, এমন কোন কথা আমাদের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই।' আমাদের লোকসাহিত্যের মূল প্রবাহ লোকায়ত ধারাটি সম্বন্ধে পণ্ডিত গবেষকরা চিরদিনই নিরুৎসাহ। কিন্তু হঠাৎ যখন ময়মনসিংহ গীতিকার মতো মহান লোককাব্যের আবিষ্কার ঘটে—তখন তাঁরা অত্যন্ত মুশকিলে পড়েন এবং সন্দিহান হয়ে তার মৌলিকতা সম্বন্ধেই নানা প্রশ্ন তুলতে থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দীনেশচন্দ্র বলেছিলেন: 'এই পল্লীগাথার আবিষ্কার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটনা।' ১৯২৩ সালে ইংরাজিতে ময়মনসিংহ-গীতিকার পালাগানগুলি প্রথম মুদ্রিত হয়। কিন্তু তখনো তা ছিল কাব্যরসের স্বাদ গ্রহণের বস্তু, সুরের সোনার কাঠির স্পর্শে সেই কাব্য আরও যে কত মধুর, তার স্বাদ পেতে আরও সময় কেটে গেল।

আমি আগেই আলোচনা করেছি মাত্র ত্রিশের দশকে এসে লোকসংগীত তার আঞ্চলিক ভাষা ও সুরের নিজস্ব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিক্ষিত মহলে মর্যাদা লাভ করেছিল। গূঢ় তত্ত্বকথা ও কৃষ্ণলীলা-কীর্তনের মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠে আমরা শুনেছিলাম:

যে দিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুইরা রয়রে,
ও কি গাড়িয়াল ভাই—
হাঁকাও গাড়ি তুই চিলমারীর বন্দরে রে—

আমরা শুনলাম :

কোথায় পাব কলসি কন্যা কোথায় পাব দড়ি
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি ॥

কিংবা

পুবালি বাতাসে বন্ধু নাওএর বাদাম উড়ে
আমার শাড়ির আঞ্চল ঝল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌ করে ॥

গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষ ও তাদের জীবনের ছবি ও মাটির গন্ধ নাগরিকতার গুমট কৃত্রিমতাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে যতই আমরা জনতার ভিতরে যাই ততই এই জীবনধর্মী লোকায়ত ধারাটির সন্ধান পাই। ইদানীং ঢাকার বাংলা একাডেমি—বাংলাদেশের জেলাওয়াড়ি গবেষণায় যে ধারাবাহিক সংগ্রহমালা প্রকাশ করেছেন—ছড়া, গাথা, মেয়েলী গীত, বারমাস্যা প্রভৃতিতেও সেই সত্যই প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের লোক-সঙ্গীতে তত্ত্বকথা মানেই আধ্যাত্মিকতা নয়। এই তত্ত্বকথার মধ্যে অনেক সময় জনসাধারণের মননশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। জগৎসৃষ্টি ও জীবনজিজ্ঞাসা মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন। তাই কোনো নিরক্ষর গ্রাম্য ফকির যখন গান করেন :

সমুদ্দুরের জল উঠে বাতাসের জোরে
আবর হইয়া ঘুরে পবনের ভরে
জমিনে পড়িয়া শেষে সমুদ্দরে যায়
জাতেতে মিশিয়া জাতে তরঙ্গ খেলায় ॥
রে বন্ধু নির্ধনিয়ার ধন,
কেমনে পাইমুরে কালা তোর দরিশন।...

তখন কিন্তু তিনি এর মধ্য দিয়ে জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর গভীর মননশীলতাই ব্যক্ত করেন, সুরাশ্রয়ী মধুর কাব্যরসের মাধ্যমে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আমি আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি যে সুফী বাউলদের এই জীবনের অর্থ বা মনের মানুষের অনুসন্ধানের সাথে তৎকালীন কঠোর সমাজবন্ধন থেকে মুক্তির বাসনা মিশে

গিয়েছিল। সেজন্য সেসব বাউলগানে ছিল কাব্যরস, আবেগ ও আকুতি। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই তত্ত্বকথা জীবনসত্যকে অস্বীকার করে কীভাবে কেবল গূঢ় সাধনমার্গের কুটিল প্রক্রিয়ার নীরস প্রচার হয়ে দাঁড়ালো তা-ও আলোচনা করেছি।

আজ গণজীবনে এসেছে নতুন জীবনজিজ্ঞাসা। লোকসংগীতের ভবিষ্যৎও সেখানেই। অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক ও অর্ধ-ঔপনিবেশিক কৃষিব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন অধিকারবোধে যে গণজাগরণ এসেছে, সেখানে এখনো নতুন জীবনদর্শন শিকড় গাড়তে পারেনি। হাজার বছরের ধ্যানধারণা তাকে পিছনে টানছে। বিপ্লবী চেতনা বিপ্লবী জীবনদর্শনে ব্যাপ্তি লাভ করেনি—অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার পথে শোষণ-হীন সমাজ গঠনের জীবনদর্শন জনতার সৃষ্টিশীল সত্তার মধ্যে দানা বাঁধেনি আজও। অন্যদিকে সেই জাগরণকে শোষকশ্রেণীর বর্ণচোরা ভাবাদর্শে জাতীয়তাবাদে কলুষিত করার সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছে। উপর থেকে হুকুমমাফিক লোকসংগীত তৈরি হচ্ছে ও গণপ্রচারের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। লোকসংগীত যাদের সৃষ্টি—শুধু তারাই তার রূপান্তরের অধিকারী। সমাজ-রূপান্তরের ভাবাদর্শের নতুন ঢেউ যখন জনতার মধ্যে আসে তখনই তার সংস্কৃতির রূপান্তরের তাগিদও আসে। চল্লিশোত্তর গণসংস্কৃতির আন্দোলন আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শে গণজাগরণের ফল। একদিন গণসংস্কৃতির রূপান্তরের তাগিদেই গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। ভারতবর্ষে যেখানে সে আন্দোলন শ্রমিকের ও কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল সেখানেই সোনা ফলেছিল। বহু অখ্যাত লোককবি ও লোকগীতিকারকে আমরা সেদিন পেয়েছিলাম। সীমাবদ্ধভাবে হলেও তাঁরা নতুন জীবনদর্শনের আলোতে বহু গান ও গাথা সেদিন রচনা করেছিলেন। লোকসংগীতের রূপান্তরের দিগ্‌দর্শনও আমরা তাতে পেয়েছিলাম। গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীতের বিষয়ে আলোচনা করার সময় এর মূল্যায়ন করার ইচ্ছা রইল।

লোকসংগীত, উপভাষা, উপমা ও উচ্চারণ

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতার একজন বাগ্মী নেতা আমাদের জেলায় এক কৃষক সমাবেশে সুদীর্ঘ ভাষণ দেবার পর সভায় উপস্থিত একজন বৃদ্ধ কৃষককে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেমন লাগল? উত্তরে তিনি বলেছিলেন "নেতায় তো কইছুইন ভালা, খালি অত কইলকাত্তি না কইয়া যদি এট্টু বঙ্গভাষাত কইতা—।" অর্থাৎ, নেতা তো বললেন খুব ভালো কিন্তু যদি এত কলকাতার ভাষা না বলে একটু বাংলাভাষায় বলতেন! বাংলার চলতি ভাষাটা আমাদের পূর্ববঙ্গের লোকদের কাছে কইলকাত্তি আর তাদের নিজেদের ভাষাটা তাদের কাছে 'বঙ্গভাষা'। এ দাবীটা কি একেবারে মিথ্যা? ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বঙ্গ বলতে চিরদিন পূর্ববঙ্গকেই বোঝাত। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের উপভাষার মধ্যে যে অপূর্ব সম্পদ ছড়িয়ে আছে—আমাদের সাধু বা চলতি বাংলা ভাষা তা থেকে কতটুকু আহরণ করতে পেরেছে? এটা শুধু নিজেকে ঐশ্বর্যশালী করার প্রশ্ন নয়—এটা হল ভাষাকে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের উপলব্ধি ও ভাব প্রকাশের মাধ্যম করে তোলার প্রশ্ন।

বাংলা সাহিত্যে যাকে আমরা চলতি ভাষা বলি তা কিন্তু খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নয় মোটেই। তার উচ্চারণ ও শব্দসম্ভার মূলত বিদগ্ধ কলকাতার ইঁট, কাঠ, সিমেন্টেই জন্ম নিয়েছে, তাতে বাংলার খাঁটি মাটির গন্ধ খুবই কম। 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র যে ভাষা ও ব্যঙ্গকৌতুক তা মূলত কোলকাতার নাগরিক ভদ্রশ্রেণীর। পরবর্তী সময়ে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাচনভঙ্গী ও উচ্চারণে যে জিনিসটি আনেন তাও তাঁদের পরিবারগুলিতে আবদ্ধ ডায়ালেকট থেকে এসেছে। তার মধ্যে জেলাগুলির কথ্যভাষার স্বাদ-গন্ধ ও বাচনভঙ্গী পাই না।

ম্যাক্সমুলার সাহেব বলেছিলেন, 'The real and natural life of language is in its dialects.' আমাদের উপভাষাগুলির শ্রমজীবনের কর্মপ্রক্রিয়ার দ্যোতক শব্দগুলি বা বাক্যভঙ্গী-প্রবাদবাক্য ইত্যাদি থেকে বাংলাভাষা নিজেকে বিশেষ সমৃদ্ধ করতে কি পেরেছে? তা পারেনি বলে বাংলাসাহিত্যে বিদগ্ধ ও লৌকিক এই দুই ধারার মধ্যে এক অস্বাভাবিক

বিচ্ছেদ বিরাজমান। অথচ প্রতিবেশী অসমীয়া ভাষাতে এই বিচ্ছেদ দেখি না। একদিন বাংলার অনুকরণে একটা অসমীয়া ভাষা গড়ে ওঠার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে-সময় অজ্ঞানতাবশত কোন কোন মহলে অসমীয়া ভাষা বাংলাভাষারই একটা উপভাষা বা ডায়ালেক্‌ট বলে একটা ভুল ধারণা ব্রিটিশ শাসকদের প্রশ্রয়ে দানা বেঁধেছিল এবং আসামের শিক্ষালয়ে বাংলা মাধ্যম প্রচলিত করা হয়েছিল। তারই প্রতিরোধে "অসমীয়া নবজাগরণের আন্দোলনে" অসমীয়া ভাষার স্বকীয়ত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে আসামের ভাষাবিদ্‌রা তাঁদের লৌকিক ভাষার মধ্যেই সেই নিজস্বতা খুঁজে পেলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার ব্যঙ্গাত্মক রচনা পরিপূর্ণভাবে লৌকিকভাষা থেকেই প্রাণ আহরণ করেছে—যেজন্য শুধু বিদগ্ধরা নয়, আসামের জনসাধারণও তার থেকে রস আহরণ করে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র সঙ্গে, লক্ষ্মীনাথের 'কৃপাবর বরুয়ার' এখানেই তফাৎ। অসমীয়া গ্রাম্য প্রবাদ-প্রবচন, বাক্যভঙ্গী ও বিন্যাসকে আত্মস্থ করেই অসমীয়া সাহিত্য গড়ে উঠেছে। অসমীয়া ভাষায় বাংলা ভাষার মত সাধু ও চলিত, নাগরিক বিদগ্ধ ও গ্রাম্য কথ্যভাষার মধ্যে কোন বিশেষ ব্যবধান গড়ে উঠতে পারেনি। সেখানে অসমীয়া ভাষা সমস্ত অসমীয়া জনসাধারণেরই ভাষা। সুদূর উত্তর লখিমপুরের কোন গণ্ডগ্রামের বিহুর দল গৌহাটি শহরের বিহুমণ্ডপে নৃত্যগীত পরিবেশন করলে শহরের শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে সেই গানের একটি কথাও অপরিচিত ঠেকে না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের কুচবিহার বা রংপুরের কোনো ভাওয়াইয়া গায়ক কলকাতায় এলে তাঁর গানের প্রায় প্রত্যেকটি কলি শহুরে ভাষায় বুঝিয়ে না দিলে কলকাতার শিক্ষিতরা মর্মোদ্ধার করতে পারেন না। আমরা যারা পূর্ববঙ্গের শিক্ষিতশ্রেণী চলিতভাষায় লিখিত বইপড়া-বিদ্যে নিয়ে কলকাতায় আসি তখন বহুবিধ উচ্চারণের বিভ্রাটে পথ হারিয়ে ফেলি। দেখতে পাই চলিতভাষার লিখিত ও কথ্যরূপের মাঝখানে বিস্তর ফারাক। যেমন আমরা 'বিদ্যা' বা 'সত্য'র উচ্চারণে য-ফলার স্পষ্টতা রাখব। কিন্তু এখানে তার উচ্চারণ অনেকটা হয় 'সত্ত' বা 'বিদ্দা : তাও আবার 'স'-এর উচ্চারণ হবে 'সো'-এর মত। গায়ক হিসাবে আমার সামান্য পরিচিতি আছে। কিন্তু জর্জদা (দেবব্রত বিশ্বাস) বললেন, "তোর সুর ঠিক আছে কিন্তু উচ্চারণের জন্য রবীন্দ্রসংগীত হবে না।" সেদিন রীতিমতো অপমানিত বোধ করেছি, 'এলেম নতুন দেশে' কি করে "এলেম 'নোতুন' দেশে" হয় তা বুঝতে পারিনি। যেমন বুঝতে পারি না 'অভিজিৎ' কি করে 'ওভিজিৎ' হয়, 'বেলা' কি করে 'ব্যালা' হয়, 'কল্যাণী' কি করে 'কোল্যাণী'

হয়, আবার 'কদম্ব' 'কদম্ব'ই থাকে। 'এক' যখন 'অ্যাক' 'একটি' তখন 'একটি'ই থাকে। তাইতে লাগে ধন্দ।

শব্দসম্ভার ও প্রকাশভঙ্গী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রদের অনুরোধে লোকসাহিত্য বিষয়ে দু'কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলাম 'নিধুয়া পাথার', 'লিলুয়া বাতাস' তারা জানে কিনা। আঞ্চলিক ভাষার যে শব্দসম্ভার আছে যা শ্রমপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তার প্রকাশভঙ্গী এবং ব্যঞ্জনায় যৌথজীবনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা বিদগ্ধ ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের বাংলাসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীর যে দৈন্য তা উপমা-অলংকারে বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ, এমনকি অপহরণের দ্বারা পূরণ করতে হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যকে তার থেকে মুক্ত করতে হলে আমাদের লৌকিক শব্দসম্ভার থেকে নতুন শব্দ চয়ন করতে হবে। এদেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে হয়ত এই আবেদন আমি রাখতে পারি। তিন খণ্ডে সমাপ্ত ঢাকা বাংলা একাডেমির প্রকাশিত 'আঞ্চলিকভাষার অভিধানে'র প্রধান সম্পাদক মরহুম মুহম্মদ শহীদুল্লার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতে পারি। কর্মজীবনজাত শব্দের কথা বলছিলাম—মালদহের গম্ভীরা গানে মহাদেবকে যেখানে তাঁতীরূপে কল্পনা করা হয়েছে সেখানে আছে :

"এ বিশ্ব বিষয়ের তানা,
গাঁথিয়াছে বিশ্ব সানা,
হররকমের হরেক বীনা,
নিত্য নতুন আনো।
সৃষ্টি কইরা মায়ার লরদ
জড়িয়্যা দারা পুত্র গরদ
ঝাপ উঠিয়া পরদ পরদ
আচ্ছা বুনান বুনো।
একদিক হতে ফেল্যা মাকু,
আরেকদিকে টানো।"

তানা (সুতা), সানা (ছিদ্র), বীনা (সরু খিল), ইত্যাদি তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িত শব্দ উপমা হিসাবে যেভাবে সাহিত্যে এসেছে, শ্রমজীবনবিযুক্ত বিদগ্ধ

সাহিত্যে সেভাবে আমরা পাই না। যেমন পূর্ববঙ্গে ভাটিয়ালীতে নৌকা, বস্তু এবং ভাবের প্রতীক হিসাবে সবসময়ই উপস্থিত :

"নায়ের গালা ছুটিল…
নায়ের জাকন মরিল…
ভয় পায়্যা মন মাঝি ভাই পালাইয়া গেল—
এই যে তোমার নায়ের ডরা
ডরায় ডরায় জিনিস ভরা
কে করল ওজন গো তাহার কে করল ওজন"

কিংবা

"ভক্তির জাঙ্গাল হাতে লইয়া প্রেমের বাদাম দাও উড়াইয়া"

নাওয়ের বিভিন্ন অংশের নামগুলো এখানে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা শুধু মাঝির নয়, পূর্ববাংলার গ্রাম্যজীবনের প্রকাশভঙ্গী। গোয়ালপাড়ার মাহুতের গানে যখন আমরা শুনি—

"ও মোর দান্তাল হাতির মাহুতরে
ও মোর সারীণ হাতির মাহুতরে
ও মোর মাখ্‌না হাতির মাহুতরে
ও মোর চুইহাতির মাহুতরে
যেদিন মাহুত শিকার যায় নারীর মন মোর
ঝুরিয়া রয়রে।"

যে হাতির দাঁত আছে, যে হাতির দাঁত নেই, যে হাতির সন্তান আছে, যে হাতির সন্তান নেই—এমনিভাবে হাতিকে নামাঙ্কিত করে তারাই, হাতির সঙ্গে যাদের নিত্যদিনের পরিচয়।

শুধু মৎস্যজীবী নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মৎস্যজীবনের যোগ অহরহ। কাজেই উপমা-ছলে সাধারণ মানুষ ভাবপ্রকাশের জন্য কোন প্রকৃতি-বিশিষ্ট বিশেষ মাছকে টেনে আনে। বহুদিনের খাজনা বাকী পড়ায় জমিদারবাবু প্রজাকে কাছারি বাড়িতে তলব করেছেন। কাছারি বাড়ি যাওয়া ও সেখানে লাঞ্ছিত হবার ঘটনাকে অতিদুঃখের মধ্যে তার নিজস্ব সরলভঙ্গীতে সিলেটের একজন গরীব কৃষক বর্ণনা করছেন, "দূরথনে দেখলাম, চিতলী বুর ভাইয়া রইছে, আমিও বোয়াইল্যা রুষে আগাইয়া গিয়া চ্যাঙোয়া ফালে গিয়া উঠলাম। দুই পেদাই ধইর‍্যা আমারে রোওয়া ঠুকা ঠুকল। আমিও বাইন-পিচ্‌কাপিচ্‌কি

কইরা কুনরকমে ছাড়ান পাইয়া কইএর লাখান কানখাইতে কানখাইতে বাড়িত আইলাম।" অর্থাৎ, 'দূর থেকে দেখলাম কাছারির সাদা ফরাস চিতলমাছের পেটির মত ভাসমান। আমিও বোয়াল মাছের মত এগিয়ে গিয়ে চ্যাংমাছের মত লাফ দিয়ে কাছারি বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। দুই পেয়াদা তখন আমাকে ধরে রুইমাছের ঠোক্‌করের মত প্রচণ্ড মার দিলো। আমিও বাইন মাছের মত পিছলে কোন রকমে ছাড়ান পেয়ে কৈ মাছের মত কানখিয়ে (কানের উপর হাঁটা) অর্থাৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরলাম'। এই প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা মানুষের যে প্রকাশভঙ্গী, আমরা তার থেকে অনেক দূরে। এই আঞ্চলিক ভঙ্গী বা ভাষা ছাড়াও সাধারণভাবে লোকসংগীতে প্রচলিত প্রকাশরীতি :

"আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাইয়া নয়নের জলে করলাম কালি।
কলিজা ছিড়িয়া পত্রটি লিখিয়া
পাঠাইব শ্যামবন্ধুর বাড়ি হে নাগর ॥"

লৌকিক প্রকাশের এই যে তীব্রতা ভদ্রবাংলায় তা দুর্লভ। "লিলুয়া বাতাসেরে প্রাণ না জুড়ায় না জুড়ায় রে" কিংবা "বাওকুংটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে। সেই মত মোর গাড়ির চাংকা পন্থে পন্থে ঘুরে রে।" এই 'লিলুয়া বাতাস'কে যেমন মৃদুমন্দ হাওয়া বললে চলবে না তেমনি 'বাওকুংটা বাতাস'কে 'ঘূর্ণি হাওয়া'য় অনুবাদ অচল।

"ওকি গাড়ীয়াল ভাই
কত কান্দিম মুই নিধুয়া পাথারে।"

'নিধুয়া পাথারে'র জায়গায় 'ধু ধু প্রান্তর' একেবারে বেমানান।

আঞ্চলিক প্রকাশভঙ্গিকে ভদ্রায়িত কমতে গেলে তার অপমৃত্যু ঘটে।

যেমন উত্তরবঙ্গের চট্‌কায় সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপে যে সামাজিক ছবিটা ধরা পড়ে :

"নাক ডাঙরার বেটাটা
চোখ ডাঙরীর নাতিটা
মোক ভুলালু সতের খাড়ু দিয়া।
তকনে না কছিস তুইরে
হাল চারিখান, গরু পাচ হাল
ছেউটি গরুর নেকায় জোকায় নাই,
ঘরত আসিয়া দেখলু মুই

চাতুরালি করলু তুই
ঘরত হীনা তোর ছানি দিবার নাই" ॥
...ইত্যাদি

তখনকার গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তারা 'অভদ্র' আঞ্চলিক ভাষা বাদ দিয়ে সবাইকার বোধগম্য ভাষায় সেই সুরে গানটি রেকর্ড করাতে গিয়ে তুলসী লাহিড়ীকে দিয়ে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করান :

"ঠগ মিনসে মুখপোড়া
বেহায়া নাই তোর জোড়া
ভাঁওতা দিয়ে করলি আমায় বিয়ে ॥
আমারে না বলেছিলি তুই
ও তোর হাল সাতখান গাড়ী চারখান
দুধের গাইয়ের লেখায় জোকায় নাই—
ঘরে বসে দেখ্নু তাই
চাতুরালির অন্ত নাই
হাল দিতে যাস পরের বলদ দিয়ে" ॥
...ইত্যাদি

এ রচনায় চট্‌কা সুর লাগালেও সেটা চট্‌কার চরিত্র হারিয়ে ফেলল। 'নাক ভাঙরার বেটাটা' এবং 'চোখ ভাঙরীর নাতিটার' গ্রাম্য গালাগালিতে জ্বালার প্রকাশ 'ঠগ্ মিনসে মুখপোড়া'তে জলীয় হয়ে গেল।

লোকসংগীতের আবার কতগুলো নিজস্ব কাব্যিক ভাষা আছে, যা সাধারণ কথায় ব্যবহৃত হয় না। সে ভাষায় পথ হয়ে যায় 'পন্থ'—'পন্থপানে চাইয়া'। কাঁচা হয়ে যায় 'কাঞ্চা'—'কাঞ্চা বাঁশে আগুন দিয়া বাড়ালি ধোঁয়ালি'। আবার কখনও দুঃখ হয়ে যায় 'দুক্ক'—'কি কব দুক্কের জ্বালা'; কিংবা 'কাষ্ঠের কলসী'।

একবার এক চলচ্চিত্রের লোকসংগীতে 'মৃত্তিকা' শব্দটি কেটে 'মৃত্তিকা' করার কথা পরিচালক বললে শচীন দেববর্মণ তাতে আপত্তি করেন। অবশেষে অজয় ভট্টাচার্যও শচীন দেবকে সমর্থন করাতে পরিচালক তা মেনে নেন।

পল্লীবাংলায় একটি শব্দ আছে "নাইওর"। এর কোন প্রতিশব্দ' ভদ্র-বাংলায় নেই।

"ওরে ও ভাটীয়াল গাঙের নাইয়া
সোনাভাইরে কইও গিয়া নাইওর নিত, আইয়া"

শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসাকে বলে নাইওর যাওয়া। গ্রাম্যসমাজ-মানসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে ভাটিয়ালীর এই আদিতম আকুতি। রবীন্দ্রনাথ লৌকিক ছড়া সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি ছড়া সম্পর্কে যে সুগভীর মন্তব্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণীয় :

"ওপারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।"...

'মেঘদূতে'র সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—।" সুরাশ্রয়ী 'নাইওর' শব্দটির মধ্যে এই সমস্ত কথাটার অনুভবের ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত।

লোককাব্যে প্রকাশভঙ্গীতে তীব্রতা আনা হয় অনেক সময় অর্থহীন তুলনামূলক পদ্ধতিতে—

"আম ধরে থোকা থোকা
তেঁতুল ধরে বেঁকা,
দেশের মানুষ বৈদেশ গেলে আর নাহয় দেখা"

কিংবা

"আগের ডালে বসে কোকিল পিছের ডালে বাসা
ভাঙ্গিলে পিরীতির ডাল জীবনে নাই আশা।"...

প্রথম কলির সঙ্গে দ্বিতীয় কলির কোনো সামঞ্জস্য নেই অথচ অসংলগ্ন নয়। শুধু বাংলা নয়, অন্যান্য লোকসংগীতেও তা দেখতে পাই। আসামের চা-শ্রমিকের ঝুমুরে আছে—

"—এক পয়সার পুঁটি মাছ কি দিয়া রান্ধিব গো
বাঙ্গাল বধূ চইলা গেলে কি বইলা কান্দিব গো"

অসমীয়া চার কলিতে সমাপ্ত অন্তহীন বিহুর ধারায়ও এই বাগ্‌ভঙ্গি বর্তমান

"ছাগর ছাল চেলাবর দবুয়া কটারী
পহুর চাল চেলাবর মিট্ট
গাঁওর বুড়া মেথা দায় ন ধরিবা
গাই যাও বিহুরে গীত।"

"ছাগলের ছাল ছাড়াবার দবুয়া ছুরি, হরিণের ছাল ছাড়াবার মিটু-দা, গ্রামের বুড়ো মোড়ল দোষ ধরবেন না যেন, আমরা আজ গাইব বিহুর গীত।" আবার উপমার ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে সর্বোৎকৃষ্ট ভাব তুলে ধরারও একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে। যেমন—

"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতল পাটি,
তাহার অধিক হিম কন্তে তোমার বুকের ছাতি ॥"

কিংবা, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের সেই স্মরণীয় লোকগীতি :

"দিনের শোভা সুরুয রে রাইতের শোভা চান,
হালুয়ার শোভা হাল কৃষি, জমিনের শোভা ধান।
ঘাসের শোভা সবুজ রঙরে, মাটির শোভা ঘাস,
কাশিয়ার শোভা ধগ্‌লা ফুল, আসিলে ভাদর মাস।
ফনীর শোভা মণি হায়রে গজের গজমোতি,
মোর আঙিনার শোভা হইছেন নারী রূপবতী ॥"

ঘরের নারীর রূপবর্ণনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এই ধরনের নাটকীয় ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করা হয়েছে। অসমীয়া সঙ্গীতে :

"আবগারী শুয়নি কাকিনী তমোল ঐ
পাছবারী শুয়নি পান
বরঘর শুয়নি গাভরু ছোয়ালী ঐ
উলিযাই দিবলৈ টান।

'আগবাগিচার শোভা 'কাকিনী' সুপারী গাছ, পিছবাগিচার শোভা লতানো পান, ঘরের শোভা যুবতী মেয়ে আমার পরের হাতে দিতে চায় না প্রাণ।' অতিসহজ এই প্রকাশভঙ্গীতে যে অনবদ্য কাব্যের আবেদন, তা বিদগ্ধ সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য।

"সড়কের শোভা বটবৃক্ষ, বৃক্ষের শোভা ছায়া
বনের শোভা রসের ফুলফল, মনের শোভা মায়া।"

কিংবা

"নানান বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত"

এমন গভীর কথা এমন সহজভাবে বলতে পারা কেবল লোকসাহিত্যেই সম্ভব।

'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ শিলং পাহাড়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে

মেঘালয়ের কোন ছবি ধরা পড়েনি। কিন্তু মেঘালয়ের মুহূর্তে-মুহূর্তে চলমান মেঘের রং-বদলের ছবি সিলেটের একজন গ্রাম্যকবির দুটি লাইনে কী অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

"পুঞ্জ মেঘে আঞ্জাআঞ্জি চেরাপুঞ্জির পা'ড়ো
ধলা মেড়া ফাল দি উঠেন কালা মেড়ার ঘাড়ো"

অর্থাৎ চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে পুঞ্জমেঘের কোলাকুলি, আর সাদা মেঘ কালো মেঘের উপর লাফ দিয়ে উঠছে, যেমন চলমান ভেড়ার দলে সাদা ভেড়া কালো ভেড়ার ঘাড়ে লাফ দিয়ে ওঠে।...

বিশেষ বিশেষ লোকসংগীতে বিশেষ ভাষাভাষী জাতির সামগ্রিক পরিচিতি সুরে এবং কথায় বা কাব্যে বিধৃত হয়ে থাকে। শুধু দুইটি কলিতে আসামের সমস্ত লোকের প্রাণকে যদি ধরতে হয়, সেটি হল :—

"অতিকৈ চেনেহর মুগারে মহুরা, অতিকৈ চেনেহর মাকু,
তাতোকৈ চেনেহর বহাগর বিহুটি, না পাতি কেনেকৈ থাকো।"

'আমার অতিপ্রিয় মুগার নাটাই, তার চেয়ে প্রিয় মাকু, তার চেয়েও প্রিয় বৈশাখ বিহু—তাকে আবাহন না করে কি করে থাকি।' কোলকাতায় এসে বিদেশের কোন শিল্পী (রাশিয়া বা চীন কিংবা অন্যদেশের) যখন বলেন 'একটি খাঁটি বাঙালী গান শিখতে চাই', তখন রবীন্দ্রসংগীত নয়, তাদের গাইতে বলি,

"আমার বাড়ি যাইয়ো রে মা'ঝি বইতে দিমু পিড়া,
খাইতে দিমু তোমায় আমি শালিধানের চিড়া,
শালিধানের চিড়া নয়রে বিন্নিধানের খই,
গাছে আছে শবরীকলা গামছাবান্ধা দই।...
ওরে ওরে রঙিলা নায়ের মাঝি
কোনদিন ছাড়িবায়রে নাও—আমি যেন জানি মাঝি রে।"

এটা একটা বিচ্ছিন্ন লোকসংগীত নয়—এটা বাঙালী জাতির একটি নির্ভেজাল নিটোল ছবি—সুরে ও কথায়।

উচ্চারণ রীতি

পল্লীগীতি গাইতে গিয়ে উচ্চারণের ব্যাপারে কঠিন বিতর্কের সম্মুখীন হতে হল। অবশেষে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। তাঁর

সাথে পূর্বপরিচয় ছিল। তাই ভণিতা না করেই আঞ্চলিক গীতের উচ্চারণসমস্যাটা তুলে ধরলাম। তিনি জানতে চাইলেন, আমার মতটা কী? ভাষাবিদ্ আমি নই, সংগীতশিল্পী হিসাবে সংক্ষেপে নিজের মতামত ব্যক্ত করলাম। আঞ্চলিক উচ্চারণ-ভঙ্গি লোকসংগীতের অভিব্যক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আমি ভাবি এবং ভাবের integration-এর জন্য এটা অপরিহার্য মনে করি। সেজন্য আঞ্চলিক উচ্চারণবিধি নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করার আমি পক্ষপাতী। তাকে ভদ্রায়িত করতে গেলে অভিব্যক্তির authenticity নষ্ট হয়ে যায়।

আমার মতকে তিনি সোৎসাহে সমর্থন করলেন। আমি তখন উৎসাহিত হয়ে আরেকটু বিশদভাবে বিষয়টি নোট করার জন্য phonetics-এর ভাষায় যেমন **denti-labial, gutteral** ইত্যাদিতে আমাদের 'প' 'চ' ইত্যাদির উচ্চারণধ্বনি-গুলোর ব্যাকরণগত বয়ান জানতে চাইলে, প্রয়াত ভাষাচার্য আমাকে রীতিমত ধমক দিয়ে বলেন, 'যা জানো না তা নিয়ে পণ্ডিতি করতে যেয়ো না। পূর্ববঙ্গের 'চ', 'চ', এবং 'ছ'-এর মাঝামাঝি এবং 'প'-এর উচ্চারণ 'প' এবং 'ফ'-এর মাঝামাঝি—এইভাবে তুমি তোমার বক্তব্য উপস্থিত করবে।' সুনীতিকুমারের এই উপদেশ পালন করে ধ্বনি-বিজ্ঞানের জটিলতার মধ্যে আর প্রবেশ করার সাহস করলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলাধ্বনিতত্ত্বে'র গভীরে প্রবেশের ভরসা পেলাম না। কিন্তু ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর 'সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' পুস্তকখানা আমাকে যথেষ্ট সাহস দিল। সিলেট জেলার উপভাষাই বর্তমান লেখকের আদি মাতৃভাষা। সিলেট জেলার অধিবাসী না হয়েও অধ্যাপক লাহিড়ী এই উপভাষার উপর যে বিশদ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তাতে উপভাষার উচ্চারণের গুরুত্ব আমি আরো বেশী করে অনুভব করেছি। ইতিপূর্বে 'শ্রীহট্টের লোকসংগীত' প্রণেতা ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের আলোচনাও আমাকে উৎসাহিত করেছিল।

উপভাষার অনাবিষ্কৃত সম্পদের আলোচনা না করে শুধু সংগীতের ক্ষেত্রে উচ্চারণের গুরুত্ব নিয়ে সামান্য আলোচনা এখানে করছি। সাধারণভাবে সমগ্র পূর্ববঙ্গেই কতগুলো বিশেষ উচ্চারণ আছে; যেমন চ আর ছ-এর মাঝখানে দন্তমূলীয় 'চ' কিংবা প আর ফ-এর মধ্যবর্তী দন্তৌষ্ঠ 'প' ধ্বনি ইত্যাদি। আবার কিছু গান আছে যার ভাষা উচ্চারণগত ভাবে আঞ্চলিক।

হাছন রজার বিখ্যাত গান— "লোকে বলে বলেরে ঘরবাড়ি ভালো নয়

আমার"—কলকাতায় এভাবে গাওয়া হয়, কিন্তু সত্যিকারের গাইতে গেলে হওয়া উচিত: "নুকে বলে বলেরে গরবারি বালা না আমার"—কিংবা "কান্দিয়া আকুল হইলাম ভবনদীর পারে" গাইতে হবে অনেকটা "খান্দিয়া আকুল হইলাম বব নদীর ফা'রে।"

চট্টগ্রামের "দেওয়ালা্যা বানাইল মোরে সাম্পানের মাঝি"—এর সঠিক গীতরীতি হবে—"দেবাল্যা বানাইল মোরে ছাম্মানের মাজি।"

এখানে আবার কিছু কিছু জটিলতাও আছে। পূর্ববঙ্গে কোন সময় হ্রস্বস্বর দীর্ঘ ও দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়, আবার কোন সময় অত্যন্ত সাধু উচ্চারণও হয়। এর মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা আছে যা কোলকাতার গায়কদের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন—যার ফলে উদ্ভূত হয় একটা অদ্ভুত ম্যানারিজম। উত্তরবঙ্গে যেমন 'ল' হয় 'ন' আবার 'ন' হয় 'ল', আবার 'র' হয় 'অ'। ভাওয়াইয়া গানে—

"ও তোর দাদা গেইছে অংপুর শহরে
ও মোর ভ্যাওরা, মোক গেইছে কয়া।"

কিংবা

"সগাইগুলান নাইঅর যায়
নাল শাড়ী পিন্ধিয়া"

এখানে সমস্ত ভাবানুষঙ্গই নষ্ট হয়ে যাবে যদি 'নাল'কে 'লাল' বানাই বা 'অংপুর'কে 'রংপুর' বলি।

উপভাষা বলার বেলায় তার একটা আঞ্চলিক অন্তর্লীন সুরের টান (intonation) থাকে, এমনকি কলকাতার চলতিভাষা বলার সময় বিশুদ্ধ উচ্চারণ হলেও এই intonation-এ ধরা পড়ে যায় তিনি কোন্ অঞ্চলের লোক। কিন্তু গানের বেলায় এই intonation কোনো ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে না, কেবল উচ্চারণ-ভঙ্গিটাই সেখানে প্রধান পরিচিতি। সে হিসাবে আঞ্চলিক উচ্চারণের গুরুত্ব আমাদের লোকসংগীত গায়কদের উপলব্ধি করা উচিত।

উপভাষা নিয়ে হাসাহাসি করা বা রসিকতা করে পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অতি নিম্নরুচির পরিচায়ক। আভিজাত্যবোধজাত বিচ্ছিন্নতার শিকার এই তথাকথিত শিক্ষিতশ্রেণী। বাংলাভাষা একটা জীবন্ত প্রবাহ। যেদিন আমাদের কোটি কোটি জনতা তাঁদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবেন—সেদিন আজকের বাংলা-ভাষা সমস্ত উপভাষার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে তার সহস্রদল-বিকশিত যে রূপ ধারণ করবে আজ তা আমরা ধারণাও করতে পারছি না। তাই বাংলা লোকসাহিত্যের

ভগীরথ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় বলি : "ভাষা জিনিসটা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা নহে। দেশের জলবায়ু ও আলোকে ইহা পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা স্বীয় জীবন্তগতির পথে, ইচ্ছাক্রমে বর্জন ও গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, স্বীয় ললাট-লিপিতে কোন শিক্ষকের ছাপ মারিয়া চিহ্নিত হইতে চায় না।"

লোকসংগীতের রাগরূপ ও গীতরীতি

"আমাদের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে এবং পুরাণাদিতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট প্রথম সংগীত শিক্ষা করিয়া, তাহা তিনি ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু ও তম্বরু এই পাঁচ শিষ্যকে শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে ভরতমুনিদ্বারা পৃথিবীতে সংগীত প্রচারিত হয়। ইহাতে আমাদের সংগীতবিদ্যার অতি প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হইতেছে; অর্থাৎ সংগীত এত পুরাতন বিদ্যা যে, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তাহার আদি না পাওয়াতেই, তাহা দেবাদিদেব মহাদেব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সকল পৌরাণিক বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া ন্যায় ও যুক্তিপথ অবলম্বনপূর্বক দেখা যাউক সংগীতের উৎপত্তি কিরূপ।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংগীতে সুপণ্ডিত চিরস্মরণীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত অমূল্য গ্রন্থ ১৮৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত 'গীতসূত্রসারে'র উপক্রমণিকায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ভারতীয় সংগীতবেত্তা কাপ্তেন এ. উইলার্ড সাহেবের ১৮২৮ সালে প্রকাশিত হিন্দু-সংগীতের উপর লিখিত পুস্তকে (*A Treatise on the Music of Hindusthan*, Capt. Willard) উপস্থাপিত ইয়োরোপীয় সংগীতবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানীদের যুক্তি হাজির করে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ডঃ বার্নির 'সংগীতের ইতিহাস' থেকে উদ্ধৃতি দেন: "পৃথিবীতে মনুষ্যোদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠসংগীত সমুদ্ভূত হইয়াছে। ভাষাসৃষ্টি হওয়ার পূর্বে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি মনের যাবতীয় ভাব প্রকাশার্থে এক এক প্রকার দীর্ঘস্বর স্বাভাবিক রূপে ব্যবহৃত হইত..." ইত্যাদি।

সংগীত যে মনুষ্যসমাজের আদিতম অবস্থা থেকে ক্রমবিবর্তনের সাথে, তার শ্রমপদ্ধতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে শিকারী, গোপালক, জুম-খেতি লাঙল-খেতি করা আদিম নৃগোষ্ঠীর যুথবদ্ধ কর্মজীবন থেকে যে স্বর-সুর-ছন্দ-লয়-এর উৎপত্তি—আমাদের দেশে সংগীতবিদ্‌দের সেই ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংগীতের বিশ্লেষণ করতে বড় দেখা যায় না। এঁরা ব্রহ্মার পঞ্চশিষ্যের কথা মুখে হয়ত বলেন না, কিন্তু তাঁদের রাগরাগিণীর আলোচনার দৃষ্টিকোণটা 'নাদব্রহ্মে'র দিকেই রয়ে গেছে। এবং প্রচ্ছন্নভাবে তা ক্রিয়া করে।

বর্তমান কালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সংগীতাচার্য সুরেশ চক্রবর্তী, অমিয়নাথ সান্যাল, ডাঃ বিমল রায় প্রমুখ সংগীতবিদ্ পণ্ডিতরা নিষ্ঠার সঙ্গে সংগীতের আলোচনা করেছেন, যা থেকে আমাদের মতো সাধারণ সংগীতানুরাগীরা খুবই উপকৃত। কারণ সংস্কৃতে কিংবা হিন্দীতে লিখিত সংগীতশাস্ত্রকারদের মূলগ্রন্থে প্রবেশ করার সুযোগ ও যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু সংগীতের উৎপত্তি ও বিকাশে লোকসংগীতের স্থান এবং লোকসংগীত যে শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক স্বাধীন স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মার্গসংগীত থেকে এক ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত—তার যে এক অলিখিত সংগীতবিজ্ঞান আছে—সে বিষয়ে আমরা তাঁদের কাছ থেকে পরিষ্কার কোনো ধারণা পাই না। তাঁরা যে এ বিষয়ে অচেতন একথা বলছি না—তাঁরা পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্ ডাঃ পারি (C. Hubert H. Parry)-র বক্তব্য ("Folk-music supplies an epitome of the principles upon which musical art is founded.") মানেন। কিন্তু লোকসংগীত কি মার্গসংগীতের ঘরামির মতো কেবল ঘরটা সাজিয়ে দিয়েছে, যেখানে ওস্তাদরা তাঁদের ঘরানা গড়ে তুলেছেন, এবং নিজে ঘরছাড়া নিরুদ্দেশ নামগোত্রহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে? না, লোকসংগীতও নিজের জন্য অন্য একটি কুঁড়ে ঘর বেঁধে নিয়েছে—যেখানে তার নিজস্ব একটা 'ঘরানা' গড়ে তুলেছে? যদি গড়ে থাকে তবে এই গৃহহীনদের ঘরানার গতি ও প্রকৃতিটা কি—এ বিষয়ে তাঁদের কোনো বিশ্লেষণ থাকলে আমরা উপকৃত হতাম, আজকের ঢালাও বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার পেতাম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-প্রণীত 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থে লিখিত শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাটি আমাদের প্রথম সুস্পষ্ট পথ দেখাল। প্রত্যেক সংগীতবিদ্, বিশেষত লোকসংগীতজ্ঞের কাছে এই ভূমিকাটির মূল্য অসাধারণ। তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনার বক্তব্য হল আর্য-সংগীতে অনার্য-সংগীতের দান। আমরা এখানে মোটামুটিভাবে আর্য-সংগীত বলতে মার্গ বা উচ্চাঙ্গ সংগীতকে ধরে নিতে পারি, তেমনি অনার্য-সংগীতকে লোকসংগীত হিসাবে ধরে নিতে পারি। শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন কিভাবে "নানা অনার্য প্রাক্-আর্য প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন আদিম নিবাসী জাতির সংগীত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় বা আর্যসংগীতের কলেবর পরিপুষ্ট হইয়াছে। অসংখ্য অনার্য জাতির রাগ ও রাগিণী আর্যসংগীত আত্মসাৎ করিয়া তাহার রাগ-সাধনার উপাদানের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে—।" আর্য ও অনার্য-

সংগীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখছেন : "সাধারণতঃ দেখা যায় যে অপরিণত আদিম জাতি বা শিশুজাতিদের সংগীতে মাত্র তিন কিংবা চার স্বরে গঠিত রাগমূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য পরিপুষ্ট আর্যসংগীত ও আদিম জাতির সংগীতের প্রধান পার্থক্য হইল এই চার স্বরের অধিক স্বরে গঠিত রাগের প্রকাশে ও পরিচয়ে। ভারতের আর্যসংগীত বা মার্গ-সংগীতের বিশেষত্ব এই যে ইহার রাগদেহ চারটি স্বরের অধিক সংখ্যক স্বর অবলম্বনে গঠিত হয়, যথা ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ; অর্থাৎ পাঁচ, ছয় এবং সাতটি স্বরের সাহায্যে গ্রথিত রূপই আর্যসংগীত বা মার্গসংগীতের বিশেষত্ব। সুতরাং যে রাগ বা রাগিণী চার স্বরের রাগিণী তাহা আর্যসংগীতের পরিধির বাহিরে পড়ে এবং তাহার জন্য আদিম নিবাসীদের সংগীতের রাজ্যে, অর্থাৎ চার স্বরের রাগ অনার্য সংগীতের পর্যায়ে পড়ে। ইহার প্রমাণ হইল : প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ 'বৃহৎ-দেশী'র বচন—"চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতির্নমার্গঃ—শবর পুলিন্দ কাম্বোজ-বঙ্গ-কিরাত-বাহ্লীক-অন্ধ্র-দ্রবিড়-বনাদিষু প্রযুজ্যতে" (বৃ-দে, পৃ ৫৯)। অর্থাৎ চতুস্বরের রাগিণী মার্গসংগীত নহে, এই জাতির রাগ-রাগিণী শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, বাহ্লীক, অন্ধ্র, দ্রবিড় প্রভৃতি বন্য এবং আদিম-নিবাসী জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত। দেখা যাইবে প্রত্যেক অনার্য জাতি অন্ততঃ একটি করিয়া অনার্য রাগ বা রাগিণী দান করিয়া আর্যসংগীতের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে।"

এই প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : "অনেক সময় দেখা যায়—অনার্য রাগরাগিণীকে গোত্রান্তরের সময় তাহার চতুঃস্বরের রূপকে পরিশুদ্ধ করিয়া আর একটি স্বর জুড়িয়া দিয়া তাহাদের আর্যসংগীতের আসনে বসিবার অধিকারী করিয়া লওয়া হয়। আবার কোনও কোনও সময়ে এই পরিশুদ্ধির অভাবও লক্ষিত হয়। তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হইল : 'কালিঙ্গ' বা 'কালিংগী' রাগিণী। ইহা কলিঙ্গদেশের কোনও অনার্য আদিম-নিবাসী জাতির সংগীত সম্পদ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অপরিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা চতুঃস্বরের রাগিণী। মতঙ্গের মতে চতুঃস্বরের রাগিণী মার্গসংগীতের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। তথাপি মতঙ্গদেব এই রাগিণীকে তাঁহার মৌলিক চতুঃস্বরের রূপেই আর্যসংগীতে স্থান দিয়াছেন, তবে আর্যসংগীতের মানরক্ষার জন্য এই চতুঃস্বরা রাগিণীতে খুব দুর্বল 'নিষাদ' জুড়িয়া দিয়া ইহার শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।"

একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রবহমান ধারা

কিন্তু রাগসংগীতের দরবারী রঙীন প্রাসাদের ভিত্ রচনা করে কিংবা উপকরণের যোগান দিয়েই কি লোকসংগীতের কাজ শেষ হয়ে গেল - আহিরী রাগের জন্ম দিয়ে আভীর জাতির স্বর, মালব-কৌশিক বা মালকোষের জন্ম দিয়েই কি অনার্য মালব জাতির স্বরের কাজ শেষ হয়ে গেল ? উপজাতীয় অর্থনীতি থেকে সংহত কৃষি-অর্থনীতিতে তাদের সমাজের বিকাশের সঙ্গে ওদের স্বরেরও এক বিকাশ ঘটেছে — কিন্তু তা স্বতন্ত্র পথে। অনার্য চারস্বর পরবর্তী লোকসংগীতে পঞ্চস্বর বা ষষ্ঠস্বরে এমন কি সপ্তস্বরেও বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু তার musical structure বা সাংগীতিক কাঠামো ও গীতরীতি, দরবারী সংগীত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করেছে। আজও nationality বা ভাষাভিত্তিক অধিজাতিগুলির মধ্যে, তাদের লোকসংগীতের mode বা 'ঠাটে'র মধ্যে বিভিন্ন নৃকুল, উপজাতি বা অর্ধ-উপজাতীয় স্বরের এক বিচিত্র pattern বা রূপকল্পের সমাবেশের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। আমাদের দেশে সামন্তীয় ও ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা আজও প্রায় অক্ষুণ্ণ। পাশ্চাত্যদেশে শিল্পায়ন বা নগরায়ন লোকসংগীতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, আমাদের দেশে সেভাবে পারেনি। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে যেমন, আমাদের দেশেও লোকসংগীত সংগীতের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। নিম্নশ্রেণীর সংগীত হিসেবে উচ্চাঙ্গ সংগীতের 'আর্য'রা চিরদিনই তাকে অবজ্ঞা করেছেন। এ অনাদর, এ অবজ্ঞা শ্রেণীসংগ্রামেরই একটি সাংগীতিক প্রতিফলন।

সমাজতন্ত্রী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গত শতাব্দীর শেষদিকে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সংগীতবিদ্ সেসিল শার্প, ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলে, বিশেষ করে সমারসেটে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে, অসীম ধৈর্যসহকারে প্রায় পাঁচ হাজার অপ্রকাশিত সংগৃহীত গানের নিজহাতে স্বরলিপি করেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি ইংলণ্ডের সেই অঞ্চলের আদিবংশের লোকদের অনুসন্ধানে উত্তর আমেরিকার আপালাচিয়ান পর্বতমালায় গিয়ে বসবাস করেন।

সেই গবেষণার উপর ভিত্তি করে তিনি এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংলণ্ডের লোকসংগীতের উপর যে কয়টি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন তাতেই প্রথম লোক-সংগীতের স্বকীয় সত্তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডের সমাজের 'আর্য'রা ভাবতেন যে তাঁদের 'আর্ট-মিউজিকে'র ছিটেফোঁটাতেই ফোক্‌মিউজিক গড়ে উঠেছে।

অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর জাতীয়তার যে সংগ্রাম তা থেকেই হাঙ্গেরীয় জাতীয় সংগীতের (National Music) পুনরুজ্জীবন। ইয়োরোপীয় সংগীতে দুটি স্মরণীয় নাম হাঙ্গেরীর বেলা বারটক (Bela Bartok) ও জোল্টন্ কোদালী (Zoltan Kodaly)। অস্টো-জার্মান সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীয় জাতীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা বিস্মৃতপ্রায় হাঙ্গেরীয় লোকসংগীতকে দূরদূরান্তর গ্রামে গ্রামে খুঁজে খুঁজে উদ্ধার করলেন। তাঁরা বললেন, তাঁদের National Music জাতীয় সংগীতের গোড়াকার কথা হল লোকসংগীত। অস্ট্রো-জার্মান 'আর্যদের' Kultur Kamph বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীয় 'অনার্য'দের প্রধান হাতিয়ার হল হাঙ্গেরীয় লোকসংগীত। সে সংগ্রাম ছিল তখন রীতিমতো প্রাণান্তকর।

গত শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতবিদ্ চেকোস্লোভাকিয়ার আণ্টনিন্ ভরাক (Antonin Dvorak) আমেরিকা ভ্রমণে এসে মন্তব্য করেছিলেন: "এখানে যত সংগীত শুনলাম তার মধ্যে আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে নিগ্রোসংগীত।" এ মন্তব্য আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ 'আর্যদের' মৌচাকে এক প্রচণ্ড ঢিল ছুঁড়ে মারলো। কালোদাস 'অনার্য' নিগ্রোদের সংগীত, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সংগীত? এ হতে পারে না। আমাদের মনে আছে, পল রবসন একবার নিজের সংগীত-জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে নিগ্রোসংগীতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এক সময় নিগ্রো লোকসংগীত ছাড়া অন্য কোনো সংগীত করতেন না। এও ছিল এক প্রচণ্ড সংগ্রাম। আজ সেখানকার শ্বেতাঙ্গ সংগীতবিদ্‌রা সকলেই বলছেন—আমেরিকার সংগীতের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে নিগ্রোসংগীত।

আমাদের দেশেও এই সংঘাতের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। গীতসূত্রসারে সংগীতাচার্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:…"পূর্বোক্ত প্রকার গান ব্যতীত কড়কা, সোহেলা, কাজরী, লাউনী, চৈতী, জিগর, নক্তা, ডোমনা প্রভৃতি বহুতর গ্রাম্যগীত হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে; তাহা সভ্য সমাজে ব্যবহার হয় না। এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে অনেক প্রকার গ্রাম্যগীত আছে, তাহার উল্লেখ হইল না কেন? তাহার কারণ এই যে সভ্য সমাজে অব্যবহার্য গানের বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে উক্ত কয় প্রকার গানের নাম করার তাৎপর্য এই যে, কাপ্তেন উইলার্ড সাহেবের দেখাদেখি, অধুনা সংগীতগ্রন্থে ঐ সকল গ্রাম্যগীতের নাম উল্লেখ করা একটা

ফ্যাশন (প্রথা) হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা 'সংগীতসার' ও 'সংগীত রত্নাকর'। ফলকথা এই যে, আমাদের সংগীতগুরু ওস্তাদগণ হিন্দুস্থানের লোক ; অতএব হিন্দুস্থানের সংগীত বিষয়ক তাবৎ সামগ্রী আমাদের শিরোধার্য করিতে হয় ; বঙ্গ কি অন্ত দেশীয় গান আমরা ঘৃণা করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি। হিন্দুস্থানের ঐ সকল গ্রাম্যগীতের কথা না লিখিলে, হয়ত কোন সংগীত কুতূহলী পাঠক বলিবেন, এই গ্রন্থকার ঐ সকল গান জানেন না, অতএব সংগীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি অল্প, সুতরাং তাঁহার পুস্তকও অকর্মণ্য, এই ভয়ে ঐ সকল গীতের নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।"

যিনি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংগীতের গবেষণা করে গেছেন, যিনি বঙ্গদেশের নিজস্ব ধারার, তার National Music-এর সন্ধান করে লিখেছিলেন : "রাগ-রাগিণীযুক্ত ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা বাঙ্গালীর জাতীয় গান নহে ; উহা হিন্দুস্থানের আমদানী, সুতরাং উহা বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন।··· বঙ্গদেশের জাতীয় গান—কীর্তন ও কবি ; পাঁচালী কবিরই প্রকারভেদ। বহুকাল হইতে অস্মদ্দেশে কীর্তন ও কবির চর্চা হইতেছে : পূর্বে বাঙ্গালীর যে সকল জাতীয়, গ্রাম্যসুর ছিল, তাহা লইয়াই প্রথম কীর্তন ও কবির সৃষ্টি হয়।···এই কীর্তন ও কবির সুর লইয়াই প্রথম যাত্রার সৃষ্টি হয়।"···ইত্যাদি। সেই সংগীত-মনীষী ভাওয়াইয়ার প্রাণকেন্দ্র কোচবিহারে বসে সেই সুরের কোনো সন্ধানই পাননি—এ কথা আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। অপূর্ব লোককাব্যের দিক ছেড়ে দিলেও, শুধু মেলোডির আকৃতি ও তীক্ষ্ণতার দিক দিয়ে বাংলা কেন ভারতের লোকসংগীতের বিরল সম্পদ এই ভাওয়াইয়া। তবু সেই দেশে বসে এই সংগীত-সাধক তার সন্ধান পেলেন না কেন ? এর কারণ কি এই নয় যে গত শতাব্দীতে 'আর্য'ত্ব-প্রাপ্ত কোচবংশী রাজাদের দরবারেও 'অনার্য' কোচ রাজবংশী প্রজাদের এই অনুপম সুরসৃষ্টির প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ ?

এই শতাব্দীর প্রথমপাদে বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমেই নাগরিক ভদ্রশ্রেণী বিশুদ্ধভাষার আবরণে বাঙালীর নিজস্ব লৌকিক সুর গ্রহণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণজাগরণ সেই পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত 'আর্য'দের আকর্ষণ করলেও 'অনার্য'দের নীচকুলোদ্ভূত এই গীত ভদ্র সংগীতের আসরে ঢুকতে পায়নি। কবি জসিমুদ্দীনের কাছে শুনেছিলাম, তৃতীয় দশকেও কলকাতার ভদ্র সমাজের কাছে লোকসংগীত প্রচার করতে তাঁদের

তাঁদের কতরকম বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকি সে সময় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় কাগজে নোটিস দিয়ে জানিয়েছিলেন—যিনি লোকসংগীতের ক্লাসে আসবেন তাঁকে বিশেষ মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে।

বাংলার অমর লোকশিল্পী আব্বাসউদ্দীনের আত্মজীবনী থেকে আমরা সংগীতের ক্ষেত্রে এই 'আর্য' ও 'অনার্য'দের সংগ্রামের বহু তথ্য পাই।

কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারতের প্রতি প্রদেশের লোকসংগীতের উদ্ধারের ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রায় অভিন্ন। আধুনিক অসমীয়া সংগীতের জনক জ্যোতিপ্রসাদ যখন ত্রিশ দশকে তাঁর প্রথম নাটক 'শোণিত কুঁয়রী'তে অসমীয়া মেয়েলী গানের সুর সংযোজনা ক'রে এযুগে অসমীয়া national music বা নিজস্ব 'জাতীয় গীতে'র ভিত্তি স্থাপন করেন তখন তাঁকে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও শিল্পীদের কাছে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই লেখকের কাছে জ্যোতিপ্রসাদ নিজে সবিস্তারে সে কাহিনী বলেছেন—সংক্ষিপ্তভাবে তিনি তা লিপিবদ্ধও করে গেছেন।

কাজেই আমরা দেখছি আমাদের 'আর্যান্বিত' সংস্কৃতিতে 'অন্ত্যজ' লোকসংস্কৃতির কী স্থান ছিল। শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যবান লেখাটিতে অনার্য-সংগীতের অবদানের কথা বলেও যখন তিনি লেখেন, "সুদূর প্রাচীন ও প্রাক-ঐতিহাসিক কাল হইতে মার্গসংগীত আর্য-সংগীতের পরিধির বহির্দেশ হইতে যুগে যুগে নূতন নূতন আগন্তুকদের আহ্বান করিয়া ভারতীয় সংগীতের বিরাট কলেবরে স্থান দিয়াছে। এই নূতনকে, অপরিচিতকে, বিদেশীকে ও নবাগতকে স্বাগত, আপনার করিয়া লওয়া এবং অনাত্মীয়কে আত্মীয় করিয়া লওয়া ভারতের সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট চরিত্র ও গুণ"—ইত্যাদি, তখন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় শুধু সমন্বয়টাই দেখেছেন, কিন্তু সংঘাতটা দেখতে পাননি। অনার্য সংগীতকে 'আত্মসাৎ করে কখনো চতুঃস্বরিক অনার্য সংগীতে দুর্বল নিখাদ লাগিয়ে জাতিতে তুলে নিয়ে, পরে 'অনার্য' সংগীতকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখা বা অস্পৃশ্য করে রাখা ছিল 'আর্যদের'ই কাজ।

সংঘাত এবং সমন্বয়ের সমস্যাটা কিন্তু তথাকথিত আর্য বা অনার্য সংগীতের মধ্যে নয়। সমস্যাটা এক অর্থে দরবারী সংগীত ও লোকসংগীতের মধ্যে। 'সুদূর প্রাচীন' কালের চেয়েও সুদূরে আর্যরা পশুপালক ভ্রাম্যমান নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত যখন ছিলেন তখন মার্গসংগীত বা art music বা শিল্পসংগীতের প্রশ্নই ছিল না। আদিম পশুপালক সমাজে যেমন তাম্রশিল্প গড়ে ওঠা ছিল অসম্ভব কথা, তেমনি

পশুপালক সমাজের স্তরে তিনটি বা চারটির বেশি স্বর নিয়ে সুরের সৃষ্টিও ছিল তেমনি অসম্ভব কথা। উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত কিংবা আর্চিক, গাথিক ও সামিক বলতে কোন কোন স্বরকে বুঝাত না জানলেও আদিম সুরের ত্রিস্বরভিত্তিক স্কেলটা তা থেকে জানতে পারি। এটা আর্য-অনার্য অর্থাৎ racial বা কোনো বিশেষ নৃগোষ্ঠীগত ব্যাপার নয় মোটেই। এটা নরসমাজের বিবর্তনের ইতিহাসের ব্যাপার। আর্যরাও অসভ্য আদিম স্তরে ছিল। ভ্রাম্যমাণ পশুপালক সমাজের স্তর থেকে সুসংহত স্থায়ী কৃষিসমাজ গঠনের আগে কোনো নৃগোষ্ঠীই সপ্তস্বরের সম্পূর্ণজাতির সুর সৃষ্টি করতে পারেনি। এটা হল anthropology of music বা সংগীতের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্বের বিষয়। কাজেই যদি কেউ বলেন আর্যরা প্রথম থেকেই সম্পূর্ণজাতি স্বরগ্রামের অধিকারী ছিলেন, তবে তা হবে অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। লোকসংগীত এবং শিল্পসংগীত বলে দুটো স্বতন্ত্র ধারার উৎপত্তি শুধু তখনি সম্ভব যখন কৃষিসমাজে নগর ও গ্রামের বিভেদ এল—কৃষি-অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে এল সামন্তীয় শ্রেণীবিভাগ: শ্রমজীবী নিম্ন-শ্রেণী' এবং পরশ্রমজীবী, অবসরভোগী 'উচ্চ শ্রেণী'। সেই জন্য আদিবাসী স্তরের সমাজে যেখানে সামন্তীয় শ্রেণী-পার্থক্য আসেনি, যেখানে তার গান মানেই community song বা গোষ্ঠী-সংগীত, সেখানে লোকসংগীত কথাটা বর্তমান অর্থে ব্যবহার করতে পারি না।

লোকসংগীতের সাংগীতিক বিচার

আজও ত্রিস্বর বা চতুস্বর-আশ্রয়ী লোকসংগীত বহু আছে। ডঃ পূর্ণিমা সিংহ বরাহভূমের উপজাতিদের লোকসংগীতের রাগ বিশ্লেষণ করে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এবিষয়ে তিনি একজন পথিকৃৎ। তিনি সেখানে ত্রিস্বর-আশ্রয়ী 'সারহুল' গান থেকে সূত্র ধরে একই অঞ্চলে সম্পূর্ণজাতি সংগীতের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করে যে আলোচনা করেছেন তা কতখানি গ্রাহ্য, সংগীতবিদ্রাই সে বিষয়ে বলবার অধিকারী। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণজাতির সুর হলেই লোকসংগীত মার্গসংগীত হয়ে যায় না। বহু লোকসংগীত ভারতে সম্পূর্ণ স্বরগ্রামের ঘরে প্রবেশ করেছে, তা বলে তা মার্গসংগীত হয়ে যায়নি। মার্গসংগীত ও লোকসংগীতের প্রকৃতির পার্থক্যটা স্বরের সংখ্যাতে নিবদ্ধ নয় মোটেই—সেটা আরো গভীরে। সে আলোচনায় পরে আসছি।

ত্রিস্বরিক ও চতুস্বরিক scale বা ঠাট্ পার হয়ে লোকসংগীত শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রধানত পঞ্চস্বরিক বা ঔড়বজাতীয় রাগরূপ গ্রহণ করেছে।

তবু চতুস্বর-আশ্রয়ী লোকসুর ভারতবর্ষে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—শুধু উপজাতি নয়, উন্নত কৃষিসমাজেও। প্রধানত খরজ, রেখাব, গান্ধার ও নিচের ধৈবতে ওঠা নামা ক'রে এর কিছু কিছু সুর (কথা নিরপেক্ষ) এমন এক অনুপম mood বা ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করে যা আরো অধিক স্বর সংযোজন করেও সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এখানে লক্ষণীয় যে আমাদের মেয়েলী গানেই এ রূপটা দেখতে পাওয়া যায় বেশি। মেয়েদের একান্ত নিজস্ব গৃহকর্ম আচার অনুষ্ঠানে—যেমন ঘুমপাড়ানিয়া বা বিয়ের গানে রাজস্থান থেকে শুরু করে আসাম পর্যন্ত মেয়েরা সুরের ক্ষেত্রে এক 'ঘরানা'র সৃষ্টি করেছে, অনেকসময় যার scale বা ঠাট্ সাধারণভাবে সেই অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীতের থেকে পৃথক। ভাটিয়ালীর দেশ পূর্ববাংলা (বর্তমানে বাংলাদেশ), যার প্রভাব সে অঞ্চলের লোকসংগীতে সর্বব্যাপী, সেখানেও কোনো কোনো মেয়েলী গানে, যেমন সিলেটের বিয়ের গানে, ভাটিয়ালীর পরিচিত 'খাম্বাজ ঠাট্'কে ফেলে কোমল গান্ধার ও কোমল ধৈবতে 'পিলু'র আমেজ সৃষ্টি করেছে। আসামের সর্বব্যাপক বিহু-র minor scale স জ্ঞ ম প ; কিন্তু মেয়েদের ঘুমপাড়ানিয়া বা বিয়ের গানে major scale অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরে স র গ, র গ র স ধ্—মূলত এই চারটি স্বরই ব্যবহৃত হয়। এজন্য একই অঞ্চলের সুর বিচারে প্রান্তর ও প্রাঙ্গণ এই দুটো অনুবিভাগও করা চলে। উপজাতি স্তর থেকে অধিজাতি স্তরে বিকাশ লাভ করলেও মেয়েদের 'রক্ষণশীলতা' অতীতের উপজাতি স্তরের ঐতিহ্যের অনেক কিছু রক্ষা করেছে। যাহোক, যে চারস্বরাশ্রয়ী সুরের কথা বলছিলাম তার দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন—যদিও এখানে বিস্তারিত স্বরলিপির স্থানসংকুলান সম্ভব নয়। আবার স্বরলিপিতে সুরের অন্তর্লীন ভাবপ্রকাশক গায়কীটি দেওয়া অসম্ভব। একটি বিহারী ঘুমপাডানিয়া :

নিদিয়া আভী হ্যায় ধীরে ধীরে
পুরবৈয়া ঝকোড়ে ধীরে ধীরে—

ধ্া ধ্ সা সা, সা রা সা-া সা, রা সা সা রা গা

গা গা রা সা, সা রা গা রা সা-া

বিহারের অন্য আর একটি অঞ্চলে এই চারটি স্বরকে আশ্রয় করেই মগ্ধী বা মগহী মেয়েলী গীতে মেয়েরা বৃষ্টি কামনা করে গাইছে : 'কপ্সল্ কদম্ জুড়ী-ছৈয়া হো ভৈয়া ছোলম্ মোয়ার'—কিন্তু চলনভঙ্গি ও গীতরীতিতে ভিন্ন 'মুড্' বা মেজাজের সৃষ্টি করেছে। যেমন রাগসংগীতে একই পর্দায় থাকলেও ভূপালী ও

দেশকারের মেজাজ সম্পূর্ণ আলাদা, এখানে যেন ঠিক তেমনি।

আসামে এই শুদ্ধ চতুস্বরের রকমফেরে এক অপূর্ব মেয়েদের নিচুকুনি গীত বা ঘুমপাড়ানিয়ার সুর পাই :

আমারে মইনা শুব-এ
বারীতে বগরি রুব-এ
বারীতে বগরি পকি সরি গলে
মইনাই বুটলি খাব-এ

সা রা গা-া, রা গা গা-া, রা গা া গা,

রা গা-া গা, রা গা-া গ রা গা-া গ,
গা-া রা গ গা গা রা রা গা-া রা সা রা সা ধ্া,

ধ্া সা রা সা গা-া-রা সা সা-া সা—।

আবার ওড়িয়া ঘুমপাড়ানিতে দেখছি এই চতুস্বরের গান্ধার কোমল হয়ে এক নতুন আমেজ সৃষ্টি করেছে। একটি জনপ্রিয় ওড়িয়া ঘুমপাড়ানিয়া হলো :

ধো রে বাইয়া ধো
যো কেয়ারীরে গহরমণ্ডিয়া, সো কেয়ারীরে শো।

ধ্া সা-া সা সা সা সা জ্ঞা-া জ্ঞা

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা রা জ্ঞা রা সা সা সা ;
ধ্া সা সা রা জ্ঞা জ্ঞা।

এ গানগুলি কোনো ভাঙা সুর নয় কিংবা কোনো উচ্চাঙ্গ গীতের raw material বা কাঁচা উপকরণ মাত্র নয়। এ সুরগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এগুলির মধ্যে social association বা সামাজিক ভাবানুষঙ্গের এবং human relations বা মানবিক সম্পর্কের এমন দ্যোতনা, যা অন্য পরিবেশে reproduce করা প্রায় অসম্ভব।

চারস্বরের গীত অপূর্ব 'মুড্' সৃষ্টি করে অনেক সময়। শহরের কেয়ারি-করা শত-পাপড়ি বসরাই গোলাপের বাগিচার অপূর্ব শোভা ও সৌরভে মুগ্ধ হয়ে যখন কোনো গাঁয়ের পথে যেতে যেতে কোথাও ভেসে আসা মৃদু মিষ্টি এক ঝলক গন্ধ পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি কাঁটাবনের আড়ালে ফুটে আছে চার-

পাপড়ির এক অজ্ঞাত বনফুল, তখন মনে জাগে এক নস্‌টালজিয়া—অব্যক্ত হারানো মমতার স্মৃতি। সম্পূর্ণ আর এক 'মুড্'। গোলাপের সঙ্গে তার তুলনা করে কাকে বড় বলবো, কাকে ছোট!

আগেই বলেছি বহু উপজাতি, নৃগোষ্ঠী, খণ্ডজাতি মিলে আজকের যে একটা ভাষাভিত্তিক অধিজাতি বা ন্যাশনালিটি গড়ে উঠেছে তাতে বিভিন্ন জাতির স্বরাংশ মিশে সাধারাণত একটি পঞ্চস্বরিক বা ঔড়ব কিংবা ষষ্ঠস্বরিক বা ষাড়ব জাতির স্বকীয় আঞ্চলিক রাগরূপ গড়ে উঠেছে যা হলো সেই অধিজাতির, বলা যায়, রাগ-দর্পণ। আবার প্রত্যেক অধিজাতির এক-একটি 'পকড়' (স্বরের অভিজ্ঞান) আছে। যখন কোনো চানাচুরওয়ালা চানাচুর ফেরি করে গাইছে—

চানাচুর গরম,—
চানাচুর গরমকে বাবু, মৈনে লিয়া মজাদার
চানাচুর গরম—
রা গা সরা-া সা সা-া-া
সা সা সা-া সা রা গা সা রা
সা রা মা মা মা মগা রা সা

তখন পর্যন্ত এটাকে গান বলে কেউ স্বীকার করছেন না। কিন্তু যাঁরা বিহারের দেহাতি গান শুনে অভ্যস্ত তাঁরা জানেন এটাই সেই অঞ্চলের 'পকড়'। যেমনি সুরটি অন্য কথায় ভর করে এল—'ক্যায়সে বীতেঙ্গে ইয়ে দুরদিন জানে না হো শুন সাথীরে' ইত্যাদি—তখনি আমরা তাকে গান বলে স্বীকার করে নিই। সেই গান অন্তরায় প, ধ যুক্ত হয়ে শুধু বিস্তার লাভ করছে।

তেমনি আসাম উপত্যকার প্রাণভোমরাটি লুকিয়ে আছে স জ্ঞ ম প-রচিত মধুচক্রটির মধ্যে। এটিকে অসমীয়া জাতির 'পকড়' বলা চলে। তার সাথে কোমল নিখাদ যুক্ত হয়ে আসাম উপত্যকার চিরসবুজ pentatonic minor scaleটি তৈরী হয়েছে, যাকে বলা যায় বিহু রাগ—যার মধ্যে আসাম উপত্যকা বিধৃত।

নেপালীরা এক ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি অধিজাতিতে রূপান্তরিত হলেও তাদের শিল্পায়ন একেবারে না হওয়াতে এবং পরিবহনেরও বিশেষ বিকাশ না ঘটাতে তাঁদের বিভিন্ন নৃকুলজাত স্বরের আদিম বৈচিত্র্যটির সন্ধান মেলে। তবু সবকিছুর মধ্যে যেখানে নেপালী সুরের প্রাণ সেখানে স র ম প, ধ প ম র স,

ধ্ স—এই কয়টি দুর্গা রাগের পর্দাতে বাঁধা হয়ে একটি ঔড়বজাতীয় রাগচরিত্র সৃষ্টি করেছে।

বাংলা বিশেষত পূর্ববাংলার লোকসংগীতের কিছু বিশ্লেষণ করেছেন পরলোকগত সংগীতাচার্য সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম বিশিষ্ট সংগীতবিদ্ যিনি শেষবয়সে লোকসংগীতের সুর সন্ধানে এবং সুর বিচারে অত্যন্ত ঐকান্তিকতার সঙ্গে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে এবিষয়ে যে সামান্য আলাপ হয়েছে তাতেই অনুভব করেছি শিল্পসংগীতে লোকসংগীতের উপাদান অনুসন্ধানে তাঁর আগ্রহ ছিল কী অসীম! তিনি পূর্ববাংলার সম্পূর্ণজাতি ভাটিয়ালীর রাগিণীর বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে তা খাম্বাজ ঠাটের ঝিঁঝিঁট রাগিণীর অঙ্গীভূত। আরোহণে স র ম প ধ স এবং অবরোহণে ণ ধ প ম গ র স ণ্ ধ্ পর্যন্ত নেমে পূর্বাঙ্গে ধৈবতে বিরাম নেওয়ার জন্য তিনি ভাটিয়ালীকে কসৌলি ঝিঁঝিঁট বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো এমনিভাবে কোনো লোকসংগীতকে মার্গসংগীতের কোনো রাগের সঙ্গে সাদৃশ্য পেলেই কি সেই নামে ভূষিত করা উচিত? তাহলে নেপালের অধিকাংশ সুরকে দুর্গা বা ভূপালী রাগে ফেলতে হয়, আসামের বিহুকে ধানি রাগ বলতে হয়। সংগীতবিদ্‌রা নিশ্চয়ই এবিষয়ে ভাববেন। রাগের এভাবে স্বরবিন্যাসে তাই বলেছিলাম পল্লীসুরের শ্রেণীবিভাগ হতে পারে না। তার মূল জিনিস আঞ্চলিক গায়কী, স্বরের রূপভেদ বা timbre, আঞ্চলিক চলনভঙ্গি, ছন্দ এবং উপভাষাগত ফোনেটিক্স বা ধ্বনি-বিজ্ঞান ও intonation বা বাগ্‌ভঙ্গি ইত্যাদি।

তাছাড়া ভাটিয়ালীকে সম্পূর্ণজাতি বলার আগে ভাবতে হবে তার বিবর্তনের কথা। একদিনের বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), বারেন্দ্র-পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), রাঢ়-সুহ্ম (পশ্চিমবঙ্গ), চট্টল (দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ) প্রভৃতি মিলে যে বঙ্গদেশ গড়ে উঠেছিল তাতে যে বহু উপজাতি, খণ্ডজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল তার ক্রমবিকাশের গতিধারা যথাসম্ভব অনুধাবন করা হলো লোকসংগীতের রাগবিচারে আমাদের প্রথম কর্তব্য।

বিবর্তনে সারি প্রথম, পরে ভাটিয়ালী। সারি কর্মের, ভাটিয়ালী কর্মবিরতির। সারি দলবদ্ধ, ভাটিয়ালী একক। সারি তালবদ্ধ, ভাটিয়ালী তালমুক্ত। শ্রম, সংঘবদ্ধতা ও ছন্দ পরস্পর যুক্ত—সমাজের গোষ্ঠীস্তরে এটাই নিয়ম। কিন্তু আরো উন্নত কৃষিসমাজে শ্রমের ক্ষেত্রে যেমন সুরের ক্ষেত্রেও তেমন একক বিহারের সুযোগ এল, কাটাকাটা শ্রম-ছন্দের জায়গায় একক আঁশযুক্ত বিস্তারের

সুযোগ এল। চতুস্বরিক গোষ্ঠীবদ্ধতায় এল ঔড়ব, ষাড়ব, এমন কি সম্পূর্ণজাতির স্বরবিকাশের পরিবেশ।

বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত কিছু সারি গান আছে যা চতুস্বরিক। সারি গানে পূর্বে কোনো 'তুক' থাকতো না; দু'লাইনেই তা ছিল সম্পূর্ণ। আদি লোকসংগীতে 'তুক' থাকে না। একটি সারি গান:

সোনা বউএর মনের কথা বুঝন না যায়,—
সোনা বউ, সোনা বউ মুখ খান্ কেনে ভারি
গঞ্জ থনে আইনা দিমু ময়নামতীর শাড়ি॥

পা পা-া | মা মা-া | গা গা-া | গা সা-া |
সো না . বউ এর ম নের্ ক থা .
সা সা া | গা পা মা | গা-া-া |
বু ঝ . ন না . যা . . য়্

সা সা- | গা-া া | মা পা মা | গা-া-, | মা-া পা | পা মা পা | মা৹গা-া

সো না . ব . উ সো না . ব . উ মুখ্ খান্ কেনে . ভা রি

সা-া সা | গা গা-া | মা-া পা | মা গা-া | মা া পা | পা মা পা | মা গা-া | -া-া-া

গন্ জ থ নে . আই না দি মু . ময় না ম তীর শা ড়ি....

এই সারিটি চতুস্বরিক। কিন্তু তার মধ্যে লুক্কায়িত ভাটিয়ালীর ভ্রূণকে পাই। এখনো বহু ষাড়ব জাতীয় সারি পাওয়া যায়। কিন্তু ততদিনে ভাটিয়ালীর বিকাশ ঘটেছে। তবু প্রাচীন ভাটিয়ালী কিছু আজও প্রচলিত আছে, যাতে সঙ্গীতাচার্য-বর্ণিত পূর্বাঙ্গে ধৈবতে বিরাম নেওয়ার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটি পাই না।

তাছাড়া পূর্ববঙ্গের জেলা বা অঞ্চলভেদে ভাটিয়ালীর ঠাটের মধ্যে থেকে সুরের যে অপরূপ বৈচিত্র্য, তাও সঙ্গীতবিদ্‌দের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুরেশবাবুর ষড়জ থেকে ভাটিয়ালী আরম্ভ হওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু কোনো কোনো অঞ্চলে মুদারার পঞ্চম থেকে সোজা চড়ার সা-তে উঠে ভাটিয়ালীকে নেমে আসতে দেখা যায়। তিনি বলেছেন ভাটিয়ালী উদারার ধৈবতের নিচে নামে না। কিন্তু ভাটিয়ালীতে শুধু আস্থায়ী অন্তরা থাকলেও কোনো কোনো অঞ্চলে সঞ্চারীও পাওয়া যায় এবং সেই সঞ্চারী উদারার পঞ্চমেও নেমে যেতে দেখা যায়। আবার যেমন সিলেট-ত্রিপুরা সীমান্ত অঞ্চলে কোনো

কোনো সময় ভাটিয়ালী অবরোহণে কোমল গান্ধারের স্পর্শে অপরূপ মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। তথাপি সুরেশ চক্রবর্তী-বর্ণিত ভাটিয়ালীর রূপটিই তার পূর্ণাঙ্গ রূপ, যেখানে অবরোহণে প ম গ র স ণ্ ধ্া-য় এসে বিরতি নেওয়াতেই তার প্রাণাবেগের স্ফূর্তি।

ঠিক তেমনি উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়াও সুরেশবাবু বর্ণিত খাম্বাজ ঠাটের মধ্যেই পড়ছে। কিন্তু তার ধরনটা স্বতন্ত্র। ভাটিয়ালী চড়ার সা থেকে কোমল নিখাদ স্পর্শ করে নেমে আসে, কিন্তু ভাওয়াইয়া আরোহণে চড়ার সা-তে আর যেতে চায় না—কোমল নিখাদে দীর্ঘ বিরাম নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু আবার ভাটিয়ালীর মতো উদারার ধৈবতে নেমে আসে না, মুদারার ষড়জে এসেই বিরাম নেয়।

বাউলও সেই ঠাটেই পড়ে। বাউল কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে সমগ্র বাংলায় ব্যবহৃত হয়। তত্ত্ব এবং জীবনদর্শন হিসাবে আমি পূর্বে বাউল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু সুর হিসেবে যখন আলোচনা করব তখন মধ্যবঙ্গের লালনশাহী বাউলের রাগরূপকেই বাউল সুর বলে ধরব। পূর্ববঙ্গে তা হয়েছে বাউলা এবং তা ভাটিয়ালীতে মিশে গেছে। রাঢ়বঙ্গের বীরভূমের যে বাউল তা ভাবের দিক থেকে যেমন খাঁটি বাউল নয় (বৈষ্ণব বাউল বলাই ঠিক), তেমনি সুরেও ঐ ভৈরবী বাউলের স্বরূপ নির্ধারণ, তার উৎপত্তি ও বিকাশ, একটা বিতর্ক-মূলক বিষয়। সঙ্গীতশাস্ত্রীদের তা আলোচ্য। যাহোক, মধ্যবঙ্গের বাউল সুরকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাণভরে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছিলেন। আমরাও বাউলসুর বলতে তাকেই গ্রহণ করব এবং তাতে সুরেশবাবু বর্ণিত এক 'খাম্বাজ' ঠাটের স্বরবিন্যাসের সূত্রে বাঁধা পূর্ববঙ্গ-মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মূল চরিত্রটা ধরতে পারব। মধ্যবঙ্গের বাউলে ভাটিয়ালী বা ভাওয়াইয়ার মতো বিলম্বিত বিস্তার নেই, তা ছন্দপ্রধান। ভাবমুখী গায়কীও সহজ। ভাওয়াইয়া বা ভাটিয়ালীর মতো উত্তরাঙ্গে high pitch-এর পুকার তাতে নেই।

সীমান্ত রাঢ় বাংলার সংগীতের প্রকৃতি মনে হয় উপজাতীয় স্তর থেকে জাতীয় স্তরে এখনো ওঠেনি। সেই উপজাতীয় সুরের কেন্দ্রভূমি ছোটনাগপুর। প্রায় দেড়শ বছর আগে ছোটনাগপুরের কিছু আদিবাসী চা-শ্রমিক হয়ে আসামে গিয়েছিল। সেখানে যে সুরে ওরা ঝুমুর, করম ইত্যাদি গায়, সীমান্ত রাঢ় বাংলার সাথে তার কোনো পার্থক্য পাই না। কাজেই একে বাংলার লোকগীতি কতটুকু বলা যায় সঙ্গীতশাস্ত্রীরা তা ধার্য করবেন।

বাংলাদেশের লোকসংগীত বিচারে আর একটি বিষয় বিবেচ্য—লোকসংগীতে রাগসংগীতের প্রভাব। লোকসংগীত থেকে রাগসংগীতের উৎপত্তি হলেও, এবং দুটি ধারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রেখে প্রবাহিত হলেও কোনোটাই one-way traffic নয়। রাগসংগীত লোকসংগীতকেও প্রভাবান্বিত করেছে। আমাদের গ্রাম্য অঞ্চলে যারা বাদ্যকর সমাজ তাদের সানাই বিয়ে বা উৎসবের সময় বিশেষ রাগ অবলম্বনেই আলাপ করেছে। যাত্রা গানের বিবেকের গান চিরদিনই রাগ আশ্রয় করেছে। আমাদের কোনো কোনো অঞ্চলের লোকসংগীতে ভীমপলশ্রী, পিলু, দেশ ইত্যাদির সুস্পষ্ট রেশ পাওয়া যায়। সুরেশবাবু যে বিভাস-এর উল্লেখ করেছেন তা শাস্ত্রীয় বিভাস থেকে ভিন্ন। একে সংগীতবিদ্‌রা বলেন বাংলা বিভাস। কিন্তু এটা আমাদের ভাটিয়ালীর সঙ্গেও এমন মিশে গেছে যে লোক-সংগীত থেকে পৃথক করে ভাবতে পারি না। অবশ্য যা গ্রাম্যগীতি তা-ই লোকসংগীত নয়। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের দাদা আবতাবুদ্দিন খাঁর সুর সংযোজিত ত্রিপুরার মনমোহন দত্তের গান গ্রামে প্রচলিত আছে—যাকে রাগপ্রধান গান বলা চলে, লোকসংগীত নয়।

সংগীতগুরু আলাউদ্দিন খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের অনেক কথাই লেখা হচ্ছে, কিন্তু একটা মূল অধ্যায়কেই ডিঙিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যেন দৈবাৎ কৃষকের ঘরে জন্ম নিয়েই অসীম সংগীত-পিপাসায় তিনি ঘরছাড়া হলেন। বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গেই) যে-সমাজে তাঁর জন্ম সেই সমাজ বাংলাদেশের পল্লীসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে—যার মূল্যায়ন আজও হয়নি। সেই সমাজ হিন্দুদের কাছে ছিল মুসলিম, মুসলিমদের কাছে ছিল হিন্দু। সেই উদারতার পরিবেশে তাঁরা রাখালিয়া ঐতিহ্য থেকে আরম্ভ করে মার্গসংগীতকে সমানভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। পরে আবার সেই সমাজকেই কেন্দ্র করে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে 'ব্যাণ্ড পার্টি'র দল গড়ে উঠেছিল—যেখানে trumpet, trombone প্রভৃতি পশ্চিমী বাদ্যযন্ত্রের আমদানি হয়েছিল। সেই অর্থে গ্রামে পশ্চিমী orchestration-এর প্রথম প্রচলন তাঁরাই করেন। আলাউদ্দিন খাঁর মধ্যে এই ঐতিহ্যেরই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। লোকসংগীত আলোচনার সময় গ্রাম্য সংস্কৃতির এই বিশিষ্ট সংগীত ধারাটির কথা ভুললে চলবে না।

আঞ্চলিক গীতরীতি ও চলনভঙ্গিই মূল কথা

আমরা দেখেছি শুধু স্বরের গঠনরীতি ও বিন্যাস দিয়ে লোকসংগীতের কোনো

শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। কারণ পৃথিবীর বহু অঞ্চলের লোকসংগীতে স্বরবিন্যাস প্রায় এক। আমেরিকার Society for Ethnomusicology-র মুখপত্র *Ethnomusicology*-তে M. Kolinski এক জায়গায় লিখছেন: "Since the human voice is able to produce with equal facility a virtually unlimited number of pitch shades within the natural limits of its range, we are faced with the crucial problem of: 1) what causes the singer to select certain tones out of the pitch continuum and to organise them into coherent structures and 2) why similar patterns of tonal construction can be found in widely separated areas and in strongly contrasting cultures, such as the so-called half-toneless pentatonic scale (for example, CDEGA) which Europe shares with a large part of the world, particularly with Northern Asia, with American Indians, and with Negro Africa."

উপরে যে scale-এর কথা বলা হয়েছে তা হলো স, র, গ, প, ধ—অর্থাৎ ঔড়বজাতীয় ভূপালীর পর্দা। আমাদের দেশেও লোকসংগীতে এর ছড়াছড়ি। আবার চীন দেশেও দেখেছি—তার লোকসংগীতে এই ভূপালীর শুদ্ধ পর্দা কয়টির কী অসাধারণ প্রভাব! কাজেই সংগীতশাস্ত্রীদের সামনে, দেশে দেশে এত দূরত্ব ও পার্থক্য থাকা সত্বেও তার সাধারণ মানুষের স্বর নির্বাচনের এই সাদৃশ্য একটা চিরন্তন প্রশ্ন। তেমনি স র ম প ধ—এই দুর্গা রাগের পর্দায় আমাদের দেশে, চীন দেশে ও অন্যান্য অনেক দেশে বহু লোকসংগীতের গাঁথুনি তৈরি হয়েছে। আবার মধ্যপ্রাচ্য, আরব, মধ্য এশিয়া, উজবেকিস্তান, আজেরবেইজান প্রভৃতি হয়ে ভারতের, বিশেষ করে পাঞ্জাব প্রদেশে, এবং চীনের সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মাবলম্বী সিনচিয়াং প্রদেশের লোকসংগীত ভৈরবীর কোমল পর্দাগুলি দিয়ে ওঠানামা করছে। কিন্তু স্বরবিন্যাসের এই সাদৃশ্য থাকা সত্বেও এদের জাতীয় ও আঞ্চলিক বৈসাদৃশ্য ও বৈশিষ্ট্য আসে কোথা থেকে? সেই উপকরণগুলি কী!

কণ্ঠস্বরের রূপভেদ

পূর্বে এক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি শ্রমের প্রক্রিয়ায় মানুষের larynx স্বরযন্ত্রের

বিকাশ কিভাবে ঘটেছে। এবং কী করে ধ্বনিযুক্ত ভাষার উৎপত্তি হলো, যা হলো সংগীতেরও আদিকথা।

লোকসংগীতে আমাদের আলোচনার বিষয় 'গ্রাম্যস্বর' ও পরিশীলিত স্বরের ব্যবধানটার রূপ কী? কারণই বা কী?

আমাদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে, 'মেঠো গলা' আর 'শহুরে গলা'। তার সংজ্ঞা কী? কিছুদিন একটি সমীক্ষা করেছিলাম। আকাশবাণীর বিভিন্ন মিটার-ব্যাণ্ডে ভোর থেকে রাত্রি অবধি লোকসংগীতের অনুষ্ঠান হয়। অধিকাংশ নামই অজ্ঞাত। এই অজ্ঞাতদের একটা লিস্ট করে 'গেঁয়ো' ও 'শহুরে' বলে এদের কণ্ঠের বিভাগ করে পরে অনুসন্ধান করে শিল্পীদের বাড়িঘর, অতীত জীবন, সংগীতশিক্ষার পরিবেশ ইত্যাদির সমীক্ষা করে দেখা গেল যে স্বরের এই 'গেঁয়ো' ও 'শহুরে' বিভাগটার এক বাস্তব ভিত্তি আছে।

তাহলে এই folk-timbre বা কণ্ঠস্বরের গ্রাম্যতা জিনিসটা কোথা থেকে আসে? কতটা তার শ্রমপ্রক্রিয়াগত, কতটা সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, জল-মাটি-হাওয়াজাত, কতটা বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীর শারীরিক anatomy-গত, কতটা বাগ্‌ভঙ্গিজাত? *Ethnomusicology* সাময়িকপত্রে Frances Deusmore সংগীতে racial peculiarities সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন: "The only respect in which negros show a racial advantage in music over whites is in vocal ability. This is due to anatomical differences in the vocal organs of the two races."

আবার রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখছেন: "We only know that the Indian has a singing technique which we do not possess, many tribes of Indians singing with teeth and lips slightly parted and separating the tone by a contraction of the glottis...."

অর্থাৎ তিনি কিছু নৃকুলগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন। কিন্তু জাতিতে জাতিতে কণ্ঠগত বৈশিষ্ট্য যতই থাক, সাধারণভাবে পৃথিবী জুড়েই, বিশেষত আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে, শহুরে ও গ্রাম্য বিভাগটি স্বরের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। কেউ কেউ বলতে পারেন 'শহুরে' বলে যাকে বলা হয় তা হলো 'রেওয়াজী পরিশীলিত,' আর গ্রাম্য স্বর হয় 'অ-রেওয়াজী আনকোরা'। কিন্তু মোটেই তা সত্য নয়। গ্রামের দক্ষ শিল্পীকেও প্রচুর রেওয়াজ করতে হয়—কিন্তু তার রেওয়াজের পদ্ধতি স্বতন্ত্র।

সেই স্বর আবার তার pitch বা উচ্চতা-নিম্নতা, intensity বা তীক্ষ্ণতা, তার কম্পন, প্রক্ষেপভঙ্গি, মীড়, ঝোঁকপ্রাধান্য, আরোহণ অবরোহণের বিশেষ ধরন মিলেই একটা বিশেষ চরিত্র লাভ করে।

আঞ্চলিকতা

স্বরের 'গ্রাম্যতা'র পরেই লোকসংগীতের চরিত্র বুঝতে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তার 'আঞ্চলিকতা'র বিশেষ চরিত্রটি। সেই চরিত্রের প্রধান উপকরণ হল 'গায়কী'। এক অঞ্চলের বিশিষ্ট লোকশিল্পী অন্য অঞ্চলের গান গাইতে গেলেই ধরা পড়ে যান। এই আঞ্চলিক সহজাত গায়কীর সাথে যেন সেই অঞ্চলের একটা প্রাকৃতিক সম্পর্ক রয়েছে—যা শিশুর মাতৃভাষা শেখার মতোই 'ব্যাকরণহীন'। চারিদিকের কর্ম-জীবন, মাটি, জল, রোদ, বৃষ্টি, পাহাড়পর্বত সামগ্রিকভাবে হলো লোকসংগীতজ্ঞের শিক্ষকহীন শিক্ষালয়। মুক্ত আকাশের নিচে সমপ্রান্তরে গলা টানলে তার যে রূপ, পাহাড় বেয়ে যেতে যেতে গলা টানলে সেটা হবে অন্যরূপ। মুক্তপ্রান্তরে গলার যে pitch, উচ্চতা, প্রাঙ্গণে বসে গাইলে সে pitch থাকবে না। এটা পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য। তাছাড়াও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের স্বরপ্রক্ষেপে এমন এক প্রকারের 'গলা ভাঙা', yodelling, গলার খোঁচ, বা 'লৌকিক অলংকার' যুক্ত হয় যা কোনো শহুরে ওস্তাদ হাজার রেওয়াজ করেও আয়ত্ত করতে পারে না। এমনকি এক অঞ্চলের লোকসংগীতশিল্পী অন্য অঞ্চলের বিশেষ লৌকিক অলংকারটি আয়ত্ত করতে পারেন না। রাগসংগীতে বিভিন্ন কূটতানে রপ্ত ব্যক্তিকে লোকসংগীত শেখাতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের কাছে ভাটিয়ালীর যে ভঙ্গিটি মনে হয় অত্যন্ত সহজ—তা তিনি কিছুতেই তুলতে পারছেন না। অনেক শহুরে-সুকণ্ঠ লোক সংগীতের melodic structure-টা সুরের কাঠামোটা ঠিকই আয়ত্ত করতে পারেন—কিন্তু তবু আঞ্চলিকতার সেই কণ্ঠভঙ্গীটি আয়ত্ত করতে না পারাতে তাঁদের গানে কাদামাটিহীন পরিচ্ছন্নতায় মাটির গন্ধটি —অর্থাৎ জনজীবন- ঘনিষ্ঠতাটি হারিয়ে যায়। লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'ফান্দে পড়িয়া বগা' গানের রেকর্ডটি এবং আব্বাসউদ্দীনের সেই গানের রেকর্ডটি পর পর বাজিয়ে দেখলেই কথাটা উপলব্ধি করা যাবে।

লোকসংগীত গুরুমুখী নয়—গণমুখী। লোকসংগীতের কোনো 'ঘরানা' নেই, আছে 'বাহিরানা'। এই আঞ্চলিকতাকেই আমি 'বাহিরানা' বলছি। কোনো অঞ্চলের গান গাইতে গেলে সেই অঞ্চলের জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য প্রয়োজন।

প্রত্যেক সার্থক লোকসংগীত শিল্পীর গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভেসে ওঠে একটা visual image বা চাক্ষুষ চিত্র। কোনো মার্গসংগীত শিল্পী যখন টোড়ী রাগে আলাপ করেন তখন তাঁর চোখের সামনে 'উদার বক্ষযুক্ত সর্পাকৃতি দুইটি অলকের অধিকারিণী সুরাকৃষ্ট বনের হরিণবেষ্টিতা বীণাবাদনরতা এক সুন্দরী বিরহিণী ভামিনী'র ছবি ভেসে ওঠে কিনা জানি না, উঠলেও এই বিমূর্ত ছবিটি কেবল গায়কবিশেষের চোখেই থাকে। কিন্তু ভাটিয়ালী বা ভাওয়াইয়া সুরের সত্যিকারের শিল্পী যখন সুরে টান দেন তখন তাঁর মানসচক্ষে যে জনপদের, যে প্রকৃতি ও প্রান্তরের ছবি ভেসে ওঠে তা সুস্পষ্ট এবং তার communication বা ভাবানুষঙ্গটিও সর্বজনীন। সেখানে 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'মৈষাল বন্ধু' বা 'গড়িয়াল ভাই' কথাগুলো না থাকলেও চলে, শুধু সুরের মধ্যে যে association বা অনুষঙ্গ তার অনুভূতি সর্বজনীন। সেখানে যে আর্তি, তাতে পাই শ্রমজীবী মানুষের একটানা বঞ্চনার অভিব্যক্তি। সেখানে মিশে থাকে ঘাম এবং কান্না, আবার জীবনের অসীম আকুতি ও আশাবাদ।

এসব কিছুর সাথে বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক বাগভঙ্গি, উচ্চারণভঙ্গি ইত্যাদি মিলেই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে—যে বিষয়ে গবেষণার বিরাট ক্ষেত্র এখনো অকর্ষিত রয়ে গেছে। এখনো দেখা গেছে এক আঞ্চলিকতায় সম্পূর্ণ রপ্ত কোনো কণ্ঠ অন্য আঞ্চলিক গান গাইতে গিয়ে সেই অঞ্চলের বিশেষ খোঁচগুলিই যে দিতে পারছেন না শুধু তা নয়—তিনি তাঁর মৌলিক tonal textureটাই হারিয়ে ফেলেছেন। আমাদের পথিকৃৎ আব্বাসউদ্দীন উত্তরবঙ্গের গান না গেয়ে যখনি পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী গাইতে গেছেন তখনি দেখেছি তিনি যে ভাটিয়ালীর বিশেষ ভঙ্গিটিই আনতে পারছেন না শুধু তা নয়, তাঁর tonal qualityও বেমালুম বদলে গেছে। কিন্তু শচীন দেববর্মণ অনেক সাবধানী শিল্পী, তিনি কোনোদিন ভাওয়াইয়া গাইতে যাননি। তাছাড়া আঞ্চলিকতায় pitch এর প্রশ্নটাও আছে। আমাদের অধিকাংশ লোকগীতির প্রাণস্ফূর্তি high pitch বা উচ্চগ্রামে। নিচু গ্রামে তা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। শহুরে সাধা গলায় সেই সব লোকগীতি গাওয়ার range প্রায়ই থাকে না। অবশ্য সব সময়ই উচ্চগ্রাম লাগবে এমন কোনো কথা নেই, কোনো কোনো সময় মন্থর-আকুতি ও আঞ্চলিক গায়কীতে নিচু গ্রামেও গান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

চলনভঙ্গি

শাস্ত্রকারেরা সংগীতের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন গীতবাদ্য ও নৃত্য। আজ অন্যান্য গীতের থেকে নৃত্য একেবারে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু লোকসংগীতে গীতবাদ্য ও নৃত্য আজও অটুট ও অভিন্ন। এখানে নৃত্য বলতে আমি ব্যাপক অর্থে ছন্দোবদ্ধ শরীর সঞ্চালন বুঝাচ্ছি। খাঁটি লোকসংগীত গায়ক আড়ষ্ট হয়ে বসে কখনো গান করতে পারেন না। লোকগীতির সঙ্গে movement জড়িয়ে আছে। সমবেত গোষ্ঠীজীবনের শ্রমের ছন্দের সঙ্গে যখন গীতের উৎপত্তি, সেই সময়কার ঐতিহ্য বহন করে আসছে এই movement। আদিবাসীদের মধ্যে গান ও নাচ এখনো অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে। কিন্তু পরবর্তী সমাজে একক গায়কও দেহভঙ্গি না করে গান গাইতে পারেন না। যদি কখনো বসে গান করেন তখন তাঁর দেহ ও মনে কিন্তু নাচেরই ছন্দ। শহুরে গায়করা মাইকের সামনে যেভাবে নিশ্চল-নিস্পন্দ হয়ে গান করেন, তাতে লোকসংগীতের একটা বড় অঙ্গহানি ঘটে, যা তাঁরা বুঝতে পারেন না।

যে আদি শ্রমজীবন থেকে ছন্দ ও তালের উৎপত্তি সেই ছন্দ ও তাল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এক এক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে পরে বহুধা বৈচিত্র্য লাভ করেছে উন্নত সমাজে। আমরা জানি দুই ও তিন মাত্রার টানাপোড়েনে কী বিচিত্র তাল ও ছন্দের সম্ভার গড়ে উঠেছে। এবং রাগসংগীতে লয়কারী আজ অনেক সময় সুরের চেয়েও বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে।

অনেকের ধারণা লোকসংগীত দাদরা, কাহারবা-র কারবার—সেখানে 'লয়কারিত্ব' কিছুই নেই। কিন্তু এর মতো ভুল আর নেই। আমরা জানি, পাশ্চাত্যে ২-এর ছন্দে 'ফক্স-ট্রট্', 'পোলকা', 'রুম্বা', 'টেঙ্গো' প্রভৃতি এবং ৩-এর ছন্দে 'ওয়াল্জ', 'মাজুরকা' ইত্যাদির কী বিচিত্র ছন্দের লীলা! ঠিক তেমনি আমাদের দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ছন্দের বিচিত্র খেলা আমাদের লোকসংগীতে দেখতে পাই। ঢাকের ছন্দ বা ঢোলের ছন্দ বোলের তাৎপর্য আছে—যা তবলার বোলবাণীতে ধরা যায় না। দাদরা ও খেমটার তফাত আমরা জানি। তেমনি তিনমাত্রার প্রথম মাত্রাতেই প্রবল ঝোঁক—বিশিষ্ট ওয়াল্জের মতো আমাদের লোকসংগীতেরও চলন আছে। ৩।২।২ সাত মাত্রার তেওড়াও আছে, কিন্তু শাস্ত্রীয় তেওড়ার চলন থেকে একটু ভিন্ন। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় একটি বৈশিষ্ট্য লোকসংগীতে লক্ষ করা যায়—সেটি হলো তার আড়া চলন। ঠিক যেমন কণ্ঠে এক 'অহ্' সর্বত্র শোনা যায়। কিন্তু এই আড়া চলন—ঠিক কণ্ঠে 'অহ্'র মতো

স্বতঃস্ফূর্ত—গায়ক সচেতনভাবে তা করেন না। আমাদের লোকসংগীতেও আড়া চলনটার একটা বিশেষ ভঙ্গিমা আছে। কিন্তু শহরের লোকসংগীত গায়করা সেটা সচেতনভাবে অনুকরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন: তখন বৈশিষ্ট্যটা হয়ে ওঠে **mannerism** বা মুদ্রাদোষ। সুরের ক্ষেত্রে হারমনিয়মটা যেমন লোকসংগীতের বিরোধা, তালের ক্ষেত্রেও তবলাটা লৌকিক ছন্দের বিরোধী যন্ত্র। একটা ডপ্‌কী বা খঞ্জনিতে যে অপরূপ ছন্দ তোলা যায়, তবলায় তা পাই না। দোতারাটা শুধু যে লোকসংগীতের **sentiment** সৃষ্টি করে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সে তাল-ছন্দও রক্ষা করে।

এসব নিয়েই লোকসংগীত ও তার গায়কী গড়ে উঠেছে, কেবল স্বরবিন্যাস করে এর বিচার সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আলাউদ্দীন খাঁ-র এক বৈঠকী আলোচনা-আসরে লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে জীবনের এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি গেয়ে উঠলেন তাঁর ছোটবেলাকার গ্রামে শেখা এক লোকগীতি:

"নিরলে কইও দুঃখ বন্ধুয়ার লাগ পাইলে,
আমার বন্ধু রঙ্গী চঙ্গী
হাওরে বানাইছে টঙ্গী—
তবু পরান না জুড়ায় বাতাসে ॥ গো নিরলে..."

পরিণত বয়সে তাঁর কণ্ঠে খাঁটি সুরে গ্রাম্য গায়কী শুনে সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিলাম। সর্বভারতীয় সংগীতগুরু ভাটিয়ালীর আদি কাদাজলীয় রূপটি কি সুন্দর ধরে রেখেছেন কণ্ঠে। তিনি বলেছিলেন: "গায়কীটাই আসল কথা।" বলেই সেই গানটির প্রথম লাইনটা সেই একই পর্দায় রাগসংগীতের গায়কীতে একবার গেয়ে বললেন: "এখন আর ইটা লোকসংগীত রইলো না।"

লোকসংগীতের আরো কিছু সমস্যা আছে। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের একটি **Encyclopaedia** ***The World Of Music***-এ লোকসংগীত সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লেখা হয়েছে: **"Folk songs are always in the major and never in minor mode and are usually constructed on the diatonic scale"**। কিন্তু আমাদের দেশের লোকসংগীতের অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র। উপরের সামান্য দু-একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই আমরা দেখেছি **minor mode**ও আমাদের লোকসংগীতে আছে।

আর একটা কথা, আমাদের দেশের লোকসংগীতের **melodic character**

বা একস্বরবাহী সুরের চরিত্রটিতে অনেকে choir system-এ গাইতে শুরু করেছেন। সমষ্টি লোকগীতও আছে, কিন্তু সেটা এক সাথে এক পর্দায় যাকে বলে unison তাতে গাওয়া হয়। কোনো chord-এর আভাসও তাতে নেই। আমাদের লোকসংগীতের মূল আবেদন একস্বরবিন্যাসে। ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালী যদি unison-এ কোরাসও গাওয়া হয় তবে তার প্রাণভোমরাটি মরে যায়। যে কারণে হারমনিয়মটা লোকসংগীতের বিরুদ্ধবাদী যন্ত্র। কারণ হারমনিয়মের স্বাভাবিক প্রকৃতিই হলো chord-এর দিকে এবং শ্রুতির কাজকে চেপে দেবার দিকে। যন্ত্রটির নামেই 'হারমনি'।

এ যুগের সংগীতশাস্ত্রী ও লোকসংগীত

এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ আলোচনার উপসংহারে আজকের সংগীতশাস্ত্রীদের কাছে বিনীত আবেদন রাখতে চাই। আজ অপসংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ আক্রমণে, সরকার ও একচেটিয়া-করতলগত গণমাধ্যমের দৌলতে বাংলা লোকসংগীতের বিকৃতি এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও ব্যবসায়ী আর্থিক আনুকূল্যে এমন এক commercial brand-যুক্ত manufactured folk-music-এর 'ককটেল' এই মহানগরী কলকাতার রসের ভিয়ানে নিত্য উৎপাদন হচ্ছে যাতে এতটুকু বাংলার মাটির স্বাদ নেই। আগেই বলেছি একদিন তিস্তা নদী বা তিতাস নদীর জলকে কলকাতায় বয়ে আনতে কী সংগ্রাম করতে হয়েছিল। আজ বিচ্ছিন্ন বিকৃত ভদ্রশ্রেণী সেই জলের সুর থেকে সুরা তৈরি করে সমস্ত বাংলা ভাসিয়ে দিচ্ছেন। অথচ আমাদের সংগীত-শাস্ত্রীদের কাছ থেকে কোনো বিশেষ প্রতিবাদ শুনতে পাচ্ছি না। বিকৃতি সর্বত্র। কিন্তু দরবারী সংগীতের প্রহরীরা জাগ্রত। সেখানে বিকৃতি ঘটানো সহজ কাজ নয়; বিদেশে গিয়ে গ্র্যামার অর্জন করলেও তা সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-সংগীতের প্রহরীরাও চিরজাগ্রত--পান থেকে চুন খসলেই তাঁরা শোরগোল করে ওঠেন। কিন্তু পিতৃমাতৃহীন অনাথ লোকসংগীতের জন্য কাঁদবার কেউ নেই। যতই আত্মীয় পরিপোষণ হোক না কেন আকাশবাণীতে প্রতিদিন রাগসংগীত বা রবীন্দ্রসংগীতের যে প্রোগ্রাম হয় তাতে তার ঐতিহ্য মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু লোকসংগীত নামে যা হয় তার এবং যাঁরা গেয়ে থাকেন তাঁদের শতকরা ৯০ জনকে লোকশিল্পী আখ্যাই দেওয়া চলে না। অথচ যাঁরা এ বিষয়ে সবচেয়ে বলবার অধিকারী সেই সংগীতবিদ্‌রা নীরব। এখনো তাঁরা জনতা থেকে দূরে দরবারী পরিবেশেই থাকতে

চান। কিছুদিন আগে শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র 'বৈতারিক লোকগীতি' বলে এই বিকৃতির প্রতিবাদ করে সত্যিকার লোকগীতির অনুরাগীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেতারকর্তাদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন এবং বিকৃতির মূল কারণটি অনুসন্ধান না করে কেবল ব্যক্তিগত শিল্পীদের দোষ দিয়েছেন। অথচ আকাশবাণী হয়ে উঠেছে ভেজাল লোকসংগীতের নিয়মিত পরিবেশক!

যাঁরা রাগসংগীতের বিশেষজ্ঞ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই একটা কথা নিবেদন করতে চাই। লোকসংগীত সম্বন্ধে তাঁদের অবজ্ঞা না হলেও অজ্ঞতা এই বিকৃতিকে অনেকখানি সাহায্য করছে। অনেক সময় দেখেছি রাগসংগীতের ওস্তাদ, যাঁরা রাগরাগিণীর অটব্য-বনানীর মধ্যে শুধু পাতা দেখেই নির্ভুলভাবে গাছের নামটি বলে দিচ্ছেন, তাঁরাই বাংলার প্রান্তরের দুটি ডাল মেলা চিরসবুজ গাছ ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালীর পার্থক্যটা বুঝতে পারছে না। তার মানে দেশকে বুঝতে না পারা। রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞদের কথা বলবো না, তাঁদের অধিকাংশের অজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছে উন্নাসিকতা। কারণ এঁদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত হলো বিদগ্ধ সমাজের status symbol! একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীকে বলেছিলাম—জানেন তো গুরুদেবেরও গুরু ছিলেন, তাঁর নাম লালন ফকির। রবীন্দ্রনাথের বাউল গান তো আপনারা করেন, একটি লালনের গান শোনান না! কিন্তু লালনের একটি গানও না জানাতে তিনি লজ্জা বোধও করলেন না একটু। অবশ্য সবচেয়ে অপরাধী লোকসংগীত গাইয়েরা নিজে। একদল, শহরে যাঁদের জন্মকর্ম, এঁরা জানেনই না কী তাঁরা গাইছেন। অন্যদল জ্ঞানপাপী।

যাহোক, সংগীতশাস্ত্রীদের কাছেই আমাদের মূল আবেদন। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য-প্রণীত 'বাংলার লোকসাহিত্য' প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংগীতাচার্য সুরেশ চক্রবর্তী লিখেছেন: "কঠিন রাগসংগীতকে হজম করে স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে রাখাতে বাঙ্গালার শিল্পীমনের এই সবল পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, এবং যখন দেখি কীর্তনের পেছনেই শক্তিরূপে রয়েছে লোকসংগীতের ধারা, তখন সাধারণ শিক্ষিত লোক হিসেবে এর বিচার না করেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের কলাবস্তু হিসেবে একে অবহেলার চোখে দেখে আমরা জাতিগত অপরাধ করেছি। সেই অপরাধ স্খালনের কিছুটা চেষ্টা মাত্র এখানে করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ কাজ একদিনের নয় বা একজনের নয়…।"

গত শতাব্দীতে সংগীতাচার্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তব্যটি উচ্চাঙ্গ সংগীত-সেবীদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এই শতকের অর্ধাংশ পার হয়ে যাবার পর

আর একজন সংগীতাচার্য সে কর্তব্য পালন না করাতে অপরাধ স্বীকার করে গেলেন। আমি তাঁদের কথা অনুসরণ করেই আবেদন জানাচ্ছি। আজও মার্গ-সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে লোকসংগীতের অবহেলা সর্বত্র। কলকাতা ভাতখণ্ডে কলেজের পাঠ্যসূচির পুস্তক 'সংগীতদর্শিকা'য় মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায় 'বাংলাদেশের লোকসংগীত' সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তা পড়লেই বুঝতে পারা যাবে এই অবহেলার পরিমাণ। সংগীত-বিশারদ উপাধিপ্রার্থী ছাত্রদের পরীক্ষা পাশের তাগিদে 'অন্ত্যজ' লোকসংগীতের যে made-easy notes তাতে সন্নিবেশ করা হয়েছে তাতে সংগীত আলোচনা কিছুই নেই। যৎসামান্য সামাজিক-ঐতিহাসিক আলোচনা যা আছে তা রীতিমতো হাস্যকর। পড়লে মনে হয় একদা পঞ্চদশ শতাব্দীর কোনো এক সুপ্রভাতে 'বাংলা, আসামে ও মিথিলায়' একদল মাঝির কণ্ঠে হঠাৎ ভাটিয়ালী সুরের উৎপত্তি ঘটেছিল। সমগ্র সাংগীতিক structure বা কাঠামোতে লোক-সংগীতের কী দান, সে বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই। এই ব্যুৎপত্তি নিয়ে যাঁরা সংগীতবিশারদ হবেন তাঁদের কাছে আর কী আশা করা যায়! এই পুস্তকের ভূমিকা লিখেছেন পণ্ডিত রতনজংকর। অথচ লৌকিক ও রাগসংগীতের উৎসের সন্ধান করে পণ্ডিত রতনজংকর বলেছেন: "লোকসংগীতের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ব্যতীত কোনো দেশেরই সংগীতশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।" ('লৌকিক ও লোকসংগীতের উৎস সন্ধানে'—ডঃ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজংকর। অনুবাদ: কৃষ্ণা বসু)।

সংগীত সমালোচক ও গবেষক ও সংগীতশাস্ত্রীদের কাছে আবেদন, তাঁরা 'ছোটলোক'দের মধ্যে নেমে এসে তাঁদের ভাঙাঘরের দাওয়ায় বসে, তাঁদের শিল্পীদের জীবন ও সুরসৃষ্টির প্রকৃতি ও পদ্ধতিটা জানবার চেষ্টা করুন। অন্যের সংগৃহীত উপাদান শহরের সাংগীতিক ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে লোকসংগীতের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। আজকাল টেপ্ রেকর্ডার তাঁদের কাজকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হচ্ছে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও তাঁরা উপকৃত হবেন।

আমাদের national music বা জাতীয় সংগীতের গোড়াকার কথা folk music বা লোকসংগীত। সেই লোকসংগীতের চরিত্র-নিধন মানে জাতীয় সাংগীতিক চরিত্রের নিধন। আর তা চলছে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে। এটা সামগ্রিক-ভাবে সংগীতেরই সংকট। আমার এই অসম্পূর্ণ আলোচনায় এই সংকটের স্বরূপ তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। আমি শুধু বলতে চেয়েছি, এই সংকটে সংগীতশাস্ত্রীদের একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব আছে। তাঁদের কাছ থেকে থিওরেটিক্যাল বা তত্ত্বগত

হাতিয়ার পেলে এই বিকৃতির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রামে আরো দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব। আজ বাংলাদেশের বহু সংগীতপিপাসু সমজদার সামগ্রিক সাংগীতিক বিকৃতির বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সেই পরিমাণে তাঁরা সোচ্চার হতে পারছেন না। বলতে সাহস হয় না, তবু বলতে হয় সংগীতশাস্ত্রীদের যেতে হবে জনতার দরবারে। রাগসংগীতেরও বিকাশ ও ব্যাপ্তির স্থল আজ সেটাই। তাই তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সংগীতের মহাসিন্ধুতে পাল খাটালেও কবির ভাষায় ঘর থেকে দু' পা ফেলে বাইরে এসে তাঁদের আজও দেখা হয়নি—"একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু"।

গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত

আমেরিকার বিশিষ্ট সংগীত সমালোচক ব্রুনো নেট্ল (Bruno Nettle) তাঁর 'ফোক অ্যাণ্ড ট্র্যাডিশনাল মিউজিক অব দি ওয়েস্টার্ন কন্টিনেণ্ট্স' বইতে লোকসংগীতের অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হিটলার-জার্মানি এবং স্টালিন-রাশিয়াকে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছেন। তিনি অবশ্য কোনো গানের উদ্ধৃতি দেননি। তবু তিনি যে লোকসংগীতের প্রবাহের দুটি ধারাকে গুলিয়ে ফেলেছেন, সেটা তাঁর লেখা থেকেই সুস্পষ্ট। একটি ধারা গণস্বার্থবিরোধী শাসকশক্তির ভাবধারায় প্রবাহিত, অন্যটি গণচেতনায় অর্থাৎ শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ গণমানসের সহজাত ধারা।

শোষকশ্রেণীর উগ্রজাত্যভিমান, জাতিবিদ্বেষ এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সাধারণ মানুষের জীবনকে, তাদের চিন্তাধারাকে বারে বারে দূষিত করেছে। তাদের লোকগীতিতেও তার বহু চিহ্ন পাওয়া যায়। অর্থাৎ লোকসংগীতের জীবনমুখী লোকায়ত ধারার পাশাপাশি একটি প্রচ্ছন্ন, কোনো কোনো সময় সুস্পষ্ট, দূষিত জীবনবিমুখী ধারাও আছে। তাই লোকসংস্কৃতির অগ্রগতির ধারাটা শুধু গ্রহণের নয়, বর্জনেরও। এবিষয়ে লেনিনের বিখ্যাত উক্তির ("There are two nations in every modern nation...There are two national cultures in every national culture") দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে।

অক্টোবর বিপ্লবের অরোরার গোলাবর্ষণে রাশিয়ায়, বিশেষত সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার অন্ধকার দেশগুলিতে প্রাচীন সামন্তীয় মোল্লাতন্ত্রের অচলায়তনের প্রাচীরগুলি যখন ভেঙে পড়ল অজস্র লোকসংগীতে তা ধ্বনিত হয়ে উঠল, যার মধ্যে বিপ্লব ও লেনিন এক হয়ে গেল। পরলোকগত স্মরণীয় সাংবাদিক সত্যেন মজুমদার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অরণি'তে (১৯৪২, সোভিয়েট সংখ্যা) 'লোকসংগীতে লেনিন' নামে একটি প্রবন্ধে সোভিয়েট প্রাচ্যের কিছু দেশের লোকসংগীতের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল। তাজিকস্থানের তাজিকরা গান রচনা করেছেন—

শুধু ফুল আর হারেমের সুনয়না
চাইনাকো চাই না।

তার চেয়ে মুক্তির গান কেন গাই না,
সবচেয়ে সুমধুর লেনিনের গান।

উজবেকদের গান আছে—

লেনিনের গান ভাই লেনিনের গান
সে গান তো গান নয়, আমাদেরি প্রাণ।
আমরা স্বাধীন ভাই, আমরা নবীন
দুনিয়াতে এলো বুঝি মুক্তির দিন।
মুক্তির গান আর মৈত্রীর গান
সবচেয়ে সুমধুর লেনিনের গান।

কিংবা—

মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে লেনিন নেমে আসেনি
পাতালপুরীর আড়াল থেকে লেনিন ভেসে ওঠেনি
এই দেশেতেই জন্ম যার
শক্তি যার দুর্নিবার
শত্রু যাকে দেখলে জড়সড়, সেই তো লেনিন
সবার প্রিয় সবার চেয়ে বড়।

একটি আর্মেনিয়ান লোকসংগীতে আছে—

ধনিক যারা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের রত্নভূমি
নিঃস্বদেরই শূন্যপাত্র ভরে দিলে তুমি।
বসন যাদের ছিল নাকো ছিল পশুর মতো
বেশ দিয়েছ তাদের তুমি চাষীমজুর যত।
মান দিয়েছ তাদের তুমি, অজ্ঞানেরে জ্ঞান,
তোমার মন্ত্রে তাদের দীক্ষা জীবনেরে সম্মান।

এমনিভাবে লেনিন হলেন নতুন যুগের লৌকিক ব্যালাডের মহানায়ক। লেনিনের পথে অবিচলিত থেকে যিনি প্রথম সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন—আগ্রাসী দুর্ধর্ব ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাজিত করে পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষকে রক্ষা করেছিল যে লালফৌজ তার সর্বাধিনায়ক স্টালিন যে রাশিয়ার তথা পৃথিবীর শ্রমজীবী গণমনে ব্যালাড, গীতি-গাথা বা কাহিনীকাব্যের নায়কের মতো তাদের গানে চিত্রিত হবেন সেটাই স্বাভাবিক। অক্টোবর বিপ্লবের অনেকে মনে করতেন এই বৈপ্লবিক বাস্তবতার যুগে রূপকথা বা উপকথা ইত্যাদির আর বিকাশ ঘটতে

পারে না, তাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন নতুন বিষয়বস্তুতে উপকথা-রচয়িতা বিখ্যাত কবি ডেমিয়ান বেড্‌নি (Demyan Bedny)। তিনি সেদিন কবিতায় তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন :

Now, how can fables ever die ?
To folklore they are nearest kinsmen
And that's exactly what I thought
in nineteen twelve, for then I sought
the shortest road to reach the masses.
In fables then I taught them
how to hate the hostile classes.

ঘটনা যখন যুগান্তকারী, লোককবির হাতে ঘটনা ও রটনা মিলে তা হয় কাহিনী, বাস্তব সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশে হয় কিংবদন্তী। স্টালিনও তেমনি হন লোককাব্যের মহানায়ক।

বিয়েলোরাশিয়ার একটি লোকসংগীত :

সারা দুনিয়ার 'পরে
কোন্ সে সূর্য জ্বলে
দিনরাত অফুরান তেজে ?
সুখ দেয়, আলো দেয়,
ভালোবাসা জেলে দেয় ?
মোদের স্তালিন প্রিয় সে যে।···

উজ্‌বেকস্তানের আমুদরিয়া অঞ্চলের একটি ঘুমপাড়ানি গান :

শান্তি বিছায় ছায়ার ঝালর, রাত্তির নিঃঝুম,
খোকার চোখে স্বপ্ন নামে, মায়ের চোখে ঘুম।
স্তালিন দৃষ্টি মেলে আছে সবখানে সব ঠাঁই
তোমার আমার সবার 'পরে। দুষ্টু খোকা তাই
সারাদিনের খেলার শেষে সুখে নিদ্রা যায়।

(ভূপেন পালিত সম্পাদিত 'কালের রাখাল' কাব্যসংকলন থেকে)

ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার বোম্বের হরিজন শ্রমিক আন্নাভাও শাঠের গীতি-গাথা 'স্টালিনগ্রাদ পোয়াডা' একটি এপিক-ধর্মী

ব্যালাড। সেখানে তিনি স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধের বর্ণনায় স্টালিনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীর পার্থসারথির মতো বর্ণনা করেছেন। এটাই লোককবির ধর্ম, বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীরা যাই ভাবুন না কেন।

তেমনি চীনের লোকসংগীতের প্রাচীন ভাণ্ডারে দেখি নতুন সংযোজন। ছয় হাজার মাইল লংমার্চের রক্তাক্ত পদক্ষেপে শত শতাব্দীর দাসত্বমুক্ত সেন্সি প্রদেশের নিরক্ষর ভূমিদাসের কণ্ঠ থেকে সেই অঞ্চলের লৌকিক সুর ও ভাষায় প্রথম বের হয়ে এসেছিল :

"তুংফাং হোং, থাইয়াং স্বেং"
পূর্বদিক লাল, সূর্যের আভায়…
সেই সূর্যের নাম মাও সে তুং…

নবজাগ্রত চীনের কোটি কোটি মুক্ত মানুষের কাছে মাও সে তুং তাদের লোককাব্যে ও গীতিকায় এমনি এক প্রাচীন মহাকাব্যের নায়কের মতো। শুধু চীনের কেন, আমাদের গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোককবি ও গীতিকার মহারাষ্ট্রের আন্নাভাও শাঠের দীর্ঘ 'নানকিং পোয়াডা'য় পাই তার প্রতিধ্বনি। ১৯৪৭ সন। নানকিং-এর দ্বারে মুক্তিসেনা এসে পৌঁছেছে। সেই সংবাদে বোম্বের শ্রমিক কবি আন্নাভাও-এর কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল—

চীনী জনাংচী মুক্তি সেনা মুক্তিসংগর আজ লড়ে
নানকিং নগরাপুরে ; নানকিং নগরাপুরে ॥
জ্যানিং ধেত্‌লে অনেক জন্মা ক্রূটং ভুকেচ্যা অগ্নীত…
ক্ষণা সারথি যুগে মৌজিলী নির্বল বৈস্থনি বংখাত।…
দুভঙ্গলী তী নদী ইয়াংসী মার্গ মোকরা করাওইয়া।
পর্বত ঝুকবী মান আপুলী বরুণ ভবারী তী জায়া।…
যুগযুগাচে জুনাঠ ঘোড়ে আজ লাগলে হদ্‌রায়া।
হিমালয়ানে দৃষ্টি রাখিলী মাও চ্যা বিজয়া কড়ে ॥
নানকিং নগরাপুরে ॥

"চীনের মুক্তিসেনা নানকিং নগরদ্বারে হানা দিয়েছে। যারা জন্মেছে ক্ষুধায়, মরেছে ক্ষুধায়, যারা শীতের ঝড় দুর্ভিক্ষ প্লাবন যুগে যুগে ভাগ্যের লিখন বলেই চোখ বন্ধ করে মেনে নিয়েছে, যাদের কাছে প্রতি মুহূর্ত ছিল শতাব্দীর মতো, আজ তারা হানা দিয়েছে নানকিং নগরের দ্বারে ॥…

"মুক্তিবাহিনীর পথ করে দিতে ইয়াংসী নিজেকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করে

দিয়েছে—উত্তুঙ্গ পর্বত মাথা নত করে দিয়েছে; হিমালয় তাকিয়ে আছে মাও বাহিনীর বিজয় অভিযানের দিকে। নতুন এশিয়ার মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করেছে মুক্তিবাহিনী…"

রচনার গাম্ভীর্যে, ভাবসম্পদে, কাব্যগুণে ও পোয়াড়া সুরের উদাত্ত পুকারে পরলোকগত আন্নাভাও শাঠের এই গীতি-গাথাটি গণনাট্য সংগীতভাণ্ডারে অমর হয়ে আছে। মহারাষ্ট্রের লোকসংগীতের ধারাটিতে 'স্টালিনগ্রাদ পোয়াড়া' ও 'মানকিং পোয়াড়া' যে যুগান্তকারী সংযোজন, লোকসংগীতের কিছু পণ্ডিত গবেষক তা না মানলেও জনতা তা মেনে নিয়েছে।

কিছুদিন আগে ভিয়েৎনামের কিছু লোকসংগীতের ইংরাজি অনুবাদ দেখেছিলাম। সেখানেও হো চি মিন হয়েছেন লোককাব্যের মহানায়ক। ব্রুনো নেট্‌ল হয়তো এখানেও দেখবেন লোকসংগীতের অপব্যবহার।

কিন্তু আমাদের দেশেও তাঁর অনুগামী অনেক আছেন। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কিংবা কায়েমীস্বার্থকে খুশি করার জন্য যখন ১৫ আগস্টে কেউ "তেরঙা নিশানে পাল উড়াইয়া দে—কিষাণ ভাই রে" বলে 'প্রাচীন পল্লীগীতি' উপস্থিত করেন, তখন তাতে যাঁরা কোনো আপত্তি তোলেন না—তাঁরাই নাক কুঁচকাবেন যখন দার্জিলিং জেলার সংগ্রামী ওরাঁও কৃষকের মুখ থেকে স্বতস্ফূর্ত বেরিয়ে আসে :

সর্‌ সর্‌ সর্‌ সর্‌ হাউয়া আয়ী
লাল ঝাণ্ডা উড়ী ফরফরকী
লড়াই কি ময়দান…
আজ চলো কিষাণ চলো মজুর
নিকালিলা যব কিরে লড়াইকি ময়দান ॥

কিংবা বিহারের দেহাতী ভাষা ও সুরে যখন কলকাতার ট্রাম-মজুর গেয়ে ওঠেন :

লাল ঝাণ্ডা তুঝসে কহতা হ্যায় পুকার ভৈয়া মজদুরো…

গণ আন্দোলন ও লোকসংগীত

এটা কেবল আজকেরই কথা নয়। অতীতেও গণমানসে যখন কোনো আন্দোলন ঢেউ তুলেছে সে-আন্দোলন সামাজিক বা ধর্মীয় যাই হোক, তখন তা অসংখ্য লোকসংগীতে রূপ পেয়েছে। যেমন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে। সেসময়ে তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক গান রচিত হয়েছিল। কিংবা বাউল

আন্দোলনে যেমন গানের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেই গানের প্রবাহের পলিমাটিটুকুই সমষ্টি-স্বীকৃতির ছাঁকনিতে দেশের মাটির সঙ্গে মিশে যায়, অন্যসব অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত বস্তু ভেসে চলে যায়। সমাজপ্রগতির বিরোধী কোনো ধারা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তাছাড়া রচনাগুণে ও সুরে অসার্থক হলে সমষ্টি-স্বীকৃতিতে তা স্থায়ী হয় না। এক আন্দোলনে যে গান জনগণ সৃষ্ট করে, আর এক আন্দোলনে সেই গানই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে জটিল ভাবে জড়িয়ে আছে সমাজের শ্রেণী সংঘাতের প্রক্রিয়াটি। পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে বৌদ্ধসহজিয়াদের লোকায়ত জীবনদর্শনের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদর্শনের অধ্যাত্মবাদের সংঘাতের রূপ দেখাতে চেষ্টা করেছি। পরবর্তী সময়ে বিজয়ী হিন্দুদর্শনের প্রভাবে সহজিয়ারা কিভাবে বৈষ্ণব বাউলে পরিণত হলো তা-ও আলোচনা করেছি। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবও সেভাবে জনসাধারণের মধ্যে সংঘাতময় সৃষ্টিপ্রেরণা দিয়েছে। গান্ধী-আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে লেখা হয়েছে—

চরকা আমার সোয়ামী পুত
চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বান্ধা হাতি।

কিংবা :

জয়গান্ধী বল ভাই
আর কোনো দুঃখ নাই
দেশের দুঃখ হবে অবসান ;
হয়ে সবে একমন
কর নন্‌কোপারেশন
দেশের যত হিন্দুমুসলমান।

কিন্তু তারই পাশাপাশি দেখছি অনেক বেশি দরদ দিয়ে রচিত, অনেক বেশি স্থায়ী হয়ে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত সত্যিকারের লৌকিক গীতিকাব্যের নায়ক, ক্ষুদিরাম। গান্ধী যাঁর বিরুদ্ধতা করেছিলেন, গান্ধীপন্থার যে মূর্তপ্রতিবাদ, সেই বীর ভগৎ সিং পাঞ্জাবের অসংখ্য লোকসংগীতে অমর হয়ে আছেন আজও।

আবার দেখি চম্পারন সত্যাগ্রহে যে গান্ধী-দর্শন বিহারী কৃষকদের মধ্যে তাদের বহু গানে ব্যক্ত হয়েছিল সেই বিহারে লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ কৃষক

আন্দোলন যখন 'লাঙল যার মাটি তার' এই দাবিতে গান্ধীর শ্রেণী সমন্বয়কে প্রত্যাখ্যান করল, তখন তাদের প্রিয়তম গান হয়ে উঠল খাঁটি দেহাতী সুর ও রচনায় কিন্তু নতুন জীবনদর্শনে উদ্দীপ্ত :

কেক্‌রা, কেক্‌রা নাম বাতাউঁ, ইস্ জগ্‌মে বড়া লুটেরোয়াহো
সাম্যবাদ্ বিন্ কাম ন চলিহে শুনো কিষাণ মজদুরোয়া হো ।
মালিক ঔর মহাজন লুটে ঔর লুটে ঘুষ খোরোয়া হো ;
মিল্‌ওয়ালা লুটে জমিদার লুটে মর গয়া কিষাণ মজদুরোয়া হো ।
পাণ্ডা লুটে ঔর পুরোহিত লুটে, সাধু লুটে ঔর চোরোয়া হো । ...ইত্যাদি ।

অনেক লোকসংগীত-বিশেষজ্ঞ লোকজীবনের এই সংঘাতটা দেখতে চান না তাঁরা ছায়াসুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি কে দেখতেই অভ্যস্ত। সেখানে শাসন, শোষণ, অত্যাচার, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ এসব কে দেখতে তারা অভ্যস্ত নন—কিংবা এই সত্যকে চোখ বুজে অস্বীকার করতেই তাঁরা অভ্যস্ত এবং অন্যকেও-অভ্যস্ত করাতে সচেষ্ট। তাঁদের মত হলো : "...আমি যে জনতার কথা বলিয়াছি, তাহা বিক্ষুব্ধ কিংবা বিশৃঙ্খল জনতা নহে ; বিক্ষুব্ধ কিংবা বিশৃঙ্খল জনতা প্রত্যক্ষভাবে কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, বরং ভবিষ্যতে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার আশায় প্রত্যক্ষ বস্তুকে বিনাশ বা ধ্বংস করে। সুতরাং ইহার নিকট প্রত্যক্ষভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি করার প্রত্যাশাও করা যায় না। যে জনতার মধ্য হইতে লোকসাহিত্য সৃষ্টি এবং বিকাশ লাভ করে, তাহাকে শান্ত জনতা বলা যায়, ইংরেজিতে ইহাকে common interest crowd বলা হইয়াছে ; তবে জনতা মাত্রেরই একটি অভিন্ন লক্ষ্য থাকে, তথাপি এই লক্ষ্যের দুইটি দিক—একটি সৃজনশীল আর একটি ধ্বংসশীল। জনতার সৃজনশীল লক্ষ্য হইতেই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, ধ্বংসশীল লক্ষ্য হইতে নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত জনতা তদগতচিত্ত হইয়া লোকসাহিত্যের এই বিষয়বস্তু অনুসরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার শান্ত এবং স্থির প্রকৃতি অব্যাহত থাকে।..."

আশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই জনতা 'বিক্ষুব্ধ' হওয়া ও 'বিশৃঙ্খল' হওয়া একই ব্যাপার বলে ভাবেন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনতাই সৃষ্টিশীল। বিক্ষুব্ধ না হলে কোনো কবির দুঃখবোধ জাগতে পারে না এবং সমষ্টি-চেতনায় তার স্পন্দন তুলতে পারে না—নতুন সমাজ গড়ার প্রেরণা আসতে পারে না। সামন্ত সমাজের অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যে প্রতিবাদ পরোক্ষভাবে

রূপকে, প্রতীকে, কিংবা প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিত হয়েছে সেটাই অমাদের লোক-কাব্যের শ্রেষ্ঠ ধারা। গণনাট্য আন্দোলনের গান বিক্ষোভেরই গান। বিক্ষুব্ধ জনতার সামূহিক সৃষ্টি তা; কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল নয়।

জনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনে শাসক ও শোষক শ্রেণী, যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা ভাষা দাঙ্গা বাধে। সেই অনৈক্য সৃষ্টিশীল হতে পারে না। কিন্তু শুধু তা নয়, আজকের গণআন্দোলেনের প্রতি বিমুখ হয়ে জনতার কবির পক্ষে নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয়। অধ্যাত্মবাদীরা যেভাবে 'তগ্দতচিত্ত' কথাটা ব্যবহার করে থাকেন, নৃত্য গীত বা বাদ্যসমন্বিত সমষ্টি বা একক লোকসংগীত (যেখানে সমষ্টি নীরব অংশীদার) কখনো 'তদ্গতভাবে ভাবিত' নয়। আদিম ফসলকামনা, সৃষ্টিকামনা থেকে এককগীতে বঞ্চনা বা বেদনা বা আনন্দবোধ—এসব সমাজ-চেতনা-বিচ্ছিন্ন নয়। যখন তা 'তদ্গতভাবে ভাবিত' তখনি সে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং লোকসংগীত হিসাবে স্বধর্মভ্রষ্ট। সমাজচেতনা যেখানে শ্রেণীচেতনায় উন্নীত সেখানে লোকসংগীতের নতুন ধারা প্রবাহিত। সেই ধারাতেই গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম। 'অশান্ত' জনতাই সৃষ্টিশীল।

গণনাট্য আন্দোলনের ধারায় লোকসংগীত

গণনাট্য সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলন এক কথা নয়। ১৯৩৫-৩৬ সনে আন্তর্জাতিকভাবে ধনতান্ত্রিক সংকটে সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদের উৎকট স্বরূপে আবির্ভূত—স্পেনের ময়দানে প্রগতিশীল বিশ্ব-গণশক্তির সাথে তার প্রথম মোকাবিলা। স্বদেশে আন্তর্জাতিকতার আদর্শে সংঘবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আপসপন্থী ধারাকে বাতিল করে জাতির স্বদেশমুক্তির স্বপ্নকে শোষণমুক্তির চিন্তায় উন্নীত ও উদ্দীপিত করল। এই নতুন শ্রেণীচেতনায় ভারতের শোষিত জনসাধারণের লোককাব্য ও লোকসংগীত এক নতুন জীবনদর্শনে উজ্জীবিত হলো। ভারতবর্ষের সর্বত্র নতুন জীবনবোধের তরঙ্গ লোককাব্য, লোকনাট্য ও লোকগীতির যে ফসল সম্ভার নিয়ে এল—তাকে সংগঠিত করার জন্যই প্রগতি লেখকশিল্পী সংঘ ও পরবর্তী সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়। কিন্তু নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে গঠিত এই সংগঠন এই নতুন সংস্কৃতির আন্দোলনকে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেও শ্রমিক ও কৃষকের শিল্প ও সংগীতপ্রচেষ্টা মূলত নিজ নিজ ট্রেডইউনিয়ন ও কৃষকসভার পরিধি ও পরিচালনার মধ্যে থেকেই বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য

প্রগতিসংস্কৃতির এ-দুধারার মধ্যে যোগাযোগ আদানপ্রদান সব সময়ই হয়েছে। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গণনাট্য আন্দোলন নামে জনসাধারণের কাছে পরিচয় লাভ করেছে। গণনাট্য সংঘের চেয়েও তা অনেক ব্যাপক। শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা যখন প্রগতি লেখক সংঘ বা গণনাট্য সংঘের ইতিহাস লিখতে বসেন—তখন তাঁরা এদেশের শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংস্কৃতি আন্দোলনের গোড়াকার কথা ভুলে যান। যেজন্য তাঁদের লেখা পড়ে মনে হয় তাঁদের মস্তিষ্ক থেকেই এই সব আন্দোলনের উৎপত্তি। লোকসংগীতের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেও এই কথাটি মনে রাখতে হবে। সমষ্টি-চেতনা, সমষ্টি-স্বীকৃতি, সুরের আঞ্চলিকতা, ভাষা ও অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত কোনো রচনা লোকসংগীত হয়ে ওঠে না।

আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। আমাদের কৃষিপ্রধান অর্ধঔপনিবেশিক দেশে কলে-কারখানায় যাঁরা কাজ করেন সেই শ্রমিকদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক এখনো খুব ঘনিষ্ঠ। কাজেই শ্রমিকদের সৃষ্টিশীল আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো তার ঐতিহ্যবাহী লৌকিক আঙ্গিক। মারাঠার শ্রমিক কবির ও গীতিকারের ও নাট্যকারের আন্তর্জাতিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে 'লাউনি', 'পোয়াড়া' কিংবা 'তামাশা' প্রভৃতি লৌকিক মাধ্যমে, ঠিক তেমনি বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীতে আন্তর্জাতিক চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে ভোজপুরী, মগ্‌ধী বা মৈথিলীর আঞ্চলিক আঙ্গিকে, কাজ্‌রী, চৈতী, রসিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। কাজেই লোকসংগীত কেবল গ্রাম্য কৃষকের সৃষ্টি নয়—খনিতে, চা-বাগিচায়, কিংবা কলে-কারখানায় কাজকরা শ্রমিকেরও সৃষ্টি।

কৃষক কবিয়াল রমেশ শীল ও শ্রমিক কবিয়াল গুরুদাস পাল

গোজলা গুঁই, রঘু কর্মকার বা কেষ্টামুচি থেকে আরম্ভ করে ভোলা ময়রা বা অ্যাণ্টোনি ফিরিঙ্গির ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ নিষ্করুণভাবে কষাঘাত করেছেন। 'নষ্ট পরমায়ু কবির দল' বলে এঁদের বিদ্রূপ করেছেন। বাংলাসাহিত্যের কোনো কোনো ইতিহাসকার কবিগানকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। কলকাতার মুৎসুদ্দি ও নব্য বাবুসম্প্রদায় একসময় ছিল কবিদের মূল আশ্রয়দাতা। বিকৃতরুচি মুৎসুদ্দি ও নব্য বাবুসম্প্রদায়ের তরল পরিবেশের উত্তেজনা যোগাবার জন্যই কবিয়ালদের ফরমায়েশী খাটতে হতো। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই: "ইংরাজের

নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস-আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজধানীর নূতন ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে কবিওয়ালাদের এক করে ফেলেছেন। তিনি দেখলেন না সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত অতিদরিদ্র স্তর থেকেই এই সব সহজ-কবিরা বের হয়ে এসেছিলেন। তাঁদের রচনায় যে 'অলীলতা' 'অনুপ্রাসের ছটা' 'ইতরভাষা' ও 'শিথিলছন্দ' রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তা লোককবিদের অপরিমার্জিত স্বভাবজাত নয়, তা ছিল নব্য ধনিক বণিক বাবুদের বিকৃতিরুচির খোরাক, যার যোগান দিয়ে কবিওয়ালাদের জীবিকা নির্বাহ হতো। পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লোক-সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণে প্রায় ২০।২১ বৎসর আগে গণনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী লোককবি পরলোকগত রমেশ শীল বলেছিলেন: "গ্রামের চাষী গরীব হইল, ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল জমিদার মহাজনের দল. চাষীরা আর গ্রাম্য কবি ও লোকশিল্পীদের অন্নসংস্থান করিতে পারে না। গ্রাম্য কবিগণ পেটের দায়ে এবং মোটা অর্থের প্রলোভনে জমিদার মহাজনদের উৎসব মণ্ডপে আসিয়া ভিড় জমাইল। বাউণ্ডুলে ইয়ারদোস্ত পরিবৃত ধনী জমিদার বাবুদের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া গ্রাম্যকবিগণ অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচিল, গান গাহিল। নারীজাতির কুৎসা রটনা করিয়া তথাকথিত পুরুষপুঙ্গবকে পরিতৃপ্ত করিল। আমার ব্যক্তিগত কবি-জীবনে অসংখ্যবার এইভাবে নাচিয়াছি। অশ্লীল গান গাহিয়াছি।..."

রমেশ শীলের দৃষ্টিই লোককবিদের মূল্যায়নের ঐতিহাসিক দৃষ্টি। রমেশ শীলের জীবন গণনাট্য আন্দোলন লোককবিদের রূপান্তরের শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য। প্রথম যুদ্ধোত্তর কাল থেকে গণজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কবিগানে, সুস্থ দেশাত্ম-বোধের চেতনা দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে হরি আচার্যের মতো কবিয়ালরা কিংবা মনোমোহিনী, শেখ সরলার মতো গায়িকারা, সুবল (মুসলমান জেলে), গোবিন্দ শাহ প্রমুখ গায়করা তাঁদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ইত্যাদি গানের পাশাপাশি স্বদেশাত্মক গান গেয়ে আমাদের শৈশবে স্বদেশচেতনায় উদ্দীপিত করেছেন।

এঁদের শ্রোতা রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত 'সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি' ছিল না। গ্রামের ধনিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা পেলেও তাঁদের প্রধান শ্রোতা ছিল গ্রামের গরিব জনসাধারণ। জনসাধারণের আন্দোলনের আবেগ তাই তাঁদের গানে স্পন্দিত হতো। বাগ্‌যুদ্ধ থাকলেও জনসাধারণের চিন্তা ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে তা উদ্দীপিত করত। রবীন্দ্রনাথ যেখানে দেখেছিলেন ঢোল কাঁসির কোলাহল, আমরা সেখানে দেখছি কবির আসরে বাংলা ঢোলের ক্লাসিক্যাল উৎকর্ষ। রচনায় সব সময় নৈপুণ্য না থাকলেও তাতে 'জলীয়তা' বা কেবল অনুপ্রাসের ছটা' ছিল না। কাব্য এবং ভাবের গাম্ভীর্যও তাতে পেয়েছি। পূর্ববঙ্গে সর্বোপরি আমরা পেয়েছি কবিগানের সুরের সমৃদ্ধি যা পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতকে ঐশ্বর্যশালী করেছে। কিন্তু গ্রাম্য অর্থনীতির সংকটের আবর্তে কবিগানের এই ধারাটিও শীর্ণ হয়ে এল। গণনাট্য আন্দোলন 'নষ্ট পরমায়ু কবিদলের গানে' আনল এক নতুন জীবন। চট্টগ্রামের পরলোকগত কবিয়াল রমেশ শীল ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। এই কবিয়ালরা স্বাদেশিকতার সঙ্গে এনে মেলালেন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা।

এখানে আমি শুধু দুজনের বিষয়ে সামান্য আলোচনা করব। এই দুই কবিয়ালের সম্বন্ধে আগেও কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আলোচনার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে। বিশেষ অনুষ্ঠানের আবেগ ও উত্তেজনার মুহূর্তে কবিয়ালরা জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন, পরে স্বাভাবিক অবস্থায় তা সব সময় মনে করতে পারেন না। আগের দিন কবির আসরের কোনো কবিয়ালের কোনো উত্তেজিত মুহূর্তের মৌখিক রচনার দু-তিন লাইন মনে নিয়ে পরের দিন তাঁর কাছ থেকে বাকিটা লিখে নিতে গিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশেষ করে গুরুদাস পালের কোনো অনুষ্ঠানের কাব্য-ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হয়ে ও পরে তাঁর কাছ থেকে লিখে নিতে গিয়ে অনেক জিনিসই পাইনি। লৌকিক কাব্যের আদিকথা সম্বন্ধে জর্জ টমসন যেকথা বলেছিলেন "They are improvised...on the inspiration of the moment."—এই প্রায়-নিরক্ষর গ্রাম্য কবিয়ালদের সম্বন্ধেও তা অংশত প্রযোজ্য। তাই শান্তভাবে যেসব কবিতা বা গান তাঁরা লিখে গেছেন, বা তাঁদের গান বলে যা সংগৃহীত হয়েছে, সেটা তাঁদের কাব্যশক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় বলে মেনে নিলে ভুল হবে।

মাইজভাণ্ডারের স্ফীবাদী কবি যিনি একদিন 'লাহুতে'র ঘাটে যাবার জন্ত গান রচনা করতেন :

ত্রিবেণীর ঘাটেতে মাঝি জোয়ার ধরি যাইও
ভাণ্ডারীর বর্জকে তরী ধীরে ধীরে বাইও ॥

সেই কবি রমেশ শীল কৃষক-আন্দোলনের নতুন শ্রেণীচেতনায় রচনা করলেন :

আমার খুনে মোটর গাড়ি
তেতালা চৌতালা বাড়ি—
আমার খুনে রেডিও আর বিজ্‌লি বাতি জলে।
আমি কৃষক, তুমি মজুর দিনে রাতে খাটি
তুই শক্তি এক হইলে তারা পিছু যাবে হটি।
এক সঙ্গে নিঃশ্বাস ছাড়ি
পর্বত উড়াতে পারি
দুশমন চক্রে চাও না ফিরি কী আছে তার মূলে?

সংগ্রামী কৃষকের কবি কৃষককে শোনালেন নতুন যুগের বাণী :

বাংলার কৃষক ভাইগণ হওরে চেতন।…
শোষণকারী জমিদার, জমিদার নয় যম-দুয়ার
লাঙল যার জমি তার, কৃষকের এই পণ ॥

স্ফীদর্শনে প্রথমজীবনে অনুপ্রাণিত কবি রমেশ শীল মাইজভাণ্ডারের কল্পলোকের স্বরে দুনিয়া ফুলবাগের আশিক হয়ে স্ববাসের সন্ধানী হয়ে গেয়েছিলেন :

দেখে যারে মাইজভাণ্ডারের আজব রঙের ফুল
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকুল ॥
ফুলের রং দেখেছে যারা, হয়ে গেছে মাতোয়ারা
দুনিয়ার স্থখ চায় না তারা চায় না জাতিকুল ॥
সে ফুলের স্ববাতাসে, দিল খোলে আর আঁধার নাশে
নিত্ত রসে চিত্ত ভাসে প্রেমবাগে বুলবুল ॥

সেই কবি সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার আলোতে দেখলেন এক লাল দুনিয়া—যার জন্ম তিনি মুর্শিদের মোকাম ছেড়ে নেমে এলেন লড়াইএর ময়দানে। তাই এই লোককবি বৃদ্ধবয়সে নিগৃহীত, কারারুদ্ধ হলেও, তাঁর গানের ধারাকে কেউ রুদ্ধ করতে পারেনি। শেষবয়সেও তাঁর গানে সেই কামনাই অনির্বাণ :

অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হবে
আমার পরে আসবে যারা বোধ করি তারাই নেবে।
সারাজীবন ধরে আমি তারই চেষ্টা করে যাব।
মনের কোণে সুর উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাজাব।
লাল মেঘেতে করবে খেলা আকাশভরা জোছনা রাতে
দোল খেয়ে জলবে বাতি প্রতিঘরে লাল শিখাতে।
তার আলোতে স্বপ্ন সফল করবে মুক্তি পূজারীরা
সেদিন হবে জানাজানি দোস্ত কারা, দুশমন কারা।...
হিংস্র জন্তুর ডাক থামিবে, পথের বাধা হবে শেষ।
বুক ফুলিয়ে বলে উঠব, এই ত আমার দেশ॥

মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক-কবি গুরুদাস পালের রূপান্তর আমাদের গণসংস্কৃতি আন্দোলনের আর একটি বিশেষ ঘটনা। পিতা মনোহর পাল ছিলেন মৃৎশিল্পী। কুমোরের কুটীরশিল্পে দিন গুজরান অসম্ভব হয়ে উঠলে মেটিয়াবুরুজের চটকলে মজুর হন। পিতা জীবিত থাকতে মধ্য ইংরাজি স্কুলে তাঁর সামান্য শিক্ষালাভ ঘটে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তাঁর চিন্তায় প্রথম দোলা দেয়। সেই সময়ই তিনি গান লিখতে শুরু করেন। তিনি রামপ্রসাদী ও মুকুন্দদাসী সুরেই লিখতেন ও শ্রমিকদের গেয়ে শোনাতেন। সে সময়ও তিনি প্রাচীন অধ্যাত্মবাদী ধারা থেকে মুক্ত হননি। শ্রেণীচেতনা ও অধ্যাত্মভাবনার মিশ্রণ ঘটত তাঁর গানে। মুকুন্দদাসী সুরে তিনি গাইতেন :

মুক্তি যদি হয় প্রয়োজন
শক্তিপূজার কর আয়োজন
প্রাণের শক্তি আদ্যাশক্তি
তারেই সবাই সজাগ কর।
মহাশক্তি জাগুক প্রাণে
জলুক অনল ত্রিভুবনে
জাগুক মজুর জাগুক চাষী
কাঁপুক বিশ্বচরাচর॥

১৯৩৯-৪০-এ শ্রমিক আন্দোলনে একজন অগ্রণী কর্মী হিসাবে তিনি নেমে পড়েন। সে-সময়ে তাঁর শ্রেণীচেতনা সর্বহারার বিশ্বচেতনায় উদ্দীপিত হয়। সে সময়কার গানে তার পরিচয় পাই—

জাগো নিপীড়িত, জাগো সর্বহারা
সময় থাকিতে সবে হও ভাই হুঁসিয়ার···
রক্ত পতাকা লয়ে যতেক মজুর দল
বিশ্ব ভুবনব্যাপী জ্বেলেছে প্রলয়ানল
ধনিক বণিকদল যাক চলে রসাতল
আজি এই ধরাতল হয়ে যাবে একাকার ॥

১৯৪৫ সনে কলকাতায় প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘের আয়োজিত সংস্কৃতি সম্মেলনে কবিয়াল রমেশ শীল ও শেখ গুমানির কবির পালা শোনার পর গুরুদাস পাল পশ্চিমবঙ্গের তরজার লৌকিক পদ্ধতিকেই তাঁর ভাবপ্রকাশের যোগ্য মাধ্যম বলে বেছে নিলেন। সেজন্য রমেশ শীল তাঁর গুরু বলে তিনি সব সময় বলতেন। শ্রমিকশ্রেণীর তরজার আসরে বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করতে যখন গাইলেন :

হায়রে হায় মান বাঁচানোর কি করি উপায়।
ঘুরে ফিরে পড়েছি এক জোচ্চোরের পাল্লায় ॥
পুষলে পরে কাকের ছানা
কা' ছাড়া কেষ্ট বলে না
যতই বুলি শিখাও না ভাই তায়
ছুঁচোর গায়ের গন্ধ কি আর গোলাপ জলে যায় ॥

এবং তার চেয়েও কড়া ভাষায় যখন মালিকের পক্ষ-নেয়াদের তিনি কষাঘাত করেন :

যেমন জলের স্বভাব নিম্নগতি
আগুনের স্বভাব পোড়া
বিড়ালের স্বভাব হাঁড়ি খাওয়া
পাখির স্বভাব ওড়া,
বেশ্যার স্বভাব যেমন ধারা
চার আনাতে স্বামী
এদের স্বভাব তেমনিধারা ধনিকের গোলামী ॥

তখনই বুঝতে পারি তরজার আঙ্গিককে তিনি কেমন রপ্ত করেছেন। তুলনামূলক আলোচনা না করে বলতে পারি, তরজার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপে, শ্লেষে, উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় শোষক, শাসক ও তাদের অনুচরদের ঘায়েল করতে গুরুদাস পাল

ছিলেন অদ্বিতীয় গণশিল্পী। এ ব্যাপারে তাঁর গুরু রমেশ শীলকে তিনি পিছনে ফেলেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর চেতনা ও মালিকের সাথে জঙ্গী সংঘাতেই তাঁর রচনা ও রসনাকে এমন ধারালো করেছিল। নাগরিক মধ্যবিত্ত কবিগীতিকারদের রচনাপারিপাট্য ও সুরের কারিগরী যতই থাক, জনসমাবেশে দাঁড়ালে গুরুদাস পালকে মনে হতো সত্যিকারের গণমনের কারিগর। শাসকের স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজে তাঁর জুড়ি কেউ ছিল না—

আমি কর্তা-ভজার দলে
বাইরেতে বোষ্টুমী আমি, ভেতরে দুর্নীতি চলে ॥…
বাস্তুহারার ক্যাম্পে গিয়ে ভাসি চোখের জলে
যদি কচে-বারো করতে পারি ইলেকশনটায় তলে তলে।
আমি হিংসার ওপর বড্ড চটা মাঝে মাঝে ক'রে ঘটা
বাক্যচ্ছটায় পটিয়ে লোককে ভেড়াই নিজের দলে;
গরিব-গুব্‌রোর ওপর ঐ যে লাঠিগুলি চলে,
সেটা তোমার বুঝলে কিনা, সেরেফ তাদের কর্মফলে ॥
আমি দিব্যি করে বলতে পারি, ঐ যে পুলিশ-মিলিটারী
ওরা শান্তিরক্ষের ধ্বজধারী, ন্যায্য পথে চলে।
মাঝে মাঝে দুষ্টুলোকের কেলেংকারীর ফলে
যত হাড়হাবাতের হুড় থামাতে, খামখা গোচ্ছার গুলি চলে ॥
লোকের মশাই এঁড়ে বায়না, তারা নাকি খেতে পায় না,
না খেলে কি বাঁচা যায় না? বলুক তো সকলে;
চোদ্দ বচ্ছর শুকিয়ে লক্ষ্মণের কি করে চলে?
এ তো আমার কথা নয়রে বাপু, রামায়ণের নেকায় বলে ॥…
আমি নাম ভাঙানোর গুরুমশাই, চতুর্বর্গ জ্ঞানের গোঁসাই,
বুদ্ধশিষ্যের অস্থি ভাসাই বারাণসীর জলে,
ইতরজনের সাইকোলজি বুঝতে পারার ফলে
আমার হোক্ না গাড়ির চাকা ভাঙা, হট্টরে হট্টরে তবু চলে ॥
যখন ফুটপাতে লোক টেঁসে থাকে খিদের ধকলে
পথের ধুলো উড়িয়ে আমার স্টুডিবেকার গাড়ি চলে
আমি একজন স্বদেশভক্ত, আমার দুটি হাতে নারী রক্ত
একটু শক্ত না হলে কি তখ্‌ত রাখা চলে ॥

রবীন্দ্রনাথ 'কলকাতায়' সেই আসরে উপস্থিত থাকলে দেখতেন তাঁর বর্ণিত 'নষ্টপরমায়ু কবির দল' গণসংস্কৃতির সংস্পর্শে 'চিরায়ু' হয়ে উঠেছে এবং তাদের 'অনুপ্রাসের ছটা'য় জল ঝরে না, ঝরে আগুন।

গুরুদাস পাল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পরে অসুস্থতার জন্য মুক্তি পান। প্রেসিডেন্সি জেলগেট হামলায় জড়িত বলে আবার ধৃত হন। আলিপুর জেলে অনশন ধর্মঘট করেন। জামিনে তিনি ছাড়া পেয়ে আত্মগোপন করেন। তাঁর নামে পরোয়ানা বের হলে নাম বদলিয়ে হন সনাতন মণ্ডল। কিন্তু সে সময় তিনি জনতা থেকে আত্মগোপন করেননি—প্রায়ই তাদের আসরে হাজির হতেন। তাঁর মতো কর্মীদের সেই সময়কার অবস্থার সঙ্গে বিরাট-রাজভবনে পাণ্ডবদের আত্মগোপন করে থাকার সময় কৌরব গুপ্তচরদের গোপন হানার তুলনা করে গাইতেন :

এমনি মোদের পরে নামিল দমন
পিছু পিছু গোয়েন্দারা করে বিচরণ—
(মোরা) বিরাট জনতা কোলে করিনু ভ্রমণ।

শুধু উদঘাটনে নয়, এজিটেশনেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। সে সময় (১৯৪৮-৪৯) তাঁর অগ্নিক্ষরা 'কোলকাতার খবর' কবিগানটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল :

শুনেছ কি কোলকাতার খবর
বুদ্ধদেবের শিষ্য যারা
অহিংসাতে মাতোয়ারা
ধরলো পেশা মানুষমারা
বন্ধ করে ঘরের দোর ;…
নির্বিচারে নরনারী ছাত্রছাত্রী হত্যা,
এ যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
তাহলে আজ সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।

গুরুদাস পালের পথ ধরে জগদ্দলের শ্রমিকদের মধ্যে কবি দুলালচন্দ্র রায় তরজা গেয়ে শ্রমিকদের উদ্বোধিত করেছিলেন। সে সময় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে লোকসংগীতের ধারাটিতে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন ছোট বড় অনেক পল্লীকবি। যেমন মালদহে গম্ভীরায় বিশু পণ্ডিত ও আবদুল মজিদ, ময়মনসিংহে

নিবারণ পণ্ডিত প্রমুখ। তরজা, গম্ভীরা প্রভৃতির প্রাণ হলো বিষয়বস্তুর সমসাময়িকতা। স্বভাবতই সে সময় সেগুলির বিকাশলাভ ঘটেছিল বেশি। কিন্তু অন্যান্য ধারাও সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবে ও বিষয়বস্তুতে উজ্জীবিত হয়েছে। ময়মনসিংহের লোককবি নিবারণ পণ্ডিত এবিষয়ে একটি স্মরণীয় নাম। তিনি ময়মনসিংহের পুথিপড়া, ঘোষাপটের গান প্রভৃতি লৌকিক ধারাকে সজীব করে তোলেন। তাঁর আর একটি অবদান—জারীগানে নতুন বিষয়বস্তু। তাঁর জারীগানের দলটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। তাঁরা যখন নেচে নেচে গাইতেন জারীগান :

কপালের দুঃখ ঘুচবে কত দিনে রে
হায় দুঃখ সয় না প্রাণে রে॥
মুখ চিনিয়া বিলি হইল কনট্রোলের কুইনাইন
ট্যাক্স নাই যার কার্ড পাইতা না শাহীদারের আইন ;
রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উসার
(হায়রে বালিশের উসার)
কেউ পায় ছিঁড়া তেনা, কেউ করে বাহার—রে॥

তখন যেন কারবালার অন্যায়ের বর্ণনার সঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার চাষীর অবস্থার বর্ণনা মিশে যেত। গত যুদ্ধে যখন কণ্ট্রোল বা কালোবাজার শব্দটা গাঁয়ে প্রথম এল এবং যখন চাষীর অতি প্রয়োজনীয় জিনিস—এমনকি লবণও পাওয়া যাচ্ছিল না, তখনকার নিখুঁত বর্ণনা নিবারণবাবুর বহু গানে আছে। তীক্ষ্ণ শ্লেষে তিনি ঘোষার সুরে লেখেন :

আমার মাঞ্জুর মায়ে ত কনট্রোল বুঝে না।
রান্‌তে গেলে কান্‌তে বসে লবণ ছাড়া রান্‌ধে না॥
(আহা রে) কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম
কত বাবুর পায়ে ধরলাম
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে—
ও আহা রে—আমার ভাঙা ঘরে নেড়ার ছানি
মেঘ না হইতে পড়ে পানি
টেপ্‌টেপানি গেল না রে
আমার টেপ্‌টেপানি গেল না॥···

ময়মনসিংহের টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং বিদ্রোহের উপর নিবারণ পণ্ডিত

একটি দীর্ঘ গাথা রচনা করেছিলেন। হাজং আন্দোলনের এই গানটি সে সময় ময়মনসিংহের চাষীদের সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপিত করেছিল।

কৃষক কবি নিবারণ পণ্ডিত কারারুদ্ধ হয়ে দিনের পর দিন নির্মম অত্যাচারে মরাণপন্ন হয়েছিলেন। জামিনে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় আত্মগোপন করে ভারতে চলে আসেন।—এপারে এসে যে স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন তাতে তাঁর সমস্ত আশা চূর্ণ হয়ে গেল—গান লিখলেন :

ছিল বুকভরা আশা
'স্বাধীনতা'র দমকা হাওয়ায় ভাঙলো সুখের বাসা রে
ভাঙলো সুখের বাসা।···

কইলে বহু কথা, মনের ব্যথা কইবার জায়গা নাই
হইল বাস্তহারার ধনে রাজা বাস্তুঘুঘুর ভাই।
কথা সত্য কিনা আজও পাই না মাথা গুঁজবার ঠাঁই
আবার সরকারী সাহায্য পাইল পাইকারের জামাই ॥···

কিন্তু এত অভাব দারিদ্র্যেও নিবারণ পণ্ডিত বাংলার দুঃখবাদী লোক-কবিদের পথ অনুসরণ করেননি। কারণ তাঁর শ্রেণীচেতনা ও সংগ্রামী চেতনা ছিল অম্লান। তাই সে সময়ও তিনি গাইলেন :

জোরজুলুমে ভাণ্ডার ভরা ছিল যাদের নীতিধারা
সে নীতি আজ মোড় ঘুরেছে শোষিত দিয়েছে সাড়া ;
জীবনমরণ প্রশ্ন এবার হিসাবনিকাশ জগৎজোড়া ॥

কোচবিহারে ভুখমিছিলে পুলিসের গুলিতে শিশু বকুল-বন্দনা সহ সাতজনের মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ লোককবির কণ্ঠে জন্ম নিল 'খাদ্যের বদলে গুলি' নামক গীতিগাথাটি। সে সময় তা উত্তরবঙ্গের গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজে চারণ কবি হয়ে হাটে গঞ্জে গেয়ে গেয়ে ঘুরছিলেন :

৭ই শনিবারে—
৭ই শনিবারে, দ্বিপ্রহরে ভুখা ভারতে রে
খাদ্যের বদল গুলি দিল সাগরদীঘির পারে ॥
শিশু সাত বৎসরের—
শিশু সাত বৎসরের বকুলের হইল মরণ—
ভ্রাতার সাথী হইল ভগ্নী বন্দনা তখন ॥
ইহা পঞ্চাশ সন নয়—

ইহা পঞ্চাশ সন নয়, তার পরিচয় দিয়াছেন জনতা
ভুলেন নাই পঞ্চশহীদ ভাই ভগিনীর কথা।
সভা মিছিল করে—
সভা মিছিল করে, স্পষ্ট করে করেছেন ঘোষণা
ভুখা কণ্ঠে বুলেট দিয়া দমানো যাবে না ॥···ইত্যাদি

এই লোককবিদের পাশাপাশি, গণআন্দোলনের তাগিদে অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গীতিকার লোকগীতির সুরে ও ঢঙে বহু গান তখন রচনা করেন যা আন্দোলনের ঢেউয়ে লোকসংগীতের ধারার সাথে মিশে গিয়েছিল। যেখানে সারিগানে শুনা যেত :

সাবধানে গুরুজীর নাম লইও রে সাধুভাই
সাবধানে গুরুজীর নাম লইও।

সেখানে শোনা গেল :

কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষান ভাই রে
কাস্তেটারে দিও জোরে শান ॥
ফসল কাটার সময় এলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান রে।···

কিংবা ভাটিয়ালীতে শোনা গেল :

ফিরাইয়া দে, দে, দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে—
মালাবারের কৃষকসন্তান
তারা কৃষকসভার ছিল প্রাণ
অমর হইয়া রহিবে দেশের দশের অন্তরে ॥
কৃষকসভার রাখতে ইজ্জতমান
তারা ফাঁসীকাষ্ঠে দিল প্রাণ
ফিরিয়া পাবনা রে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে ॥···

আঞ্চলিক বিভিন্ন ঢঙে ও সুরে সেসময় সারা বাংলায় বহু গান কৃষকদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব রচয়িতা অধিকাংশই শহরবাসী হলেও কৃষক-জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি তাঁদের ছিল এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সংগ্রামী কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের অন্তরের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। তাঁদের কোনো অর্থকরী বা আত্মপ্রচারের তাগিদ তাতে ছিল না। গণমনের রূপান্তরের আবেগই ছিল তাঁদের গান, নৃত্য বা কবিতা সৃষ্টির তাগিদ। আজকের অধিকাংশ শহুরে

লোকসংগীত রচয়িতাদের সঙ্গে তাঁদের এখানেই মৌলিক পার্থক্য। সে সময়কার বহু রচনা থেকে মাত্র দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় রচনার অংশমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ দিলাম। তা না হলে সে সময়কার খ্যাত অখ্যাত, এবং অজ্ঞাত রচয়িতাদের রচনার সামান্য পরিচয় দিতে গেলেও একটি প্রবন্ধের পরিধিতে তা সম্ভব নয়। প্রবন্ধ শেষ করার আগে একটি বিষয়ে সামান্য আলোচনার দরকার আছে।

গণসংগীত ও লোকসংগীত

অনেকেই 'গণসংগীত' ও 'লোকসংগীত' এই দুটি কথা গুলিয়ে ফেলেন। গণ-সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ লোকসংগীতের ধারাটি গণসংগীতেরই অন্তর্গত, কিন্তু গণসংগীত মাত্রই লোকসংগীত নয়। গণসংগীত কথাটা অনেক বেশি ব্যাপক। স্বদেশী সংগীত বা দেশাত্মবোধক গীত বলতে আমরা যা বুঝি, তার সাথে ভাবে ও ভঙ্গিতে একটা পার্থক্য বুঝাবার জন্যই গণগীতি বা গণসংগীত শব্দটার উৎপত্তি। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশ-চেতনা এবং পরাধীনতার বেদনাবোধে যে গীতের জন্ম তাকে আমরা স্বদেশী সংগীত কিংবা দেশাত্মবোধক সংগীত বলে থাকি। সেই স্বদেশী সংগীতের একটা বড় অংশ ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল, অনেক সময় আবার জাতীয় চেতনা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রভাবিত ছিল। সেসব গানে দেশাত্মবোধের আবেগ ও বেদনা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের চেতনা ছিল না। দেশের মুক্তির সঙ্গে শোষণমুক্তির চিন্তার মিলন ঘটেনি। শ্রমজীবী জনতাই দেশ, তাদের মুক্তি ছাড়া দেশের মুক্তি অর্থহীন, একথা সেদিনের গানে ব্যক্ত হয়নি। স্বদেশচেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিশলো সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম।

ভাবে বা বক্তব্যে এক হলেও, ভঙ্গিতে বা আঙ্গিকে গণসংগীতেও বিভিন্ন ধারা আছে। শ্রমজীবী জনতার ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যমটি লোকসংস্কৃতি, স্বভাবতই লোকসংগীতের প্রবহমান ধারা নতুন গণচেতনায় নতুন জীবনবোধে উজ্জীবিত হলো। এই বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করেছি। গণসংগীত অন্যান্য আঙ্গিককে অবলম্বন করেও নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রমুখ গীতিকারদের দেশাত্মবোধক ভঙ্গি অনুসরণ করে বহু সার্থক গণসংগীত রচিত হয়েছে। তাছাড়া পাশ্চাত্য বৃন্দগীতের বা স্বর-সঙ্গতির আঙ্গিকেও গণনাট্য আন্দোলন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গণসংগীতকে সমৃদ্ধ

করেছে। শ্রমিকদের হরতাল বা কৃষকের তেভাগা আন্দোলনের বিষয়বস্তু নিয়ে—

ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে, প্রাণ জাগছে—
লাখে লাখে করতালে হরতাল হেঁকেছে—
হরতাল—হরতাল—হরতাল—
আজ হরতাল, আজ চাক্কাবনধ্
গুরু গুরু গুরু গুরু ডম্বরু পিনাকীর বেজেছে বেজেছে বেজেছে
মরাবন্দরে আজ জোয়ার জাগানো ঢেউ
তরণী ভাসানো ঢেউ উঠছে…॥

গানের মতো অনেক সার্থক বিপ্লবী গণগীত রচিত হয়েছে। এগুলির সুরের বিন্যাস আধুনিক সৃষ্টিশীল (modern creative), পরীক্ষামূলক। এসব গণসংগীত কোনো অবস্থাতেই লোকসংগীতের শ্রেণীতে পড়ে না (একজন বিশিষ্ট সংগীত সমালোচক এই গণসংগীতকে লোকসংগীত বলে মারাত্মক ভুল করেছেন)।

লোকসংগীত সুরে ভঙ্গিতে ও বাক্যবিন্যাসে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ। শ্রমজীবী জনতার মধ্যে কোনো গান জনপ্রিয় হলেই তা লোকসংগীত হয়ে ওঠে না।

উপসংহার

উভয় বঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনে তথা নবসংস্কৃতির আন্দোলনে লোকসংগীতের রূপান্তরের ধারার অতি সামান্য পরিচয়মাত্র এখানে দিলাম। বঙ্গদেশের তুলনায় মহারাষ্ট্র, তামিলনাদ, অন্ধ্র, কেরালা বা পাঞ্জাবে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে এই রূপান্তরের ধারাটি ছিল আরো অনেক বেগবান ও সৃষ্টিশীল। তার বড় কারণ, বঙ্গদেশের নাগরিক সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যেকার বিরাট বিচ্ছেদ ও ব্যবধান। এখানে গণনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন কলকাতাবাসী মধ্যবিত্ত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা, যাঁদের আসরে লোকসংস্কৃতি ও লোককবিরা কোনোদিনই বিশেষ মর্যাদা পাননি।

যাহোক, লোকসংগীতের রূপান্তরের রূপরেখাটিই মাত্র তুলে ধরতে চেয়েছি এই আলোচনায়। ইদানীং কিছু শিল্পী ও পণ্ডিতব্যক্তি লোকসংগীতকে 'যুগোপযোগী' করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। যুগ জনসাধারণেই পাল্টায়, গবেষকরা নয়। গ্রামে বিজলী তার গেলেই কৃষক যুগোপযোগী হয় না—হাতে

সংগ্রামের হাতিয়ার দিলেই কৃষক যুগোপযোগী হয়। লোকসংস্কৃতির যুগোপযোগী পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাও তার অনুগামী।

উপরে লোকসংগীতের মূল্যায়নে গ্রহণ বর্জনের যে জটিল প্রক্রিয়ার কথা বলেছি—গণনাট্য-আন্দোলনজাত লোকসংগীতের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। রমেশ শীল, গুরুদাস পাল বা নিবারণ পণ্ডিতেরা এমন অনেক গান লিখেছেন যা সংগ্রামী জনসাধারণ এগিয়ে যাবার পথে বর্জন করে যাবে।

কৃষিবিপ্লবের প্রথম পদধ্বনিতেই সামন্তীয় ধ্যানধারণায় আবদ্ধ এইসব লোক-কবিরা নতুন যুগের বাণী নিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন মাঠে-ময়দানে। কিন্তু কৃষকসভা বা মজুর সংগঠন অর্থনীতিবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কারবাদে আক্রান্ত হয়ে আন্দোলনের বৈপ্লবিক প্রবাহকে চোরাবালিতে বন্দী করল। তার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখি এই শ্রদ্ধেয় লোককবিদের বহু গানে। শেষজীবনে কেবল ভোট বৈতরণী পারাপারের খেয়ামাঝির গান লিখতেই তাঁদের উৎসাহিত করেছেন গণসংস্কৃতির আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। তাই যে অশান্ত কবিয়াল গুরুদাস পাল রোগক্লিষ্ট শরীরে আসরে দাঁড়িয়ে বন্দনা করছেন :

পথে পথে শতে শতে গেয়ে চলি গান
যতদিন বাংলার এ মহাশ্মশান
না জাগিবে, না ফুটিবে নব কিশলয়।
অত্যাচারীর গ্লানিমাখা পরাজয়
না উড়াবে জনতার বিজয় নিশান
ততদিন শান্ত মোর হবে না তো গান···।

সেই কবিয়ালকেই দেখি 'ভোটের বাক্সে সমাধান'-এর আহ্বান জানাচ্ছেন।

দ্বিতীয়বার যখন কলকাতায় রমেশ শীল এসেছিলেন তখন সেই শ্রদ্ধেয় কবিয়ালের সঙ্গে গণনাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। তাঁকে একটা বিশেষ সমস্যা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান থেকে দু-চার কথা বলতে চেষ্টা করেছি—অবশ্য আমার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। সঙ্গীতবিদ্‌ গবেষকদের কাছে লোকগীতির চর্চাকারীদের পক্ষ থেকেই আমি এই কথাগুলো নিবেদন করলাম।

আমার নিবেদনের মুখ্য কথা লোকসংগীত আয়ত্ত করতে হলে একাত্ম হতে হবে। সেটা জীবনে জীবন যোগ করার সমস্যা। উৎপাদক মেহনতী মানুষই

লোকসংগীতের স্রষ্টা। যে অন্নদাতা সে-ই স্বরদাতা। যে হাত লাঙলের খুঁটি ধরে, যে হাত নৌকার বৈঠা ধরে, গুণ টানে, যে হাত জাল বোনে, সেই হাতই দোতারা বানায়, সেই হাতেই ঢোলের বোল ওঠে। সেই অবিচ্ছিন্ন জীবন থেকে স্বরকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে ভুল হতে বাধ্য।

এটা জনতার যুগ। কোনো গবেষক, কোনো বিশেষজ্ঞ বা শিল্পী তাদের থেকে দূরে বসে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না। শোষণের বিরুদ্ধে উৎপাদক মেহনতী মানুষের আজ যে সংগ্রাম তার সাথে আত্মিক যোগাযোগ অর্থাৎ পক্ষভুক্তি না থাকলে একাত্ম হওয়া যায় না।

অর্ধাহার অনাহারের মধ্যেও জনতার মাঝখান থেকে অসংখ্য শিল্পী তৈরী হচ্ছেন, শহরের সংগীতবিদ্‌দের কাছে তাঁরা অজ্ঞাত। যাঁরা কলকাতায় এসে প্রচার-যন্ত্রের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন সংগীতবিদ্‌রাও তাঁদেরই নাম উল্লেখ করে আলোচনা করে থাকেন। ক্লাসিকাল বা রবীন্দ্রসংগীত নগরকেন্দ্রিক, কাজেই প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের জানা সহজ। কিন্তু লোকসংগীত গ্রামকেন্দ্রিক—গ্রামের অখ্যাত অজ্ঞাত শিল্পীদের মধ্যেই আজও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরা রয়ে গেছেন। একটি প্রবাদ আছে: যাঁর হাতে খাইনি তিনি বড় রাঁধুনী—যাঁকে দেখিনি তিনি বড় সুন্দরী। যার গান শুনিনি সেই বড় গায়ক, এই দৃষ্টি নিয়েই লোকশিল্পীর আবিষ্কারের সন্ধানে থাকতে হবে বিশেষজ্ঞদের। আব্বাসউদ্দীনকে তাঁরা জানেন—জানেন না টেপু মিঞা বা বয়ান শেখদের। শচীন দেববর্মণকে জানেন, কিন্তু নিরঞ্জন সূত্রধর বা কুনিয়া শীল বা মহানন্দ দাসদের কেউ জানেন না—যাঁরা শচীন দেববর্মণের চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোকশিল্পী। তাই গণপ্রতিভা আবিষ্কারের সাধনা নিয়েই গবেষককে ডুব দিতে হবে জনসমুদ্রে।

লোকসংগীত শুধু অতীত-সন্ধানী নয়, লোকসংগীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিধ্বনি।

লোকসংগীতে যুদ্ধ ও শান্তি

যাযাবর যূথবদ্ধ শিকারীর ঐন্দ্রজালিক যুগে প্রকৃতিজয়ের কৌম প্রচেষ্টায় ও চেতনায় যে অস্ফুট ধ্বনি-অনুকৃতি তা থেকেই প্রথম সংগীতের সৃষ্টি। পরবর্তী কৃষিজীবনের স্থিতিশীলতায় তার বিকাশ। আদি কৃষিযুগের কথা ও সুরের কোনো নমুনা আমাদের হাতে নেই। অগ্রসর শ্রেণীবিভক্ত কৃষিসমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের সঙ্গে impersonal কৌম-নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে personal ব্যক্তিচেতনার সুরবৈচিত্র্য এলো। এলো সংগীতে শ্রেণীবিভাগ—বিদগ্ধ ও লোকায়ত।

লোকায়ত ধারাটির একটি অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ আছে। কিন্তু আমরা যে সব লোকসংগীত নিয়ে আলোচনা করে থাকি তার কালক্রম বেশীদিনের নয়। হাজার হাজার বছরের মানবসমাজ-বিকাশের পথে এগুলি বড়জোর দুই কি তিন শতাব্দীর ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। অধিকাংশই গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বর্তমান কালের রেখায় এসে মিশেছে। আদি কৃষিযুগের স্বতোৎসারিত impromptu গানের যুগ থেকে আজকের কোনো জনকবি-রচিত গানের যুগের মধ্যেকার ব্যবধান অনেকখানি। তবু জনজীবনের বিবর্তনের বিচিত্র ধারাটি থেকে সে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। কাজেই পুরাতত্ত্ববিদের কৌতূহল নিয়ে লোকসংগীতের আহরণ ও আলোচনা যেমন ভ্রান্ত তেমনি আধুনিক গণজীবনের আলোড়ন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিশেষ শহুরে রচয়িতার বিফল অনুকরণকে লোকসংগীত বলে স্বীকার করাও অন্যায়।

লোকসংগীতের ক্ষেত্রে কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিদ্ আধুনিক জীবনসমস্যার গন্ধ পেলেই লোকসংগীতকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। এটা তাঁদের অনৈতিহাসিক গোঁড়ামি। অন্যদিকে দেখি লোকসংগীতের বিশেষ রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গী, সুরের স্বকীয় আঞ্চলিকতা ও গায়কী, এবং সর্বোপরি জনজীবন থেকে উদ্ভূত প্রেরণার কঠিন কষ্টিপাথরে যাচাই না করে নির্বিচারে লোকসংগীত আহরণের নিন্দনীয় অতিআধুনিকতা।

এই দুই ভ্রান্ত দৃষ্টিকে পরিত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে লোক-সংগীতকে বিচার করলে আমরা তা থেকে সমাজ-রূপান্তরের সক্রিয় উপাদান খুঁজে পাব। জনসাধারণকে গভীরভাবে ভালবাসতে, তার সঙ্গে সমাত্মীয়তা স্থাপন

করতে, এবং বর্তমান গণবিচ্ছিন্ন উন্নাসিক অবক্ষয়ের পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে লোকসংগীতকে পাব একটি সুদৃঢ় সেতু হিসাবে।

বহুবিস্তৃত গণমানসের একটি বিশেষ ধারা আমার আজকের আলোচ্য বিষয়। বিষয়টি যুদ্ধ ও শান্তি। বর্তমানের সবচেয়ে জীবন্ত বিশ্বসমস্যা। সচেতন শান্তি-আন্দোলনের বাইরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে গানগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়ার প্রয়াস পাব। অবশ্য গান গেয়ে সুরের মাধ্যমে যে উপলব্ধি, শুধু রচনার আলোচনায় সেখানে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

প্রথমেই একটি জিনিস লক্ষণীয়। আমাদের সাধারণ মানুষ বর্তমান এক-শ্রেণীর শান্তি-আন্দোলনকারীর মতো যুদ্ধ মাত্রকেই পরিত্যাজ্য মনে করে না। যুদ্ধকে তারা দুইশ্রেণীতে বিভাগ করে দেখেছে। ন্যায়যুদ্ধ ও অন্যায়যুদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারতের ঐতিহ্যবহনকারী আমাদের জনতা। হিংসা বা অহিংসার অলীক ও অবাস্তব ethics দিয়ে তারা বিচার করে না। সিপাহী-বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম, ভগত সিংয়ের অমর বীরগাথা আমাদের লোকসংগীতের এক বলিষ্ঠ ঐতিহ্য। পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীদের জারিগানে কারবালা প্রান্তরের এজিদের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধের যে অপরূপ বর্ণনা পাই—বেদনা ও বীরত্বে তা মহান। সন্তানহারা ফতেমার দুঃখের মহিমা, স্বামীহারা বিবি সাকিনার ত্যাগের গৌরব, আজো অগণিত জনতার প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। 'দুলদুলের' পিঠে চড়ে হোসেন যুদ্ধে গেছে—মহরমের ঢোলের বাজনার ফাঁকে ফাঁকে কানে বাজে ফতেমার আকুতি

ও ঘোড়ারে দুলদুল ফিরিয়া আয় ঘরে
আজির রণ জিত্যা আইলে
সোনা দিমু তোরে।

শুনি বিরহী সাকিনার কান্না—

কান্দে বিবি সাকিনা
জিন্দেগী ভরিয়া পতি আর তো দেখা হইল না।

জারিগনের চতুর্মাত্রিক পায়ের তালের সমেসমে ওঠে লড়াইয়ের ব্যঞ্জনা—

সাজো সাজো বলিয়া রে শহরে পইল সাড়া
সাত হাজার বাজে ঢোল চোদ্দ হাজার কাঁড়া
... ...

তারপর সাজিল মর্দ তুরুক আমানী
সমুদ্দুরে নামলে তার হইত আঁটুপানী।
ইত্যাদি।

বীরের রক্তস্রোতে বানডাকা শুকনো ফোরাত নদীর ঢেউ আজো আমাদের জনসাধারণের মনে আলোড়ন তোলে।

আসামে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল আক্রমণ হয়েছিল। লাচিত বরফুকনের নেতৃত্বে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ অসমীয়া গণমানসে যে আলোড়ন তুলেছিল তার লোকসংগীত আজো তার সাক্ষ্য বহন করে।

চিরাখুন্দি দিয়া থাঁউ প্রাণেশ্বরী
সান্দহ্ খুন্দি দিয়া থাঁও।
রাতির ভিতরত কাপর বইদিয়া
শতরু মারিব লৈ যাঁও।

আসামের পৌষপার্বণ মাঘবিহু। প্রেমিকের জন্য প্রেমিকা চিড়া কুটছে পিঠা তৈরীর জন্য। কিন্তু প্রেমিক বলছে রাতারাতি প্রেয়সী তাঁতশালে কাপড় বুনে দাও। পরে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে।

বৃটিশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গণবিদ্রোহ—আসামের উত্তর কামরূপ, বাংলার নীলবিদ্রোহ থেকে শুরু করে মালাবারের মোপলা-বিদ্রোহের মতো অসংখ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ আমাদের লোকসংগীতে অমর সম্পদ রেখে গেছে। একদিকে শাসকশ্রেণীর অন্যদিকে রক্ষণশীল লোকসংগীত সংগ্রহকারীর অবজ্ঞায় আজ সে গানগুলি লুপ্তপ্রায়।

অন্যদিকে রাজায় রাজায় যুদ্ধ এবং প্রজার অহেতুক মরণে সাধারণ মানুষ চিরদিন প্রতিবাদ করে এসেছে। বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতকে দুটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জালে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এই যুদ্ধে ধনেজনে ভারত সর্বস্বান্ত হয়েছে, কত ঘরে কান্না উঠেছে বিরহী বধুর ও সন্তানহারা মায়ের—তার সাক্ষ্য আছে আমাদের লোকসংগীতে। কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা পরোক্ষভাবে এইসব লোকসংগীতে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে বসরায় বহু ভারতীয় সৈন্যকে পাঠানো হয়। সিলেটে বসরাকে বিদ্রূপ করে একটি গান সে-সময় খুব চালু হয়েছিল।

মিঞা গেছলায় যে বসরায়
দেখছনি দলান

ছুটু ছুটু সিপাইগুলা লালকুর্তা গায়
আটুপানিত লাইম্যা তারা পিস্তল মারত যায়।

সিলেট, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের মুসলমান চাষীরা সমুদ্রগামী জাহাজে লস্কর হয়ে বিদেশে যায়। লড়াইয়ের সময় তারাই সবচেয়ে বেশী মরেছে। এই জাহাজীদের জীবনকাহিনী নীলসমুদ্রের নীচেই অবলুপ্ত। কোনো কোনো গানে হয়তো এসব হারামণির সন্ধান পাই। চট্টগ্রামের একটি গ্রাম্য গানে যুদ্ধের যে বেদনা ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের লোকসংগীতে তা দুর্লভ।

বসরার পোস্টঅফিস অইল ছারা।
খসম আমার গেলগৈ ছারি লরাইয়ের ডাক পাই ত্বরা।
দিন গেল, মাসরে গেল, গেলরে বছর
আইল নারে খসমের মোর চিডির উত্তর।
অকালে পরিল ঠাডার কান্দের ভাইবোন দেশপারা।
হায় হায়রে—মাতা কান্দের পিতারে কান্দের,
কান্দের সোদর ভাই
বসরার কোনরে সম্বাদ নাই!
মাইজ্যা ভাইয়ের বৌএ কান্দে
খুইল্যা ভাইয়ের বৌএ কান্দে
সোয়ামী আমার গেল মারা
পোয়া কান্দের মাইয়া কান্দের
বাপজান তারার গেল মারা।

খসম মানে স্বামী। ঠাডার মানে বজ্র। বসরার পোস্টাফিস থেকে স্বামীর কোনো চিঠি নেই। অপেক্ষায় অপেক্ষায় দিন গেল, মাস গেল। বছর ঘুরে এল। স্বামীর কোনো উত্তর নেই। অবশেষে একদিন শেষ উত্তর এলো। কিভাবে এলো জানি না। আশার নীলাকাশ থেকে বজ্রপাতের মত। ছেলেমেয়ে লুটিয়ে পড়ল—"বাপজান তারার গেল মারা।"

তেমনি একটি নোয়াখালির লোকসংগীতে পাই:

মোর খসম গেছে যুদ্ধে চলিয়া
ওগো ননদী, আমারে একলা ঘরে থুইয়া।
ও ননদী গো উড়ুয়া জা'জে যুদ্ধ করে
জাপানে আসিয়া।

উপরতনে পড়ল বোমা হুকুমদারাম করিয়া
আমারে একলা ঘরে থুইয়া।
ননদী গো ঘরের পিছে সিম্বাং বাইগুন
জইলা উঠে চিত্তের আগুন
বুঝাইলে মন বুঝ মানে না
ও মনে বুঝাই আমি কি দিয়া।
আমারে একলা ঘরে থুইয়া।

পল্লীসংগীতের আধার ঠিকই আছে কিন্তু আধেয় গেল বদলে। সামন্তধর্মী সমাজের চিরন্তন পল্লীপ্রেমের গানে বিরহিনীর শ্রোতা হলেন ননদী। ঘরের পেছনে ঝুলন্ত 'সিম্বাং বাইগুন' দেখে প্রবাসী প্রেমিকের জন্ম চিত্তে আগুন জলে ওঠা, সবই ঠিক আছে। কিন্তু ঘটনার মূল পটভূমি গেছে বদলে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এনেছে এ বিচ্ছেদ। এ ট্র্যাজেডি আরও তীব্র। প্রতিবাদ আরও শানিত। গানটি শুনলেই বোঝা যাবে এটি গত মহাযুদ্ধের সময়কার। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি সে সময়ে বোমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। যুদ্ধের কালোবাজারী অর্থনীতির মুদ্রাস্ফীতিতে সমাজজীবনের পরিবারবন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তার পরিচয় আমরা সে সময়কার বহু গানে পাই। সিলেটে তখন একটি গান প্রায়ই হাটেমাঠে শোনা যেত :

ননদ গো তোর ভাই গেল বৈদেশে
আর এলো না দেশে।
চাটিগাঁয়ের রাঙ্গাগো মাটি
তোর ভাইয়ের কাছে লেখছি চিঠি
গুণের ননদ গো
মেলেটারীতে যেজন চাকরী গো করে,
সেজন কেনে বিয়া করে
গুণের ননদ গো।
ইত্যাদি।

চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে তখন মিলিটারী ঘাঁটি তৈরী হচ্ছিল। যুদ্ধের 'কণ্টেকদারী'র আলাদীনের গল্প গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুরামাখা কাগজে নোটের ফানুসে পল্লীবধূর সরল প্রেম উড়ে গেল। তাই তার অকপট জিজ্ঞাসা :

মেলেটারীতে যেজন চাকরী গো করে
সেজন কেনে বিয়া করে
গুণের ননদ গো।

মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোকসংগীতেও হাওয়াই-জাহাজের প্রতীকচিত্র স্থান নিল। নিম্ন আসামের একটি গানে আছে:

উপরান দি যায় উড়ানজাহাজ তাহার দুইখন পাখা।
আমা লাগি আনি দিয়া হাতীর দাঁতর শাখা।

গতযুদ্ধে ভারতের মাটিতে যুদ্ধের আগুন আসাম সীমান্তে এসে পৌঁছেছিল। আসাম রক্ষার ভার তখন বৃটিশ সৈন্যের হাত থেকে মার্কিন সৈন্যের হাতে যায়। মার্কিন সিপাহীদের ছাউনী পড়ে আসামের সর্বত্র। এদের উপদ্রবে গ্রামের মেয়েরা জলের ঘাটে আসতে পারত না। মেয়েদের ইজ্জত-সম্ভ্রমের প্রতি এদের ছিল না বিন্দুমাত্র মর্যাদা। পল্লীসংগীতে প্রেমিকার অভিসারে চিরদিনকার বাধা শাশুড়ী, ননদ, পাড়াপড়শী। এবার হলো তার চেয়ে হাজার গুণ বড় বাধা—সিপাহীর ভয়। এ ভয়কেও লঙ্ঘন করে যে প্রেম—তা সত্যিই দুর্বার। বীর যুবক তার প্রেমিকাকে ইঙ্গিত করছে:

সোনারুর ডালতে কপেসৌ কুরুলিয়াই
সিমলুত শ্যেন পড়ি রয়।
রিঙি শুনি শুনি আহিবা লাহরি
নকরিবা চিপাহীর ভয়।

সোনারু গাছে পায়রা ডাকছে, শিমুলগাছে আছে শ্যেন। ডাক শুনে শুনে প্রিয়ে তুমি এসো। সিপাহীর ভয় কোর না।

বীরবাহাদুর নেপালীজাতি। গুর্খালীর সঙ্গে ভোজালীর হরিহর আত্মা। কিন্তু দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে এদের দেশ ছাড়তে হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাই সবচেয়ে বড় রেক্রুটের স্থান ছিল নেপাল। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে হাতাহাতি ট্রেঞ্চযুদ্ধে অপরিসীম কৃতিত্ব ও শৌর্যের ইতিহাস এরা রচনা করেছে। কিন্তু কার জন্য? নেপালী লোকসংগীতে এই পররাজ্যলোভী যুদ্ধের কোনো মহিমাকীর্তন নেই। এই নির্ভীক প্রাণদানের অন্তর্লীন সুরটি বেদনার। এবং সেই সুরটি প্রত্যেক নেপালী সিপাহীর কাছে এমনই প্রিয় যে নেপালী পল্টনে মার্চ করার ব্যাণ্ডে হাই-ল্যাণ্ডার্স ব্যাগপাইপে সাইড ড্রামের ছন্দে ওরা গান গায়:

নায়ো নায়ো কাঞ্চীনানী হামি যাহুম ধাওয়া।
মরে পঁচি মরি যাওলা বাঁচে পঁচি আওলা।

কিংবা

জার্মানকো ধাওয়া ও কাঞ্চী
জানো পড়িয়ো মায়ালাই ছোড়েড়ো।

এমন কোনো নেপালী নেই যিনি এ দুটি গান জানেন না। ধাওয়া মানে যুদ্ধ, "কেঁদো না মেয়ে, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। যদি মরে যাই তো গেলাম। বাঁচলে তোমার কাছে ফিরে আসবো।" "জার্মান যুদ্ধে যাচ্ছি প্রিয়ে, আমার মায়া তুমি ছাড়" ইত্যাদি। কত সহজ কথা কত সাধারণভাবে ব্যক্ত। অথচ কত গভীর তার বেদনাবোধ।

নেপালী মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হল তিজ্। একান্তভাবে এটি মেয়েদের উৎসব। গীতরচনাও মেয়েদের। আমাদের ভাইফোঁটার মতো উৎসবের মূল লক্ষ্য ভাইয়ের শুভকামনা। এই গানগুলিতে ভোমরার মতো আছে একটি একটানা সুর। কিন্তু কোথাও একঘেঁয়েমি নেই। সারারাত মেয়েরা হাততালি দিয়ে দিয়ে গান করে একই সুরে অথচ এমনি এক আবেশ এমনি এক আকুতি এই গানে মনের তারে যেন সর্বক্ষণ গুঞ্জন করতে থাকে। এই রকম একটি গান শুনেছিলাম আসাম-প্রবাসী নেপালী মেয়েদের কাছে।

তীজকো রহর গর নানী নৈ।
সুন মেরী দিদি সুন মেরী ভৈনী
পল্টনমা গয়েকা দাজু মেরা প্যারা
বীতে গোলী খায়ের ভনে খবর পায়ের
মন মোর ধরর রুঞ্চ বরর।

তিজ উৎসবে আনন্দের দিনে বোনরা শোন আমার দুঃখের কাহিনী। আমার আদরের ভাই ছিল পল্টনে। গুলিতে সে প্রাণ হারিয়েছে। আনন্দের দিনে পেলাম এই বুকফাটা খবর।

নেপাল থেকে রেক্রুট হবার পর ভারতে এসে সবাই গোরখপুর ছাউনীতে জড় হতো। নেপালী মেয়ের সদ্যবিরহের প্রতীকচিহ্ন হয়ে আছে গোরখপুর।

দিনোদিন হাওয়াই জাহাজ আইরনি।
ঘরো বসি মশোধাই রুয়েরনি।

আফু হজুর গোরক্ষপুর ছাউনিমা।
মতো হজুর নেপাল আগনমা।

আকাশে হাওয়াই জাহাজের গুঞ্জন। ঘরে মশোধার ক্রন্দন। সুদূর গোরক্ষপুর ছাউনীর অজানা জীবন—সব মিলে দু'কথায় গানটি যুদ্ধের প্রতিবাদে কী অপূর্ব!

রাজস্থানের প্রাসাদের প্রতিটি প্রস্তরে, ধূসর প্রান্তরের প্রতিটি ধূলিকণা অতীত শৌর্যের সাক্ষ্য বহন করে। আমাদের বর্তমানকালের অনেক দেশাত্মবোধক গান ও নাটকের উপকরণ অতীত রাজস্থানের এই বীরগাথা। কিন্তু আজকের রাজস্থানের মেয়ে রাজার ফৌজে যোগ দিয়ে মরণের কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় না। সে গান গায়:

উচা রাণাজীরা গোখেড়ারে
নীচে পিছলেরে ঝিল পটেল্যা, মালবীরে
মারো জাইলোরে।
রাজারি বৈঠক ছোড় দেরে
ক্ষেতির ধন্ধো ধাব পেটেল্যা—মালবীরে
মারো জাইলোরে॥

(উদয়পুরের) রাজমহলের উঁচু চূড়া। সরোবরের পাড় নীচু। ও পেটেল (স্বামী) তুমি মরতে যেও না। রাজার ফৌজ ছাড়। ক্ষেতির ধান্দায় লাগ। ও পেটেল মরতে যেও না।

কিন্তু এ-বিষয়ে সবকিছুকে যেন পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় পাঞ্জাবের হৃদয়-নিঙড়ানো গীতগুলি। ভারতের দ্বাররক্ষী পাঞ্জাব। যুগ যুগ ধরে পঞ্চনদীর দেশের নির্ভীক সন্তান বিদেশী আক্রমণকে প্রথম মোকাবিলা করেছে। পাঞ্জাবের বীরাঙ্গনারা তাদের কপালে জয়তিলক পরিয়ে রণাঙ্গনে নিজ হাতে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছে। পাঞ্জাবের মেয়েরা গিদ্দার নাচের হাততালিতে রণাঙ্গনের প্রবাসী স্বামীকে স্মরণ করে গেয়েছে:

পাওয়ে পাওয়ে পাওয়ে
গিদ্দা পাও সুনিও
জং জিৎকে সিপাহী কাড় আওয়ে।

নাচ-নাচ-সুন্দরী—নাচ
আমার সিপাহী যেন জয়লাভ করে ঘরে ফিরে আসে।

কিন্তু এযুগে বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী কৃষককে দীর্ঘদিন বৃটিশের শোষণে নিঃস্ব হয়ে

সৈন্যবাহিনীতে বেতনভুক্ সিপাহী হয়ে যুদ্ধে যেতে হলো, তখন পাঞ্জাব রমণী গিদ্দা নাচে স্বামীর জয় কামনা করে না। অভিশাপ দেয় সে শাসককে, অভিশাপ দেয় যুদ্ধকে।

সন্ধ্যায় উনুন জ্বালিয়েছে মেয়ে। স্বামী তার বিদেশে। উনুন দাউ-দাউ জ্বলছে। তন্দুর রুটি তৈরী হবে—তারি আয়োজন। কিন্তু হঠাৎ জ্বলন্ত উনুন, মাখা আটার পিণ্ড সবই যেন তার জ্বলন্ত বিরহী মনের প্রতীক হয়ে দেখা দিল।

ইস্ক্ তন্দুর হড্ডাকা বালন
দোজক নাল তপামা
কারকে কলিজা কারলা পেরে
হুসন প্রেথন লামা
সিপাইয়া মোর পাওয়ে
মৈ আঁউসিয়া পাওয়া
* * *
সিপাইয়া তু গেন্দু লামো
লাকে মেহু চোরা
বিরহ হড্ডাহু এন্দা খা যাউ
ঘিঁউ ছোলেয়াহু ঢোড়া
যাক্ত বিছনা যাঁইকেঁ
এ বাগ্ গাঁ দিয়া মোরা।

বিরহের উনুনে আমার বুকের পাঁজরা হলো ইন্ধন। মাখা আটার পিণ্ড যেন আমারই হৃদপিণ্ড। প্রেমের আগুনে রূপের শিখায় সে হৃদপিণ্ড জ্বলে পুড়ে ছাই হচ্ছে। সিপাই তুমি আসবে কবে—। আমি যে ঘরে বসে দিন গুনছি। ছোলার খোসা যেমন তেমনি থাকে, কিন্তু দুষ্ট পোকায় খেয়ে অন্তঃসারশূন্য করে দেয়। তুমি যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর আমিও তেমনি অসার দেহ নিয়ে বেঁচে আছি।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই অসহায় নীরব বিলাপই লোকসংগীতের একমাত্র অন্তর্লীন ভাব নয়। ক্ষোভে, ক্রোধে সে সুর কখনো অগ্নিবর্ষী হয়ে ওঠে।

গাড্ডীয়ে নে তেরা পাইয়ে টুট যাঁর
চারেঁ টুট যাড়ঁ বাইয়াঁ।
গবরু তেঁ টোলেই
নারা দেড় দোহাইয়া।

ওরে গাড়ি—তুই যে আমার যৌবন ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিস। আমি অভিশাপ দেই, তোর চাকাগুলি যেন খসে খসে পড়ে। যে-রেলগাড়ি করে সিপাই চলে গেল—তার বিরহিনী বধূ সেই গাড়ির দিকে তাকিয়ে এই অভিশাপ জানাচ্ছে। লৌহদানব বাষ্পশকটকে এরকম অভিশাপ পৃথিবীতে কেউ কোনদিন দিয়েছে কিনা জানি না। একটি নারীর ক্রন্দনের শব্দ দানবীয় ঘড়ঘড়ানির তলায় ডুবে যাবে না? কিন্তু এ তো পাঞ্জাবের এক সুদূর পল্লীর কোনো এক কৃষক রমণীর একার অভিশাপ নয়। এ হল বিশ্বনারীজাতির অভিশাপ। এই অভিশাপে সাম্রাজ্যবাদের বাষ্পীয়শকটের চাকাগুলি একটি একটি করে খসে পড়ছে। তারপর একদিন—খুব দূরে নয়—তার চলার শেষ চাকাটিও আর থাকবে না।

বাংলার লোকসংগীতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সাধনা

গ্রাম্য গীতিকার পালাগানের শুরুতেই থাকে বন্দনা। বন্দনায় যেমন থাকে দিক্ বন্দনা :

পুবেতে বন্দনা করলাম পুবের ভানুশ্বর
একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর।...

ঠিক তেমনি থাকে সভার বন্দনা—পল্লী বাংলার সভা হিন্দু মুসলিমের মিলিত সভা।

সভা কইর‍্যা বইছ ভাইরে হিন্দু মুসলমান
সভার চরণে আমি জানাইলাম সেলাম।

সেই সুরেরই রেশ টেনে প্রধান গায়ক বা বয়াতী গাইতে থাকেন—

হেদু আর মোছলমান একই পিণ্ডর দড়ি
কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি।
বিছমিল্লা আর গিরিবিষ্টু একুই গেয়ান
দোফাক করি দিয়ে পরভু রাম রহমান

পাণ্ডা পুরোহিত, মোল্লা মৌলানা শাসিত সামন্ত সমাজের আনুষ্ঠানিক ধর্মের আচার বিচার যখন আমাদের কৃষিজীবী খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে বিভেদের ও বিচ্ছেদের বীজ বপন করেছে, জনসাধারণের কবি তখন বিপরীত জীবনদর্শন প্রচার করে ঐক্য ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছেন।

অজানা মুসলমান গ্রাম্যকবি গাজীর গীতে গেয়েছেন।

নানা বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ
জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

গ্রামবাংলায় কৃষিজীবী নিরক্ষর মানুষের কাছে গ্রামের কবি এমনি এক মহান বিশ্বমানবতার বাণীকে এমন সহজ অথচ সুগভীর আবেগে প্রচার করেছেন।

মোল্লা মওলানার শরীয়ত শাসন কিংবা সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের মনুর বিধানকে অবজ্ঞা করে, সমাজপতিদের লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করে, বৈষ্ণব, সুফী ও সহজিয়া বাউলের ভাবধারার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব মানবতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। জাতপাত আচারবিচারের শুকনো বালুচরে তাদের এই নবভাবের বন্যায় যে মানবধর্মের পলিমাটি পড়েছিল তাতে আমাদের পল্লীপ্রান্তর সবুজ প্রাণের ফসলে ভরে উঠে-

ছিল। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের এই নিরক্ষর দার্শনিকদের কথা ভাবলেই প্রথমে মনে পড়ে মুসলমান কবিদের কথা—শানাল ফকির, সেখ মদন, শরীয়তী শাহ প্রভৃতি নাম শিক্ষিত শহুরে সমাজেও আজ পরিচিত। কিন্তু কত ছোট বড় জ্ঞাত অজ্ঞাত লোককবি দেহের খাঁচার মধ্যে হীরামন পাখীর সন্ধান দিয়ে মানব-দেহকে পবিত্রতম ঘোষণা করে স্বর্গ ও বেহেশতের উপরে স্থান দিয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সৃষ্টিতত্ত্বের শরীয়তী ধারণাকে ওলটপালট করে যখন মুসলমান পল্লী কবি হাছন রজা বলেন,

আমার আংখি হইতে পয়দা হইল আসমান জমিন

কিংবা হিন্দু কবি মনোমোহন বলেন :

মনোমোহন কয় পেরেশন
পুজে হিন্দু মুসলমান
তড়িকৎ মঞ্জিল কইরে আপনে হজরত।

অর্থাৎ প্রেমের পথে নিজের দেহের মঞ্জিলেই হজরতের সন্ধান মেলে। সাম্প্রদায়িক শাসনক্লিষ্ট সমাজে এর ঐক্যসাধনকারী তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। শুধু দেহতত্ত্ব নয়, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কৃষিজীবী গ্রাম্য বাংলার ভিজে মাটি ও সজল হাওয়ার আবেগের একটি সর্বজনীন পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। আরবের কারবালার ফাতেমার চোখের পানি আর বাংলার নিমাই সন্ন্যাসের শচীমাতার বেদনাশ্রু এক মোহানায় মিশে গেছে। হোসেনের ঘোড়াকে সম্বোধন করে ফাতেমার বুকফাটা বিলাপ :

ও ঘোড়া দুলদুলরে দুলদুল
ফিরিয়া আয় ঘরে
আইজের রণ জিত্যা আইলে
সোনা দিমু তোরে।

কিম্বা শচীমাতার আকুতি :

ওরে ও নগরবাসী তোমরানি কেহ দেইখাছ নিমাইরে
তোমরানি দেইখাছ নিমাইরে
আমার প্রাণের বাছারে।
সন্ন্যাসী না হইওরে নিমাই
বৈরাগী না হইও।
ঘরে এসে অভাগীরে মা বলে ডাকিও নিমাইরে···

মুর্শিদ মোজাহেদ চান্দে যখন গান—

তোর গৈরবে আমরা গৈরবিনী গো ফাতিমা মা

আবার শেখ মুন্সী সেই সুরে যখন গলা মিলান, "আমার শচীর দুলাল গৌরবে"—তখন বিরহ বিধুরা বাংলার ব্যথিত প্রাণের তন্ত্রীতে একই আবেগের কম্পন তোলে আজ।

হাসানের বেটা কাসেমের বিবির যে বিলাপ—

যাইও না যাইও না নাথ আমারে ছাড়িয়া
যুদ্ধে যাইতে ছিল সাধ কেনে করলা বিয়া

তার সাথে ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার যে আর্তনাদ—"শচীমাতা গো আমি চার জন্মে হই জন্ম দুঃখিনী"—এই দুয়ে মিলে গ্রাম্য বাংলার হাওরে বিলে বারে বারে যে ভাবের ঢেউ উঠেছে, কাটা গাঙের ঘোলাজল তাকে কি ডুবিয়ে দিতে পারে?

এই ভাবের প্রবাহে বাউল কবিদের দান অসামান্য।

বাউল বলতে এক কথায় আমরা যা বুঝি তা বাংলায় সুফী আর বাউলা সাধনার ধারার সমন্বয়ে সৃষ্ট জীবনদর্শন। এই বাউল ও সুফীরা যে মানুষের সন্ধানী হয়েছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে গূঢ় তত্ত্বের ব্যাপার হলেও সামাজিক দৃষ্টিতে তা ছিল জাত পাত ধর্মের উপরে মানবতার প্রতিষ্ঠা! সেই নবমানবতা বাংলার পল্লীসংস্কৃতিতে সেদিন এক নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করেছিল। আজ বাউলসংগীতের সাধক এবং গবেষকরা তার তত্ত্ব নিয়ে মত্ত। কিন্তু তত্ত্বের ব্যাপার হলে তা লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো না! তার সমাজসত্য, সহজ করে দেখা ও গভীর অনুভূতিই লোকমানসে ভাবের ঢেউ তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি'র ভূমিকায় লিখেছেন: "আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষ ও অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই। তারা একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে। এই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা, স্কুল কলেজের অগোচরে আপনা আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু মুসলমানের

জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

যশোহরের পাঞ্জা শাহ ছিলেন তেমনি এক সুফী বাউল। গোঁড়া সমাজ-পতিদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে গেয়েছিলেন :

জেতের বড়াই কি,
ইহকালে পরকালে জেতে করে কি।
আমার মন বলে অগ্নি জেলে দিই জেতের মুখি,
এক জেতের বোঝা লয়ে
চিরকাল কাটালাম মানী মানুষ হয়ে,
মানের গৌরব, কুলের গৌরব
ধন্ধবাজি সব দেখি।
লোকে পেটের জ্বালায় দেশান্তরী হয়,
হিন্দু মুসলমানের বোঝা মাথায় করে রয়,
কার বা জাতে কেবা দেখে ঘরে এলে চিহ্ন কি।

"আমার মন বলে অগ্নি জেলে দিই জেতের মুখি"—বাউল তত্ত্বের অন্তরাল থেকে ক্রোধে অভিমানে বেরিয়ে আসা এই গান মনে করিয়ে দেয় বিদ্রোহী কবি নজরুলের—"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া"। কিন্তু এ-বিষয়ে লালন শাহের তুলনা নেই। আমাদের অতি পরিচিত মরমীয়া লালন ফকির সমাজের অতি নীচুতলা থেকে উপর তলার বিভেদকারী ধর্মবুদ্ধিকে তীব্র চাবুক হেনেছেন। হিন্দু মুসলমানের উর্ধ্বে এক মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর সাধনা।

ফকিরি করবি ক্ষেপা কোন রাগে,
আছে হিন্দু মুসলমান দুই ভাগে।
থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ,
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন,
ভেস্ত স্বর্গ ফাটক সমান
—কার বা তা ভালো লাগে।

তারপরেই তাঁর জীবনদর্শন যে মানবতত্ত্ব তা অতি পরিষ্কার ভাবে প্রচার করেছেন :

মানবতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।
মাটীর ডিপি কাঠের ছবি
ভূতভাবে সব দেবাদেবী,
ভোলেনা সে এসব রূপি
ও যে মানুষ রতন চেনে।
জিন ফেরেস্তার খেলা
পেঁচাপেঁচি আলা ভোলা
তার নয়ন হয়না ভোলা
(ও সে) মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে। ইত্যাদি

পারস্যের যে কবি শরীয়তের শাসনকে অবজ্ঞা করে একদিন বলেছিলেন 'আনাল হক', 'আমিই সত্য' এবং তদানীন্তন ধর্মজীবীদের দ্বারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, গল্পে আছে, তাঁর ছাইয়ের সঙ্গে আনাল হক ধ্বনি বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার মাটিতে সে ছাই এসে লালনের মত বহু কবির জন্ম দিয়েছে। সামন্ত সমাজের অচলায়তনের মধ্যে এই ফকিরেরা গণচেতনার নির্ভুল ফরমান। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জীবনদর্শন এমনি ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমাদের দেশের সর্বধর্মসমন্বয়বাদীদের চেয়ে এই বাউলরা ছিলেন অনেক অগ্রসর। সমন্বয়বাদীদের মন্দির গীর্জায় মসজিদে সর্বত্রই সত্য আছে, এরা দেবাদেবী, জিন ফেরেশতা সবই সত্য বলে জোড়াতালি তত্ত্ব দিয়ে সমন্বয় সাধনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু সহজিয়া সুফি বাউলরা সে তুলনায় ছিলেন বিপ্লবী। তাঁরা মন্দির মসজিদ মার্কা ধর্মে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

মদন বাউল অত্যন্ত জোরালো ভাষায় গেয়েছেন :

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে, মুরশেদে ॥

কিংবা

মোর যাইতে তো চায় না মন মক্কা-মদিনা
বন্ধু আমার কাছে আমি রইব তারি কাছে,

পাগল হইতাম ঘরে রইতাম
তারে চিনতামরে যদি না।
(আমরা) নাই মন্দির কি মসজিদ
নাই পূজা কি বকরিদ
তিলে তিলে মোর মক্কা কাশী
পলে পলে সুফিনা।

যাঁরা বাউলতত্ত্ব আলোচনা করেন, ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার ত্রিবেণী সঙ্গমের কিংবা সুফীদের আবহায়াতের নির্ঝরিণীর গুহ্যধারার সন্ধান বিশ্লেষণ করেন, তাঁরা এই তত্ত্বের সামাজিক ও মানবিক তাৎপর্যের এ-দিকটাকে অবহেলা করে যান। বরঞ্চ 'হিন্দুধারা' ও 'মুসলিম ধারা'র অনুসন্ধান করে লোকসংগীতের এই সবল ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করে পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেন।

কিন্তু মাটির ঢিপি আর কাঠের ছবি বা জিন ফেরেশতার শাসন সমাজে আজও অব্যাহত হয়ে রইল। কারণ সামন্ত সমাজেরই ক্ষুধিত পাষাণের উপর গজিয়ে উঠল বিদেশী মূলধনের মুৎসুদ্দীদের মোতিমহল। এখানে এ-আলোচনায় ঢুকতে চাই না।

বাউলদের মানবতাবাদ হয়তো আজকের সমস্যা সমাধানের পথে সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট ব্রণের উপর অস্ত্রোপচারে অসমর্থ। সেজন্য চাই জনতার শ্রেণীসংগ্রামের নতুন জীবনদর্শন। কিন্তু আমাদের পল্লীকবিদের বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের উপরেই গড়ে উঠবে এই নতুন জীবনবেদ।

শ্রীহট্টের লোকসংগীতের সুরবিচার

॥ এক ॥

শ্রীহট্টের লোকসংগীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি? বাংলা দেশের অন্যান্য স্থানের লোকসংগীতের সঙ্গে এর কোনো সুরগত পার্থক্য আছে কি না,—সে সম্পর্কে ব্যাকরণ-সম্মত আলোচনা করুন—প্রশ্নটি এই পুস্তক প্রণেতা অধ্যাপক ডাঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয়ের। শ্রীহট্টবাসী না হয়েও শ্রীহট্টের ইতিহাস ও লৌকিক ঐতিহ্যের গবেষণায় যে নিষ্ঠা ও অনুরাগ তিনি দেখিয়েছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। শ্রীহট্টের গীত রচনার ধারার বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন। আমার উপর ভার পড়েছে—তার সাঙ্গীতিক দিক নিয়ে আলোচনা করবার; যদিও জানি, ভাবকে বাদ দিয়ে ভঙ্গীর আলোচনায় একপেশে হবার ভয় থাকে।

শ্রীহট্টের সুর বলে কি কোনো সুর আছে? বাংলা দেশকে যদি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করি সুরের দিক থেকে—তাহলে বলতে পারি, পূর্ববঙ্গ ভাটিয়ালী-প্রধান, উত্তরবঙ্গ ভাওয়াইয়া-প্রধান এবং মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ বাউলপ্রধান। কিন্তু ভাটিয়ালী-প্রধান পূর্ববঙ্গকে আবার সূক্ষ্ম সুর-বিচারে মোটামুটি জেলাগত অনু-বিভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা যারা পূর্ববঙ্গের সুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, সেই অঞ্চলের গান শুনলেই অমক ঢঙটা ময়মনসিংহের, অমুক ঢঙটা ত্রিপুরার, অমুক ঢঙটা শ্রীহট্টের—ইত্যাদি বলতে অভ্যস্ত। কী পদ্ধতিতে এই ভাগটা করে থাকি? কোনো বৈজ্ঞানিক রাগবিশ্লেষণে মোটেই নয়,—কেবলমাত্র 'তৈরী কান' দিয়ে। কোনো বিশেষ ঢঙ, বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ গায়কীতে এমনি একটা আঞ্চলিকতা মিশে থাকে এবং তা শুনতে-শুনতে এমনি অভ্যস্ত হয়ে যাই যে এই সুর-বিচারে কোনো দিন বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের চেষ্টা করিনি। কাজেই, এই স্বভাব-স্বীকৃতিগুলোকে ব্যাকরণ-সম্মত আলোচনায় দাঁড় করানো সত্যি অতি দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া, গান গেয়ে দেখানো যেমন সহজ, লিখে—এমনকি স্বরলিপি করেও তা প্রমাণ করা তেমন সহজ নয়। স্বরলিপিতে পল্লীসংগীতের ঢঙ ও শ্রুতির মাধুর্য কোনোদিনই ধরা পড়ে না।

সকলেই জানেন, সাতটি পূর্ণস্বর এবং পাঁচটি অর্ধস্বরের যোগ-বিয়োগের টানা-পোড়েনে সমগ্র বিশ্বসঙ্গীতের ধ্বনিতরঙ্গের চিত্র-বিচিত্র নক্সা ধরা পড়েছে। মানব-সভ্যতার বহু শতাব্দীর বিবর্তনের পর মানুষের কণ্ঠ এই বারোটি

স্বরকে আয়ত্তে আনতে পেরেছে। আজো অধিকাংশ লোকসংগীত ঔড়ব-জাতীয়—অর্থাৎ পঞ্চস্বরী, পঞ্চস্বরিক। বাংলার লোকসংগীতের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের একটি বড় কারণ এই যে, কড়ি-মধ্যম ছাড়া সমস্ত স্বরেরই প্রয়োগ এতে পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী ঠাটেও কড়ি-মধ্যম ছাড়া সব কটি শুদ্ধ ও কোমল স্বরের ব্যবহার আমরা পাই। ভাটিয়ালার সর্বজনীন রূপটি হলো,

সা	রা	মা	মা	-া	পা	পা	ধা	ণধা	-পা
আ	মি	ব	ন্ধু	র্	প্রে	মা	গু	নে	০

ণধা	পমা	পা	মা	-গা	-রা	সা	-ণ্া	-ধ্া
পো	ড়া	স	ই	০	০	গো	০	০

ধা	সা	সা	-া	রা	গা	রা	-া	গা	রা	সা
আ	মি	ম	র্	লে	পো	ড়া	স	নি	তো	রা

ভাটিয়ালীর অবরোহণে পা মা গা রা সা ণ্া ধ্া—মুদারার পঞ্চম থেকে উদারার কোমল নিখাদে নেমে ধৈবতে যে বিরাম—ভাটিয়ালীর 'পকড়' বা প্রাণ সেখানেই। সমস্ত পূর্ববঙ্গের প্রাণ-ভোমরার এটাই হলো ফটিক মিনার। এই ভাটিয়ালীরই deflectional changes, আরোহণ-অবরোহণের বহু রকম-ফেরেরই এক একটি বিশেষ ভঙ্গী আঞ্চলিকতার সৃষ্টি করেছে। তার উপর, গায়কীর আঞ্চলিকতা তো আছেই, যদিও জেলায়-জেলায় ভৌগোলিক সীমান্তের মতো স্বরের ধারার সীমান্ত-রেখা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়। ভাষার উচ্চারণে এবং intonation-এ আঞ্চলিকতা তো আছেই। যেমন, উপরের গানটি গাইবার সময় শ্রীহট্টের গ্রাম্য গায়ক গাইবেন,

আমি বন্দের প্রেমাগুনে পুরা,—
সইগ', আমি মইলে পুরাস নি তরা॥

শ্রীহট্টের ভাটিয়ালীর একটি সাংগীতিক বিশেষত্ব আছে। ভাটিয়ালীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে। তার আদিম রূপটি ছিল—বাস্তবজীবনের ব্যথা ও কথা, নদী ও নৌকা, প্রকৃতি ও প্রেম। পরে এলো দার্শনিকতা: নদী হলো জীবন-নদী, নৌকা হলো দেহ-তরী। তেমনি সুরের ক্ষেত্রেও ক্রমবিবর্তন আছে। প্রথমে সারি, পরে ভাটিয়ালী। যূথবদ্ধ সমাজের যূথবদ্ধ সংগীত। একক গানের পূর্ণ পরিণতি লাভ ঘটেছে অনেক পরে। একক ভাটিয়ালীর তান-কর্তব সারিতে থাকতে পারে না। এখনো চতুস্বরিক সারিগান

শুনি—"উড়ে উড়েরে বগুরায় উড়ে গাঙ্গে' শ্রীহট্টের একটি অতি-প্রচলিত ভাটিয়ালী গান—

কালো মেঘে সাজ কইর‍্যাছে,
পরান তো মানে না ;
সাবধানে চালাইও তরী—
নাও যেন ডুবে না
বা' নাইয়া, নদীর কুল পাইলাম না ॥

সা	সা	রা	জ্ঞা	-মা	-জ্ঞা	-রা	-সা
কা	লো	মে	ঘে	০	০	০	০

সা	-রা	গা	-মা	গা	রা	-সা	-া
সা	জ্	ক	ই	রা	ছে	০	০

সা	গা	-া	গা	মা	পা	মা	-গা	|
প	রা	ন্	তো	মা	নে	না	০	|

গা	মা	ধা	ণা	-র্সা	-ণা	-ধা	-পা	|
সাব্	ধা	নে	চা	০	০	০	০	|

পা	-ণা	ধা	ণা	-ধা	-পা	গা	মা	ধা	-পা	|
লাই	ও	ত	রী	০	০	নাও	যে	ন	০	|

পা	মা	গা	সা	সা	-া	-গা	|
ডু	বে	না	বা	না	ই	য়া	|

পা	মা	-া	মা	-গা	গা	-রা	সা	-া	|
না	দী	র্	কু	ল্	পা	ই	লা	ম্	|

গা	-রা	-সা	|
না	০	০	|

এখানে মেঘ-এর 'ঘ'-এর উপর আন্দোলায়িত কোমল গান্ধার এবং চালাইও-র 'চা'-তে দীর্ঘায়িত কোমল নিখাদের আবেশে এমনি এক উদার মাধুর্য সৃষ্টি করে—যা একেবারে শ্রীহট্টের নিজস্ব বলে দাবী করতে পারি। ভাটিয়ালীর মুক্তগতি তাল সহ্য করতে পারে না ; এ গানটিও তালহীন। সে দিক থেকেও এখানে ভাটিয়ালীর পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়েছে।

তালে ফেলে গাইলেও রাধারমণের—

রাই-বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না,—

মইলো, গো রাই কাঁচা সোনা…

এখানে 'মইলো' শব্দটি

ধা	-পা	-মা	-গা	-পা	ধা	-পা	-মা	-গা	রা	সা	-ন্া
ম	০	০	০	ই	লো	০	০	০	গো	রা	ই

ন্া	সা	সা	গা	-সা	-রা	সা
কাঁ	চা	সো	না	০		

ধৈবত থেকে নেমে আবার ধৈবতে উঠে, ঝটকা মেরে নীচে নেমে আসার ঢঙটি শ্রীহট্টের একটি বৈশিষ্ট্য।

শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমায় এবং ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে ভাটিয়ালীর সুরের একটি বিশেষ ঢঙ পাওয়া যায়—যাতে আছে উত্তরাঙ্গে টপ্পার কম্পনে এক অদ্ভুত প্রাণবন্ত প্রকাশভঙ্গী। যেমন,

বড়ো দুঃখের দুঃখী আমি ও গুরু,

ভবে কেউ নাই আপনার—

শ্রীচরণে এই নালিশ আমার ॥

পা	পা	পা	পা	ধা	-সা	-র্জ্ঞা	-র্রা	-র্সা	-া
আ	মি	ব	ড়ো	দুঃ	খে	০	০	০	০
-ণা	-া	-ধা	-া	-পা	-া	পা	পা	ধা	ণা
০	০	০	০	০	র্	দুঃ	খী	আ	মি
ণা	-ধা	-পা	-মা	-ধা	-পা	মা	পা	ধা	-া
ও	০	০	০	০	০	০	গু	রু	০
পা	পা	-মা	মা	-ধা	পা	-মা	সা	রা	
ভ	বে	০	কে	উ	না	ই	আ	প	

সা	-ণ্া	-ধ্া।
না	০	র

॥ দুই ॥

শ্রীহট্টের লৌকিক ঐতিহ্যে ধর্মের দিক থেকে দুটি প্রধান ভাবধারা প্রবহমান। একটি বৈষ্ণব, অপরটি সুফী। অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক এ-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। সুরের ছন্দ ও ভঙ্গীতে বৈষ্ণব ধারাটি হল মূলতঃ বিলম্বিত মীড়-আশ্রয়ী এবং তা লীলায়িত; অনুগামী বাদ্যযন্ত্র—একতারযুক্ত 'লাউয়া' বা 'লাউ'। সুফী ধারাটির সুর প্রধানতঃ গতিপ্রধান, কাটা-কাটা ঝটকা দেওয়া, ত্রিমাত্রিক ছন্দ; অনুগামী যন্ত্র—দোতারা ও খমক। বৈষ্ণব-ধারার লীলায়িত চলনের মধ্যে সুফী-ধারাটি নিয়ে এল এক গতির আবেগ। এই দুটি ধারাকে অনেকে হিন্দু-ধারা ও মুসলমান-ধারা বলে আখ্যা দেন। কিন্তু আমার মনে হয় তা ভুল। কারণ, এই দুটি ধারারই প্রগতিশীল সামাজিক মুখ্য ভূমিকা ছিল—হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত ভাবধারা, এক মিলিত সংস্কৃতি গড়ে তোলায়। হিন্দুর গুরু, মুসলমানের মুরশিদ; হিন্দুর রাধাকৃষ্ণ, মুসলমানের আশিক মাশুক মিশে গেছে।

ভাবাদর্শে যেমন, ঠিক তেমনি সুরের ক্ষেত্রে হিন্দু সুর ও মুসলমান সুর বলে ভাগ করাটা হবে অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। পশ্চিমবঙ্গের বাউলের ছন্দের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সুফীগানের খুব মিল। বাউলগান নৃত্যসম্বলিত : বাদ্যযন্ত্র—ডুগি ও খমক। কাজেই, বাউলের গানেও আছে কাটা-কাটা ত্রিমাত্রিক ছন্দ। সে বাউল গান শ্রীহট্টে কিংবা ত্রিপুরা-ময়মনসিংহে যখন ভাটিয়ালী সুরের প্রভাবে দেহতত্ত্ব-'বাউলা' গানে রূপান্তরিত হলো তখন দেখি—ভাব এক হয়েও ভাটিয়ালীর ঢিমে টানা-টানা লয়ে তার প্রকাশভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পালটে। ঢাকার বিখ্যাত নরসিন্দী বাউলেরা ব্যবহার করেন 'সারিন্দা'। এই ছড়-টানা তারের যন্ত্রের টানে-টানে পশ্চিমবঙ্গের বাউল-সম্প্রদায়ের নাচের ছন্দ একেবারেই হারিয়ে গেল।

শ্রীহট্টের সুফীদের 'মারিফতী' গানে প্রায় পশ্চিমবঙ্গের বাউলের ছন্দ। শ্রীহট্ট মারিফতীদের পীঠস্থান। শ্রীহট্ট শ্রীগৌরাঙ্গের দেশ। কিন্তু, শ্রীহট্টের বিশেষত্বকে বোঝাতে গিয়ে আমরা প্রায়ই বলি 'শাহ্‌জালালের মাটি'। 'তিনশো ষাট আউলিয়ার দেশ' বলে শ্রীহট্টের খ্যাতি। শ্রীহট্ট জেলায় বৈষ্ণবের আখড়ার চেয়ে পীরের 'মোকাম' বা 'দরগা' অনেক বেশী। পূর্ববঙ্গে বহু ফকির-কবির জন্ম হয়েছে, তাঁদের উপর শাহ্‌জালালের প্রভাব অসামান্য। আজো শাহ্‌জালালের জন্ম-বার্ষিকীতে—'উরসে শাহ্‌জালাল' দিবসে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রীহট্টের শাহ্‌জালালের দরগায় অসংখ্য পীর-আউলিয়ার সমাগম হয়ে থাকে—

পশ্চিমবঙ্গে ঠিক যেমন জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলীতে প্রতিবৎসর বাউল-সম্প্রদায়ের সমাবেশ হয়। পীর শাহ্‌জালালের ঐতিহ্য বহন করে এযুগে শ্রীহট্টে আকবর আলী, আরকুম শাহ্‌, ইরপান, উম্মর পাগল, মজাইদ চান্দ, শেখ বানু (ভানু), হাছন রজা প্রভৃতি শ্রীহট্টের লোকসংগীতে এক অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্যশালী গীতি-ধারার সৃষ্টি করেছেন। শেখ বানু (ভানু)-র "নিশীথে যাইয়ো ফুলবনে রে ভমরা" কথান্তরিত হয়ে অন্য নামে রেকর্ড করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন, তখন মরমী কবি হাছন রজার রচনায় মুগ্ধ হয়ে "হাছন-উদাস"-এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে অতি যত্নে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায় (Religion of Man) পূর্ববঙ্গের কোনো গ্রাম্য কবির দার্শনিকতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হাছন রজার "আমার আঙ্খি হৈতে পয়দা হৈল আশমান-জমিন্" এই গানটির উল্লেখ করেন।

আমরা এই গানগুলোকে এক কথায় 'মুরশিদী' এবং কোনো কোনো সময় 'মারিফতী' গান বলে থাকি। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল সহ শ্রীহট্টের এই 'মুরশিদী' গানের সুরের একটি বিশেষ ঢঙ আছে। উত্তরবঙ্গের 'চটকা'-র সঙ্গে সুর ও ছন্দে এর খুব সাদৃশ্য রয়েছে। হাছন রজার একটি বিখ্যাত গানকে নমুনা হিসেবে নেওয়া যাক : "লোকে বলে, বলে রে, ঘর-বাড়ী ভালা না আমার"—

(দ্রুতলয়ে গেয়)

		|	+		
া	সা	ন্‌া	সা	রা	-া
০	লো	কে	ব	লে	০
		|	+		
-া	-া	-া	পা	পা	-া
০	০	০	ব	লে	০
		|	+		
মা	-গা	-া	বা	-া	রা
রে	ে	০	ঘ	র্	বা
		|	+		
মা	মা	-গা	রা	-পা	-া
ড়ী	ভা	০	লা	০	০

		|	+		
রা	সা	-া	সা	-া	-া
না	আ	০	মা	০	র্

এই সঙ্গে 'চটকা'-র একটি উদাহরণ নেওয়া যাক : "ওকি মাই গে মাই, মোর মতন সতী নারী নাই,"—

		|	+		
·া	পা	পা	মা	-পা	-া
০	ও	কি	মা	ই	০
		|	+		
মা	-জ্ঞা	-া	রা	-া	০
গে	০	০	মা	ই	০
		|	+		
-া	-া	-া	রা	-া	মা
০	০	০	মো	র্	ম
		|	+		
মা	মা	-গা	রা	গা	-া
তন্	আ	র্	স	তী	০
		|	+		
রা	সা	-া	সা	-া	-া
না	রী	০	না	ই	০

মুরশিদী গানের সমে-সমে ঝুঁকি দিয়ে গাইবার ঢঙটি ঠিক 'চটকা'র ঢঙের সঙ্গে মিলে যায়। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেটি হলো একই স্বরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে দ্রুতগতিতে গানের প্রথম সারির কিছু কথা এমনিভাবে বলে যাওয়া,—যা হঠাৎ গানের তাল ও সুরের বাইরে সংলাপের মতো মনে হয়। যেমন,

চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই'
মোরে কইলায় বন্ধ;
বন্ধু, নির্ধনীয়ার ধন,
কেমনে পাইমু রে কালা,
তোর দরিশন॥

আরকুম শাহের এই বিখ্যাত গানটি গাইবার সময় "চাইর চীজে পিঞ্জিরা

বানাই"—এই কথাগুলো একই সঙ্গে একস্বরে আবৃত্তি করে 'মোরে'-র উপর ঝুঁকি দিয়ে গান আরম্ভ করতে হয়।

লৌকিক ঐতিহ্যের সমষ্টি-রচনা থেকে যখন ব্যষ্টি-রচনার যুগ এল, তখন ব্যক্তি-বিশেষকে অবলম্বন করে অনেক সময় গায়কীর স্টাইলও প্রচলিত হতে লাগল। যেমন, এ যুগে ময়মনসিংহে জালালুদ্দীন ও দীন শরতের একটি বিশেষ স্টাইল চালু আছে; তেমনি, শ্রীহট্টেও রাধারমণ, হাছন রজা প্রভৃতির নামে বিশেষ গায়কী আখ্যা পেয়ে আসছে।

॥ তিন ॥

শ্রীহট্টের লোক-সংস্কৃতিতে মেয়েরা এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন। ভারতের প্রতি প্রদেশের প্রতিটি জাতির লোক-নৃত্য ও সংগীতে একান্তভাবে মেয়েদের একটি বিশেষ অবদান লক্ষণীয়। পাঞ্জাবের গিদ্দা, গুজরাটের গর্বা থেকে শুরু করে আসামের আইনাম, বিয়ানাম প্রভৃতি মেয়েলী ব্রত. বিবাহগীতি, ঘুম পাড়ানিয়া গান ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ও প্রয়োজনে ভারতীয় লৌকিক ঐতিহ্যে মেয়েরা যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, তার সঠিক মূল্যায়ন আজো হয়নি। মেয়েলী গান বা মেয়েলী আচার বলে তাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে এর যে বিরাট সামাজিক মূল্য—তার যথার্থ স্বীকৃতি আমরা দিইনি। আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের আচার-বিচার, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যেমন ধরে রেখেছেন, তেমনি লোকসংগীতেও দেখি—আমাদের মেয়েরা প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। গোষ্ঠী-রচনার স্বতঃস্ফূর্ততা, সহজ কথা ও সুরের আবেদন, ঐহিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও সমাজমুখিনতার যে-বৈশিষ্ট্যে মেয়েলী ধারাটি উজ্জ্বল—লোকসংগীতের অন্যান্য ধারায় তা বিরল।

বাংলার প্রতি জেলায় মেয়েরা সেখানকার আঞ্চলিক ছড়া, ব্রত ইত্যাদিতে একটি জেলাগত স্বকীয়তার সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীহট্টের স্থান বিশেষ উল্লেখ্য। লৌকিক নৃত্যে বাংলা দেশ অত্যন্ত দীন। যাও বা ছিল, তাও লুপ্তপ্রায় বা বিকৃত। কিন্তু শ্রীহট্টের মেয়েরা এক প্রাণবন্ত নৃত্য-ধারাকে প্রবাহিত রেখেছেন তাঁদের 'ধামাইল' নৃত্যে।

সেই ধামাইল নৃত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে জড়িত আছে ধামাইল গান। শ্রীহট্ট জেলার এ একান্তই নিজস্ব জিনিস। বাংলার লোকসংগীতে বৈরাগ্য ও বিচ্ছেদের অন্তর্লীন ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু, ধামাইল গান ভাবের দিক

থেকে মূলতঃ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হলেও, সুরে ও ছন্দে তা বিরহ-বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যকে অতিক্রম করে পার্থিব উল্লাসে ভরপুর। জন্ম, বিবাহ বা কোনো উৎসব প্রভৃতির আনন্দলগ্নে ধামাইল নাচ ও গানে গ্রামের মেয়েরা সমবেত হন। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমবেত করতালি গভীর রাত্রির নীরবতাকে ছন্দিত করে তোলে বিভিন্ন লয়ে। আর একটি বড় জিনিস—সমকালীন ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি অবলম্বন করেও মেয়েরা impromptu গান মুখে-মুখে রচনা করে ফেলেন।

ধামাইল গান নৃত্যাবলম্বী। কাজেই, গানের scansion বা ছন্দ-বিভাগে স্বরাগ্রে ঝোঁক প্রাধান্যই তার বৈশিষ্ট্য। যেমন,

(আমি) কী হেরিলাম | জলের ঘাটে | গিয়া না | গরী গো |
হেরি মুখ | চান্দে | পড়িয়াছি | ফান্দে |
প্রাণপাখী | কান্দে রইয়া | রইয়া না | গরী গো | ···

ধামাইলের বহু রূপ আছে। কিন্তু, সুরের দিক থেকে তা মূলতঃ ভাটিয়ালীর ঠাটের ভিতরেই। তবে, ভাটিয়ালীর টান বা মীড়ের আন্দোলন না থাকাতে প্রকাশভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পালটে।

শ্রীহট্টের মেয়েদের আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হল—বিয়ের গান। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই বিবাহ উপলক্ষে গান আছে। কিন্তু, শ্রীহট্টে কন্যা-দেখা, মঙ্গলাচরণ, পানখিলি, জলভরা, অধিবাস, সোহাগমাগা, দধিমঙ্গল, বিবাহ, কন্যাযাত্রা—প্রত্যেক পর্বে-পর্বে এমন গানের লহরী বাংলাদেশের অন্য কোথাও আছে বলে জানি না।

পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আসামের 'বিয়ানাম'-এ শুধু এমনিতরো ঐশ্বর্যশালী বৈচিত্র্যের সন্ধান পাই। শ্রীহট্ট জেলায় বিয়েতে ধামাইল অপরিহার্য হলেও শুধু বিবাহ-অনুষ্ঠান অনুসারে যে বিশেষ গানের ধারা তাতে সুরের দিক থেকে কোনো-কোনো গানে এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার সন্ধান পাওয়া যায় : সেখানে অসমীয়া 'বিয়ানাম'-এর সুস্পষ্ট ছাপ।

ঐতিহাসিক বিচারে শ্রীহট্টের তদানীন্তন (লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তীয়া রাজ্যের) একটি বড় অংশ আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কোচরাজাদের অধীনে ছিল। তা ছাড়া, আধুনিক যুগেও বৃটিশ শাসনাধীনে থাকা কালে শ্রীহট্ট ভাষা ও সংস্কৃতিতে

বাঙালী হয়েও চিরদিন আসামের ভৌগোলিক অংশ হয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের সেই আক্ষেপ,

মমতা বিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি ॥

শ্রীহট্টের কথ্য ভাষা এবং গানের সুরেও তাই অসমীয়া প্রভাবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু, লক্ষণীয় যে, শ্রীহট্টের মেয়েলী গানেই শুধু এই অসমীয়া প্রভাব পরিস্ফুট। একটি 'কন্যা-বিদায়'-এর গানকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যাক,

আম-ঘট সারি সারি,
শুভ-যাত্রা করইন গৌরী ;
যাইবাইন গৌরী কৈলাসে—
মা, দেশে যাইতে ॥

সা জ্ঞা -রা -সা সা -রা সা -ণ্া সা গা -মা -পা
আ ম ০ ০ ঘ ০ ট ০ সা রি ০ ০
মা গা -া গা মা -পা দা -া পা -মা
সা রি ০ শু ভ ০ যা ০ ত্রা ০
মা পা -া মা গা গা মা পা
ক র ইন্ গৌ রী যাই বা ইন্
দা পা মা জ্ঞা -া রা -া সা -ন্া
গৌ রী কৈ লা ০ সে ০ মা ০
সা গা -মা পা -মা গা
দে শে ০ যা ই তে

এবার একটি অসমীয়া বিয়ের গান নেওয়া যাক—

অরণ্যর মাজতে কি পহু কান্দিলে—
কি চরাই জুড়িলে রাও হে ॥

পা পা মা জ্ঞা জ্ঞা -মা পা মা
অ র ণ্য র মা ০ জ তে

মা	মা	-গা	মা	মা	-জ্ঞা	সা	সা		
কি	প	০	হু	কা	ন	দি	লে		
পা	পা	দা	পা	পা	মা	জ্ঞা	-মা	-পা	মা
কি	চ	রাই	জু	ড়ি	লে	রা	০	ও	হে

দুটি গানই কন্যা-বিদায়ের। দুটি সুরেই এক সেন্টিমেণ্ট এবং সুরের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ও লয়ের বেদনাময় গতি। এই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের স্বর-বিচারে এক নতুন দিগ্বলয়ের সন্ধান দেয়।

॥ চার ॥

শ্রীহট্টের লোকসংগীতে রাগের প্রভাব আর একটি আলোচ্য বিষয়। "লোক-সংগীতে রাগের প্রভাব"—এ কথাটিকে ঘুরিয়ে "রাগসংগীতে লোকসংগীতের প্রভাব" বললেই ঠিক হয়। সংগীত যেদিন একটি আদিম মানবগোষ্ঠীকে আশ্রয় করে প্রথম বিকশিত হয়েছিল—সেদিন সংগীতের ছিল একটি সামগ্রিক গোষ্ঠীগত রূপ। তাকে 'লোকসংগীত' বা 'রাগসংগীত' প্রভৃতি নামে ভাগ করার প্রশ্নই উঠত না। একটি সুর একটি গোষ্ঠীর বা উপজাতির সুর হিসেবেই পরিচিত ছিল। গোষ্ঠী-সমাজ থেকে আজকের nationhood-এ যে বিবর্তন—লোকসংগীত ও রাগসংগীতের বিবর্তনের ইতিহাসও তার সঙ্গে জড়িত। গোষ্ঠী, খণ্ড-জাতি, উপজাতির রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় গ্রন্থিবন্ধনে যেমন জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে—রাগসংগীতও তেমনি বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সুরকে অবলম্বন করে একটা সর্বভারতীয় আকার ধারণ করেছে। আজো বহু ভারতীয় রাগ-রাগিণীর নামকরণে এর সাক্ষ্য মেলে। 'আভীরী', 'সাবেরী', 'মালবী', 'কানাড়ী', 'পাহাড়ী', 'মাঢ়' প্রভৃতি জাতির নামের সঙ্গে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নামকরণ এই সত্যকেই পরিস্ফুট করে। আমাদের দেশের বিভিন্ন সংগীত প্রবক্তারাও এ কথা স্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে লোকসংগীতের ধারাটিও সমান্তরালভাবে প্রবহমান,—যদিও সে ধারাটি নিজ-নিজ আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমারেখায় প্রবাহিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে—একটি কেন্দ্রানুগ, আর অন্যটি কেন্দ্রাতিগ। কিন্তু, ঐতিহাসিক বিচারে দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। রাগসংগীত যেমন কেন্দ্রমুখী, লোকসংগীত তেমনি বিকেন্দ্রিক স্বকীয়তায় ও আঞ্চলিকতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকলেই বেঁচে থাকবে। এর মধ্যে যাঁরা বিরোধিতা দেখেন, তাঁরা

আধুনিকতার নামে জাতি-বিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারাটিকেই অস্বীকার করেন। পূর্বেই বলেছি, এই দুটি ধারাকে আপাতবিরোধী বলে মনে হলেও তারা পরস্পরের পরিপূরক। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, লোকসংগীতের ধারাটি একটি নিছক one way road। রাগসংগীত যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক সুরকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি আবার রাগসংগীতও লৌকিক ধারাটির উপর তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এই আদানপ্রদানের মধ্যে বাধার কোনো কঠিন প্রাচীর নেই। কাজেই আমরা যখন কোনো-কোনো লোকসংগীতে রাগের প্রভাব পাই, তখন বলা মুশকিল—সেটা সেই অঞ্চল থেকেই উদ্ভূত, অথবা উপর থেকে আসা রাগসংগীতের প্রভাব। বাংলার কোনো-কোনো লোকসংগীতে রাগ-সংগীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। ঝিঁঝিট, দেশ, ভৈরবী, ভীমপলশ্রী, ভূপালী, বিভাস প্রভৃতি রাগের স্পর্শ বাংলার লোকসংগীতকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে।

অবশ্য, গ্রাম্য-জীবনে বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী একটি ধারা এবং লৌকিক ধারা পাশাপাশি অবস্থান করে চলেছে। যাত্রাগানের বিবেকের সুর যেমন বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী, তেমনি পূর্ববঙ্গে দ্বিজদাস, মনমোহন প্রভৃতি লোক-কবির গানগুলোও বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী। এগুলো গ্রাম্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হলেও লোকসংগীতের পর্যায়ে পড়ে না। লোকসংগীতে যেখানে রাগের ছাপ পড়েছে, সেখানে রাগের স্পর্শ থাকা সত্বেও লোকসংগীতের মৌলিক চরিত্রটি বদলায়নি। এই সীমারেখাটি অতি সাবধানে টেনে সুরের মূল্যায়নে আমাদের এগুতে হবে।

শ্রীহট্টের লোকসংগীতেও দেশ, ভূপালী প্রভৃতি রাগের ছায়া বহু গানে পাওয়া যায়। কোনো-কোনো গানে তা খুবই স্পষ্ট: আবার কোনো গানে তা শুধু ছায়া ফেলে মৌলিক ভাটিয়ালীর স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ থাকলেও আমি মাত্র দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ নিবন্ধ শেষ করব।

শ্রীহট্টে, বিশেষতঃ হবিগঞ্জ মহকুমায় একটি সুর প্রচলিত আছে, যাকে শাস্ত্রীয় সংগীতে বলা হয় বাংলা-বিভাস।

দেহ-তরী ছাইড়া দিলাম
ও গুরু, তোমার নামে—॥

সা	সা	সা	রা	গা	পা	ধা	র্সা	র্সা	-া
দে	হ	ত	রী	ছাই	ড়া	দি	লাম্	ও	•

-র্রা	-র্সা	-ধা	-পা	-ধা	-পা	-গা	-রা

গা	মা	-গা	-রা	-সা	ধ্‌া	সা	রা	গা
গু	রু	০	০	০	তো	মা	রো	না
গা	-রা	-সা						
মে	০	০						

আর একটি গানের প্রথম কলিতে শুদ্ধ দেশ রাগের সব কটি পর্দারই ব্যবহার পাই—

আছে শ্যাম-অঙ্গে রাই-অঙ্গ হেলাইয়া গো,
শ্যাম-অঙ্গে রাই-অঙ্গ হেলাইয়া ॥

সা	সা	রা	-া	মা	মা	মা	-পা	ধা	র্সা
আ	ছে	শ্যা	ম্‌	অং	গে	রা	ই	অং	গ
ণা	ধা	-পা	ধা	পা	-মা	-গা	-রা		
হে	লা	ই	য়া	গো	০	০	০		
রা	-া	রা	মা	মা	-গা	রা	গা	-া	
শ্যা	ম্‌	অং	গে	রা	ই	অং	গ	০	
রা	সা	সা	-া						
হে	লা	ই	য়া						

শ্রীহট্টের 'হোরীগান' বলে প্রচলিত বসন্ত-উৎসবের উল্লসিত লোকসংগীতের সুরের মধ্যে অবরোহণে ললিত-এর রেশ এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে—

আজ হোরী খেলব
রে শ্যাম, তোমার সনে ;
একেলা পাইয়াছি—
হেথা নিধুবনে ॥

I সা -া সা । সা -া । সা -া I সা জ্ঞা -রা । সা -রা । সা -না I
আ ০ জ হো ০ রী ০ খেল্‌ ব ০ রে ০ শ্যা ম্‌

I সা -া -া । গা গা । গা -মা I পা -া -া । -া -দা । -পা -মা I
তো ০ ০ মা র স ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা -া । পা -া । দা -পা I মা জ্ঞা -া । রা -া । সা -া I
এ কে ০ লা ০ পা ই য়া ছি ০ হে ০ থা ০

I ন্‌া -া -া। সা -া। রা -সা I ন্‌া -া দ্‌া। প্‌া -া। -া -া I
নি ০ ০ ধু ০ ০ ০ ব ০ ০ নে ০ ০ ০

গান শুরু হয় বিলম্বিত তেওরায় ; ক্রমশঃ লয় বাড়তে বাড়তে দাদরা ও কাহারবা তাল-ফেরে—দ্রুত কাহারবায় সমাপ্তি টানা হয়। একদিকে সুরের ধ্রুপদী বিন্যাসে এবং লয়ের তাল-ফেরের চলনে, আবার অন্যদিকে সাধারণ লোকের সমবেত কণ্ঠের সহজ অভিব্যক্তিতে এই গানগুলো এমন এক সামগ্রিক লৌকিক রূপ ধারণ করেছে যে, লোকসংগীতে রাগের সাবলীল মিশ্রণের এ রকম দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কয়েক বৎসর আগে. কলকাতার শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে আমরা যখন এ গানটি উপস্থিত করি, অনেকে—এমনকি কিছু সমজদার সংগীতজ্ঞও এটিকে লোকসংগীত বলে মেনে নিতে চাননি।

আমি পূর্বেই বলেছি, আমাদের পল্লী-সংস্কৃতিতে একটি অনাবিল রাগ-সংগীতের ধারাও বিদ্যমান ; কিন্তু, এই হোরীগানের ধারাটি তার সব কাছা-কাছি থাকলেও এই ধারাটি উপর থেকে নয়, জনসাধারণের ভিতর থেকে উৎসারিত।

এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভুল নিশানা হলো গায়কী। কয়েক বৎসর পূর্বে পূজ্যপাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপের সুযোগ পেয়েছিলাম। পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরাজেলার মাটির সুরের কোলে জন্ম নিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মিনারচূড়ায় যিনি আরোহণ করেছেন, এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সেদিন আমার কাছে লোকসংগীতের একটি নতুন দিক খুলে দিল। কথাচ্ছলে তিনি বলছিলেন তাঁরই ছোটবেলাকার মাঠে ময়দানে গাওয়া একটি গানের কথা—যে গানটি ছোটবেলায় আমরাও গেয়েছি : "নিরলে কইয়ো গিয়া বন্ধুয়ার লাগ পাইলে।"

এই গানটি একই সুরে দুই গায়কীতে গেয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ অভি-ব্যক্তিতে বললেন, "এক গায়কীতে এটি লোকসংগীত, আবার অন্য গায়কীতে একেই উচ্চাঙ্গসংগীতের শ্রেণীতে ফেলা যায়।"

॥ পাঁচ ॥

এই ছোট্ট নিবন্ধটি শেষ করার আগে দুটি কথা বলতে চাই। লোকসংগীত নিয়ে আলোচনার পরিধি যদিও তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে, তবুও সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাব্যিক দিক নিয়ে আলোচনার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। লোকসংগীতের সাংগীতিক বিচার নিয়ে কোনো আলোচনা প্রায় চোখেই পড়ে

না। যাঁরা ভারতীয় রাগ-রাগিণী নিয়ে সার্থক গবেষণা করেছেন তাঁদের দরদী দৃষ্টি থেকে লোকসংগীত প্রায় বঞ্চিত। অবশ্য জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় না থাকলে এবং একই অঞ্চলের লোকসংগীতের বিচিত্র বিন্যাস সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা না থাকলে, দূরে বসে কয়েকটি সংগৃহীত স্বরের বিশ্লেষণে তাঁদের আলোচনা একপেশে হবার ভয় থাকে। যাঁরা রাগসংগীত ও লোকসংগীত দুটি ধারার সঙ্গে সমানভাবে ঘনিষ্ঠ সেরকম গুণী ডুবুরীর সম্মুখে আমাদের লোক-সংগীতের বিরাট সমুদ্র আজও অবারিত ও অনাবিষ্কৃত। ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে আমি এই আলোচনার উপযুক্ত মনে করি না। তাছাড়া বিশেষ একটি জেলাতে সীমাবদ্ধ থাকায় আমার কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তবু এই ক্ষুদ্র আলোচনা যদি উপযুক্ততরদের উৎসাহিত করে তবে তা সার্থক।

দ্বিতীয়তঃ, এই আলোচনায় সাহস পেতাম না যদি না আমার অনুজপ্রতিম অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয় আমার ফেলে আসা জেলার সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার চেয়েও উৎসাহী হয়ে না উঠতেন। তাঁর এই অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস পরলোকগত গুরুসদয় দত্তের সংগৃহীত গানগুলি। বৃটিশ সিভিল সার্ভিসের লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত লোকশিল্পের নিদর্শনগুলো ঘরোয়া মিউজিয়ামের ঐশ্বর্য আহরণের শৌখীন আর্ট-সাধনা ছিল না। সাধারণ অবজ্ঞাত মানুষের সুপ্ত প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে গ্রাম-বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগানো ছিল তাঁর কর্মসাধনা। বাংলাদেশে সংগীত বা হস্তশিল্প জীবিত থাকলেও নৃত্য প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছিল। দত্ত মহাশয় ছিলেন বাংলার লোকনৃত্যের পুনরুদ্ধারে পথিকৃৎ। সিভিলিয়ান হিসেবে তাঁর এই কার্যে গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপ করে সেই সময়ের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচার করেছিলেন। কিন্তু, কালের বিচারে গুরুসদয় দত্তের পক্ষে রায় মিলেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানা (শ্রীহট্টের লোকসংগীত, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৬) তারই একটি প্রধান সাক্ষ্য।

আসামের জাতীয় উৎসব বিহু

যা নাই বিহুগীতে তা নাই আসামে। যা নাই আসামে তা নাই বিহুগীতে। আসাম এবং অসমীয়া জনমানসের নির্ভুল দর্পণ বিহু। আসামের পাহাড়-পর্বত, পশুপাখী, নদী-বিল, মাঠপাথার, ফুলফল, বর্ণগন্ধ ও তার মধ্যে কর্মরত নরনারীর এমন প্যানোরামা ভারতের লোকসংগীতে বিরল। বিহুগীতের সাহিত্যিক ও সাংগীতিক ভিতের উপরই দাঁড়িয়ে আছে অসমীয়া সংস্কৃতির উপসৌধটি।

ধর্মপ্রভাবমুক্ত ইহজাগতিকতা ও শ্রমশীল জীবনের প্রতি অসীম মমতা—এই হলো বিহুর দর্শন। আদিম প্রাক্ আর্য উৎসবগুলি, কৃষি সমাজের ঋতু-উৎসবগুলি হিন্দুধর্মের প্রভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক উৎসবে পরিণত হয়েছে। শারদীয়া, দেওয়ালী, হোলি সবই হিন্দুদের উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে, জাতীয় উৎসবের মর্যাদা হারিয়েছে। কিন্তু বহু জাতি, উপজাতি ও ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত আসাম উপত্যকায় বিহুর জাতীয় মর্যাদা দিন দিন ব্যাপকতা লাভ করছে। ধর্মীয় আচার বিচার, দেবদেবী, উপদেবতা বা অপদেবতার উৎপাত থেকে বিহু মুক্ত। বর্ণহিন্দু সমাজের বিধিনিষেধ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই হলো বিহুর প্রধান উপজীব্য। বিহুকাব্যের প্রেম অবাধ, কিন্তু তা দেহবাদী নয়—আদিম যৌথ কৃষি ও শিকারী জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশ করা ঐন্দ্রজালিক কল্পনার ঐতিহ্যে তা মধুর। বিহুর আদিরস কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাগরিক প্রেম নয়, সমষ্টিচেতনার ছন্দে তা সুস্থ ও সজীব।

আসামের রাজরাজড়াদের সুদীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে 'বুরঞ্জী সাহিত্যে'। আসামের গ্রাম্যজীবনের কৃষিসমাজের অবিচ্ছিন্ন অলিখিত ইতিহাস ছড়িয়ে আছে বিহুসাহিত্যে। অথচ সেদিন পর্যন্ত শহর ও গ্রামের অভিজাত-সমাজের কাছে বিহু ছিল 'নিষিদ্ধ অন্ত্যজের অশ্লীল নাচগান'।

বিহুগীতের প্রবহমানতা আজও মৌখিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রত্যেক বিহু-উৎসবের উন্মাদনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন গীতের ফসল। তাতে পাই ধারাবাহিক একটি সমাজের বিবর্তনের পরিচয়।

সামন্ত সমাজ পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিম ট্রাইবাল ও অর্ধ-ট্রাইবাল সমাজে বসুমতীকে উর্বর করার জন্য যুবক-যুবতীর যৌথ নৃত্যগীতের উপর এলো নিষেধাজ্ঞা। প্রণয় ও পরিণয়ের মধ্যে এলো প্রাচীর। কিন্তু সমাজপতিদের

শাসন সাধারণ মানুষ মেনে নেয়নি। জাতিকুল, ধর্মীয় বৈষম্য, নারীপুরুষের সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তির্যক মন্তব্যে বিহুগীত হলো ভরপুর। পল্লীরচয়িতারা শুধু কাব্যের খাতিরে নয়, সমাজপতিদের প্রতিকূলতার জন্যও সোজাসুজি কথা না বলে অনেক সময় বক্রোক্তির এবং দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন :

শিলে বালিচরাই গিলে ঐ লাহরী
শিলে বালিচরাই গিলে
আরুবেলি বিহুখন চাবলৈ নাপালো
মতামহ রখিয়া দিলে।

বালিচরাই অর্থাৎ খঞ্জনী পাখীকে পাথরে গিলছে এটা যেমন উদ্ভট কথা, কোনো মেয়েকে বিহুর সময় ঘরে বেঁধে রাখা তেমনি উদ্ভট কথা। আবার তেমনি আজগুবী কথা কোনো মেয়েকে দুরন্ত মোষের রাখালী করতে দেওয়া। এখানে কোনো পুরুষকে ইংগিত করে মোষ বলে ব্যঙ্গ করাও হতে পারে।

কলীয়া কচুরে শিয়া
জীয়াই থাকো মানে তোমারে তিরোতা
বিহুলৈ পঠিয়াই দিয়া।

বিয়ের পর বিহুনাচ নিষিদ্ধ হওয়াতে স্বামীর কাছে স্ত্রী আবেদন করছে, "যতদিন বেঁচে আছি, তোমার স্ত্রীকে বিহুতলীতে (যেখানে বিহুনাচ হয়) যেতে দিও।"

সমাজে এলো 'গাধন' বা যৌতুক দেওয়ার প্রথা। মেয়েকে বিক্রি করার এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো বিহুগীত।

চরায়ে, চরায়ে আলচখন পাতিলে
গছর গুটি খাবার মন
আইনো কৈ বোপায়ে আলচখন পাতিলে
আমাক বেচি খাবার মন।

পাখীতে পাখীতে পরামর্শ করে গাছের ফল খাবার জন্য। মা-বাপে পরামর্শ করে আমাকে 'বেচে খাবার জন্য'। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানেও মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার প্রতিশব্দ হলো 'বেচেয়া খাওয়া'। ভাওয়াইয়া গানে আছে, 'মায়ে-বাপে বেচেয়া খাইছে সোয়ামী পাগেলারে'।

কাউরীর শতুরু মুগাচুঙীয়া
পরিব নিদিয়ে ডালত

আরে বোপায়ে আমারে শত্তুরু
ফুরিব নিদিয়ে গাঁওত।

কাকের শত্রু যেমন মুগাপোকার পাহারাদার, সে তাকে ডালে বসতে দেয় না; আমার শত্রু তেমনি আমার বাপ-মা, আমাকে গ্রামে বের হতে দেয় না।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারমুখী সমাজে স্বাধীন মন নেওয়া-দেওয়ার পথে মা-বাবার শাসনের বিরুদ্ধে এই কঠোর মন্তব্য করে অভিমানে দুঃখে রাগে মেয়ে বলছে, "কিসের জন্য আমার বাপ-মা, কিসের জন্য ভাই, বিহুর সময় যদি আমি প্রেমের সাথী না পাই?" এলো জাতিকুলের বিচার। বিহুতে পাই তারও বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

তোমালৈ চাওতে জপনা দিওতে
বিন্ধিলে অঘৈয়া হুলে
তোমার মন গলে, মোর ও মন গলে
কি কবি কলিতাকুলে।

তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে বাইরের আগল দিতে গিয়ে পায়ে ফুটলো কাঁটা। তোমার আমার যদি মনের মিল হয় কুলের বিচারে করবে কি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইয়ান্দাবুর সন্ধির পর আসাম এলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কবলে। আসামের সবুজ পাথারে, নীল-পাহাড়ে পড়লো বৃটিশ সৈন্যের ভারী বুটের প্রথম পদক্ষেপ। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশজ বিকাশের পথ ধরে এলো না, সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পথ ধরে এসে আসামের গ্রাম্যজীবনে নিয়ে এলো ভাঙন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি তার বিকাশের দেশজপথে সামন্ত-ব্যবস্থার উপরে যে আঘাত হানতে পারতো, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি তা করলো না। প্রাচীন সামন্ত শ্রেণীর জায়গায় এক নতুন জমিদারী এবং রায়তারী ব্যবস্থায় নতুন মৌজাদারী ও মহাজনশ্রেণী সৃষ্টি করলো। তবু ঔপনিবেশিক অর্থনীতিরও একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। আসামের দুর্গম জঙ্গল, জলাভূমি ও পতিত মাটিতে গড়ে উঠলো উদ্যানের মতো চা-বাগিচা। আসামের কূপমণ্ডুকতা ভেঙে গেল। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আসামের রাখীবন্ধন হলো। ব্রহ্মপুত্র নদীতে উজান বেয়ে, জলে ঢেউ তুলে, সিটি বাজিয়ে এলো জাহাজ। সেই জাহাজের সিটি গ্রামের বিহুর 'মোষের শিংয়ের বাঁশী পেপার' ধ্বনির সঙ্গে এসে মিশলো—

উজাই আহিলে কোম্পানীর জাহাজ ঐ
পিরথিবী টলেমল দেখো
চপাইদে চপাইদে কলিকাতার জাহাজ ঐ
মনোমতীর বাতরি সোধো।

গ্রামের লোক এবার জাহাজঘাটে কলকাতা থেকে আসা জাহাজে তাদের 'মনোমতীর' বার্তা নিতে এলো।

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রহ্মদেশীয় বর্গীরা আসাম আক্রমণের সময় আসামের মেয়ে মনোমতীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক মেয়েকেই নিয়েছিল। মনোমতী তাদেরই প্রতিনিধি।

শিল্পবিকাশের, ব্যাবসাবাণিজ্যের তাগিদে পরবর্তী সময়ে এলো রেলগাড়ি। চিরবিচ্ছিন্ন আসাম ভারতভূমির সঙ্গে লৌহবর্ত্মে গ্রন্থিবদ্ধ হলো। কিন্তু ভূগর্ভে তেল, কয়লা ও প্রচুর খনিজ সম্পদ-ভরা আসামে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশ জনসাধারণের মধ্যে কোনো সমৃদ্ধি আনলো না। তার বিহুগীতেও যেন সেই বৈপরীত্যের, সেই ব্যর্থতার ছবি। চলন্ত রেলের সিটি তার ব্যর্থ-প্রেমের, চলে-যাওয়া প্রেয়সীর কথাই মনে করিয়ে দেয়।

উকিয়াই উকিয়াই ও লাহরী
রেলগাড়ী চলিলে ও লাহরী
রঙিয়াত গোধুলী হল,
তোমাক আনিম বুলি ও লাহরী—
বরেঘর সাজিলো ও লাহরী
গরুবন্ধা গোহালী হল।

সিটি দিয়ে দিয়ে ও বান্ধবী, রেলগাড়ি চলে গেল, রঙিয়া জংশনে সন্ধ্যা নেমে এলো। তোমাকে আনবো বলে ও বান্ধবী, বড়ো করে ঘর বাঁধলাম, সেই ঘর হলো আজ গোহাল।

এমন অপূর্ব ইঙ্গিতময় ছবি ও ভাবের ব্যঞ্জনা আসামের বিদগ্ধ কাব্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আসাম উপত্যকার লখিমপুর, শিবসাগর ও দরং জেলায় পত্তন হলো ইংরেজের চা-বাগিচা। একদিকে আসাম যেমন হলো পৃথিবীর একটি অতিপ্রিয় পানীয়ের প্রধান উৎপাদক, অন্তদিকে কিন্তু আসামে এলো আমেরিকার নিগ্রো দাসত্বের মতো আধুনিক দাসশ্রম। একদিকে অগ্রগতি অন্তদিকে মানুষের দুর্গতি। ধনতন্ত্র-বিকাশের এই তো রীতি। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ব্রুস আসামের

মণিরাম দেওয়ানের সহযোগিতায় প্রাচীন চীনদেশের চা গাছের প্রতিরূপ আসামে চা গাছ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর অর্থনৈতিক মানচিত্রে আসামের প্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু প্রকৃতির অফুরন্ত দানে আত্মসন্তুষ্ট অসমীয়া চাষী বাগিচায় শ্রম করতে গেল না। তাছাড়া চাবুকের নীচে দাসশ্রম স্থানীয় লোককে দিয়ে করানো সম্ভব নয়। তাই সাহেবদের দালালদের সাহায্যে বাইরে থেকে বিশেষতঃ ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার আদিবাসী অঞ্চল থেকে আনা হলো কুলিদের। আসামে এরা এসে দেখলো তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে এনে মরণ ফাঁদে ফেলা হয়েছে, ফেরবার আর পথ নেই। সরকারী হিসাব থেকেই জানা যায় ১৮৬৩ খৃঃ :লা মে তিন বছরের মধ্যে আসামে যে ৮৪,৯১৫ জন মজুর আমদানি হয়েছিল তার ভিতর ৩১,৮৭৬ জনই অত্যাচার অর্ধাহার ও ব্যাধিতে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল।

কুলিদের কর্মের, ঘর্মের ও রক্তের এই ইতিহাস তাদের আদিরসাত্মক ঝুমুর গানের নতুন বক্তব্যে, আজো তাদের স্মৃতি ও চেতনায় চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

ফাঁকি দিয়া আনিলি আসাম ;
রে নিঠুর শ্যাম।
চাউলভাজা চায়ের পানি বাঁচাইল পরান।
সাহেব বলে কাম কাম
বাবু বলে ধইরে আন
সর্দার বলে লিব পিঠের চাম
রে, নিঠুর শ্যাম।
ফাঁকি দিয়া আনিলি আসাম।

আসামের বিহুগীতেও এলো চা-বাগিচা ও তার জীবনের টুকরো ছবি।

চাহ্ পাত ছিঙিলো চটাইত মেলিছিলো তেতেলীপতীয়া হল
শহুরর জীয়েকক আনিবরে পরা খুটির মহ বিকয়ে গল।

গ্রামের পাশে চা-বাগিচা থেকে পাতা ছিঁড়ে এনে রোদে চাটাইতে শুকিয়ে চা-খাওয়ার স্থানীয় পদ্ধতি চালু ছিল গরীব অসমীয়া চাষীদের মধ্যে। এই গীতে বলছে চা-পাতা ছিঁড়ে এনে চাটাইতে মেলেছিলাম, কিন্তু হয়ে গেল তেঁতুল-পাতা। শ্বশুরের মেয়েকে ঘরে আনার পর, হায়, খুঁটির মহিষ বেচতে হলো। ব্যর্থ পারিবারিক জীবনের অনুপম ছবি। কিন্তু চা-পাতা তেঁতুল-পাতায় রূপান্তরিত হওয়ার তির্যক উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কেবল ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতার

রূপক নয়। চা-পাতা বা চা-বাগিচা সম্পর্কে অসমীয়া গ্রাম্যমানসিকতার এ এক ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি।

বাগিচার চাকরি নেলাগে লাহরি
নেলাগে তলপর ধন
তয়ে ধানে দাবি ময়ে হালবাম
সেইহব জীবনের ধন।

বাগিচার চাকরিতে যাব না বন্ধু, সেখানকার রোজগারে প্রয়োজন নেই। তুমি ধান কাটবে, আমি হাল বাইব—সেই হবে জীবনের ধন। বাগিচার অত্যাচারী প্ল্যান্টার সাহেবদের সম্বন্ধে গ্রামের লোকের কী ধারণা ছিল, বিহুগীতের একটি কলির রেখাচিত্রে যে চিত্রটি আঁকা হয়েছে তা থেকেই বুঝতে পারি।

চিরিপ চিরিপকৈ বাগিচার চাহাবটি
চরাপ খাই পেলালে চিচা······

চিরিপ চিরিপ করে বাগানের সাহেবটি মদ খেয়ে বোতলটি মারলো ছুঁড়ে। আসামে প্রথম বিদেশী শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধির এত অল্পকথায় এমন নিখুঁত ছবি —অসমীয়া নাগরিক কাব্যেও বড় মেলে না।

কিন্তু যতই ধীর গতিতে হোক তথাপি রেলগাড়ি এলো, মোটরগাড়ি এলো, চা-বাগিচার সংখ্যা ও মুনাফা বেড়ে যেতে লাগলো। গ্রামের গণ্ডী গেল ভেঙে। মূল্যবোধও বদলে যেতে লাগলো। আসতে লাগলো কাঞ্চন-কৌলীন্য। চা-বাগিচা বা জাহাজ কোম্পানীর একজন কেরানী হতে পারলেও অর্থের সমাগম প্রচুর। তাই দেখি অসমীয়া গ্রাম্য যুবকদের আক্ষেপ :

কেরেণী নহলো মহরী নহলো
ধনক কেনেকৈ পাম ?

কেরাণীও হতে পারলাম না, মুহুরীও হতে পারলাম না, আমার প্রাণের ধনকে কি আমি পাব ? গ্রামের সময়, দণ্ড, প্রহর নবাগত ঘড়ির কাঁটায় পড়ে হলো 'টাইম'। প্রণয়িনীকে যুবক নতুন বস্তুর লোভ দেখাচ্ছে—

কামলৈ যাবলৈ টাইম চিনি পাবলৈ
আনি লব কুম্পানীর ঘড়ি।

কোম্পানী নামলো মরণের ব্যবসায়ে। ভারত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনে আফিম চালান দিয়ে ভাল ভাল সোনা লুঠে আনতে লাগলো বিষের বিনিময়ে। আসামে এই বিষ এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আসামের সেই

সময়কার সমাজ-সংস্কারকরা একে জাতীয় বিপদ হিসাবে ঘোষণা করলেন। আসামে এর নাম হলো 'বরবিষ'।

জার্মান পাদরি ডঃ ক্রিস্টলীর লেখা 'দি ইণ্ডো-ব্রিটিশ ওপিয়াম ট্রেড' পড়ে প্রভাবান্বিত হয়ে ১৮৮১ খৃঃ 'ভারতী' পত্রিকাতে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'চীনে মরণের ব্যবসায়' বলে যে প্রবন্ধটি লেখেন তাতে অন্যান্য স্থানের সঙ্গে আসামের আফিমের ব্যাবসার বিষময় ফল সম্বন্ধে লেখেন, "আসামে যেরূপে অহিফেন সেবনরূপ ভীষণ মড়ক আসামের সুন্দর রাজ্য জনশূন্য ও বন্যজন্তুর বাসভূমি করিয়া তুলিয়াছে এবং আসামীদের মতো অমন ভাল একটি জাতিকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম, দাসবৎ এবং নীতিভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছে···।"

আফিমকে অসমীয়া ভাষায় বলে 'কানি' আর আফিমখোরকে বলে কানিয়া। অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫-৯৬) এই আফিম খাওয়ার বিরুদ্ধে 'কানিকীর্তন' নামে একটি প্রহসন লেখেন। অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। আফিমের নেশায় মহাজনের কাছে মাটি বিক্রি করা নিঃস্ব ভগ্নস্বাস্থ্য কানিয়াদের অতি বাস্তব ছবি পাই বিহুগীতে। গীতে আছে কোম্পানীর আমলে আফুখেতি অর্থাৎ পোস্তক্ষেত উধাও হয়ে গেল। সেই আফু আফিমের রূপে গোপনে এসে "ডেকালরা করিলে বুঢ়া"। অর্থাৎ যুবককে বানাল বুড়া।

শিবসাগর শুকাব আফুকানী ওলাব
আফিঙত পাতিব জোরা
কোম্পানী বাগিছা সদাগিরি করিব
ডেকালরাক করিব বুঢ়া।

আহোম রাজাদের আমলে আসামে যে কেউ পোস্তগাছ চাষ করতে পারতো। তখনও তা সর্বনেশে নেশা হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু ইংরাজের শাসনে ১৮৬৩ সনে সরকার ছাড়া অন্যদের পোস্ত চাষ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সেই আফু চাষ আফিমের ব্যবসায়ে পরিণত হলো। বিহুর একটি অতি বিখ্যাত গীত আছে—

কানিয়াই নাযাবি কানি দিব লাগিব
আরু দিব লাগিব কুটি
কানিখাই থাকোতে পিঠা দিব লাগিব
ধুই দিব লাগিব ধুতি।

আফিমখোরকে বিয়ে কোর না, আফিম সাজিয়ে দিতে হবে। আফিম খাবার সময় খাবার জন্ত আবার পিঠা তৈরী করে দিতে হবে। আর তার সব কাজই করে দিতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দায়ভাগ

সুদীর্ঘ বিদেশী ও সামন্তশোষণ ও শাসনে বিহুগীতের জন্মদাতা আসামের কৃষক-সমাজ হলো নিঃস্ব ও নিঃসম্বল। বলহীন দেহ হলো ব্যাধির মন্দির। তার সঙ্গে এলো ঘনঘন বন্যা। মহাজনের ঘরে তার শেষ সম্বল বন্ধক হলো। অসংখ্য বিহুগীতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেই ইতিহাস। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিহুগীতে যে টুকরো টুকরো ছবি আছে তাকে এক সূত্রে গাঁথলে যে বাস্তব চিত্রটি ভেসে উঠে আসামের শোষিত কৃষক সমাজের এটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস।

নপানী বঢ়া নাই নাহর ফুল ফুলানাই
বিহু বিহু লগা নাই গাত
গাঁওর ডেকালরাই জুমেরে ঐ ফুরা নাই
গোন্ধ তেলর লোয়া নাই ছাট্।

রঙালী বিহু অর্থাৎ বসন্ত বিহু উৎসবের কিছু দিন আগে থেকেই চৈতী হাওয়ায় অসমীয়া মানসিকতায় 'বিহু বিহু' ভাব। কিন্তু এবার বিহুর বাতাসে আর শিহরণ নেই। নাগেশ্বর গাছে ফুল ফোটেনি, গ্রামের যুবকরা গন্ধতেল গায়ে মেখে দলে দলে আর ঘুরে বেড়ায় না।

বিহুবতী চরায়ে করে বিহু বিহু
আমার বিহু কাপোর নাই···

বিহু পাখী যে ডেকে চলেছে বিহুর বার্তা জানিয়ে, কিন্তু আমাদের যে বিহুর কাপড় নেই। বিহুর সময় নূতন কাপড় কিনবার সামর্থ্য নেই—এর চেয়ে দারিদ্র্যের দৃষ্টান্ত আসামে আর কী হতে পারে?

বিহুর নাচনি নরীয়া পরিলে
ঢুলীরা পরিলে জর।

বিহুর নাচুনী মেয়ে অসুস্থ, ঢুলীর উঠেছে জর···। ভেঙে পড়া গ্রাম ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের চিত্র। আদিরসাত্মক বসন্ত বিহুতে সমাজচেতনা তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে শোষকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো:

উজাই নাচাবি ভটিয়াই নাচাবি
পথারত লাগিছে জুই
সোনর মাটী মোর আজি নাইকিয়া
লোকক থুয়াইছো রুই।

উজানে তাকিও না. তাকিও না ভাটিতে, মাঠে লেগেছে আগুন, আমার সোনার মাটি আর নেই—নিজে রুয়ে খাওয়াচ্ছি পরকে।

কিন্তু জনতা অমর। তেমনি অমর তাদের সৃষ্টিপ্রতিভা। একদিকে অনাহার, ব্যাধি, বন্যা, অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণীর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য। এর মধ্যেও বসন্তের ডাকে সাড়া দিয়ে নেচেছে, মন-কেড়ে-নেওয়া ওঁড়ব জাতীয় বিহুর সুরের কোমল গান্ধার ও কোমল নিখাদের সঙ্গে মধ্যম পঞ্চমের টানাপোড়েনে নতুন নতুন গীত রচনা করেছে—যার মধ্যে বলিষ্ঠ জীবনবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের প্রতিধ্বনি পাই বিহুতে। ১৮৩০ সনে সশস্ত্র বিদ্রোহের চক্রান্তের অভিযোগে পিয়লি ফুকন ও জীউরাম দুলীয়ার ফাঁসী হয়। ১৮৫৮ সনে যোরহাটে মণিরাম দেওয়ান ও পিয়ালি বরুয়ার ফাঁসী হয়, সিপাহী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগসাজসে আসামে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার জন্য। আসামের এই প্রথম বিদ্রোহীর দল অসমীয়া জনসাধারণের মনে, তার লোকগীতে চিরজাগরূক :

রূপর ধোঁয়াখোয়াত খালি ঐ মণিরাম
সোনর ধোঁয়াখোয়াত খালি
কুম্পানীর ঘরতে কিনো দায় লগালি
ডিঙিত চিপেজরী ললি।

মণিরাম ছিলেন আসামের প্রথম শিল্পপতি ও ধনী পরিবারের লোক। তাই গীতে শুনি—

সোনার হুঁকোতে ধূমপান করতি,
মণিরাম রূপোর হুঁকোতে করতি ধূমপান।
কোম্পানীর কাছে কি অপরাধে অপরাধী হলি যে,
গলায় নিলি ফাঁসির দড়ি।

একটি নদী, একটি রাজ্য ও একটি লোকগীতি

নদী নাম লুইত। রাজ্যের নাম আসাম। লোকগীতির নাম বিহু। একই নদী, তিব্বতে নাম তার ছানপো, আসামে লুইত, বাংলায় ব্রহ্মপুত্র। পারের জাতি, ভূপ্রকৃতি, জনপদ নিয়ে একই জলধারাকে বিভাগ করে নদীকেন্দ্রিক কৃষিসমাজে গড়ে উঠেছে এক একটি কৃষ্টির এক একটি বিশেষ রূপ।

শুধু লোকগীতিতেই নয়, অসমীয়া নাগরিক কাব্যে সাহিত্যে ও গীতেও লুইত চিরপ্রবহমান। অসমীয়া মানসিকতার ধমনীতে রক্তের মতো সঞ্চালিত লুইত। প্রতি বৎসর ঘর ভাঙে, ভরা শস্যক্ষেত যোজনের পর যোজন ডুবিয়ে দেয়, সর্বনাশা গড়াখহনীয়া বা পাড়ের ধ্বস্ নেমে শহর গ্রাস করে, ভাসিয়ে নেয় কত মানুষ, মোষ, হাতী—অথচ কী ভালোবাসা এই নদীর জন্য।

ভারতবর্ষে আর কোথাও কোনো নদীর পারের মানুষ সেই নদীকে নিয়ে এত কাব্য, এত গান, এত প্রেমের উপাখ্যান রচনা করেছে কিনা জানি না। এ ভালোবাসা একান্ত মানবিক—ঐশ্বরিক নয়, ভক্তিবাদ তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। পারভাঙা পদ্মার ঢেউয়ে পূর্ববঙ্গের মনের দোলা কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোক-গীতিতে বা কাব্যে এমনভাবে পাই না। গঙ্গা তো পূজ্যা, 'দেবীসুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে'—সেখানে প্রেম নেই, আছে ভক্তি। কিন্তু অসমীয়ার লুইত যেন কসাকের ডন, বা হান্ জাতির ইয়াংসী।

অনার্য এই নদীকে অবশ্য আর্যরা চেষ্টা করেছেন—নামান্তর করে জাতে তুলে নিতে। সব অনার্য নামেরই উৎস তাঁরা সংস্কৃতে খুঁজে পেতেন। কাজেই লুইত হয়েছিল 'লৌহিত্য'। প্রাচীন কামরূপের রাজাদের দানপত্রে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো আমোঘা গর্ভসম্ভুত শুভঙ্করী শঙ্করী শক্তি স্বরূপ লোহিতের বন্দনা: "পবন রমণী সকলের মতো অতিবেগবতী, সমুদ্রের মতো নির্মল—লোহিত্যের জলে তোমাদের পাপ দূর করুক। এখানে লুইত হলো পতিতপাবন লৌহিত্য।" কিন্তু অনার্য লুইতেরও আদিকথা আছে, আছে ব্রহ্মপুত্র নামেরও।

প্রাচীন আসামের বড়ো সভ্যতা তার প্রধান সাক্ষ্য রেখেছে বিভিন্ন নদী ও জনপদের নামের সঙ্গে বড়ো ভাষায় জল এর প্রতিশব্দ ডি বা টিতে। ডিহিং ডিশাং

ডিখো প্রভৃতি নদী কিংবা ডিব্রুগড়, ডিমাপুর, ডিগবয় প্রভৃতি স্থানের নামে তারই পরিচয়। লাও-টি শব্দ থেকেই লুইত শব্দের উৎপত্তি একথা বলেছেন আচার্য স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদেরা। বড়ো শব্দ বল্লম্‌-ভুতুর—অর্থাৎ প্রবাহিনী—বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার এই বক্তব্যকেও আচার্য স্বনীতিকুমার মেনে নিয়েছেন। আহোম রাজবংশাবলী অহম বুরঞ্জীতে ব্রহ্মপুত্রকে বারে বারে 'টিলাও' বলা হয়েছে, যা হলো ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে একটি অস্ট্রিক গঠন। সেই আর্যী-করণের লৌহিত্যের আভিজাত্য বর্জন করে লুইত তার আদিম অনার্য নামটি নিয়েই বেঁচে রইলো। তাই বোধহয় তার পারে পারে জীবনের, প্রেমের, গতির, প্রকৃতির এমন অপরূপ কাব্যলীলা।

অসমীয়া লোকগীতি বিহুতে লুইত প্রায়ই হয় 'চিরি লুইত' বা শ্রী লুইত বা 'বুঢ়া লুইত' বা বুড়ো লুইত। চীনাভাষায় 'লাও' শব্দের অর্থ বৃদ্ধ, এর সঙ্গে লাও-টির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, কিন্তু নিগ্রোদের কাছে 'ওল্ডম্যান রিভার মিসিসিপির' যে মূল্য অসমীয়াদের কাছে বুড়ো লুইতেরও সে মূল্য।

এই বুড়ো লুইত কিন্তু বসন্ত উৎসব বিহুর সময় হয় 'ডেকা', নওযোয়ান। যৌবনের উদ্দামতায় সে সময় বিহুতলীর সব তরুণ-তরুণী তার কাছে পরাজিত—তার পারে পারে ঝাউবন, নল-খাগড়া, লহিয়া বনে লাগে তারই উদ্দামতার দোলা, মাদার শিমুল পলাশে—রঙের নেশা। এমন যে অবহেলিত ভেবেলীলতা বা বিরিণা বন সেখানেও মাতামাতি।···এই যৌবনের ঢল নেমে না এলে ফসলের বান ডাকবে কী করে? তাই তো যুবক যুবতীর ভালোবাসার অন্য নাম লুইত।

চিরিপ চিরিপ করি
কাপোর ধুই আছিলো
চিরি লুইতলে চাই
চিরি লুইততে কিরিলি মারি এ
চেনাই নাও মেলি যায়।

শ্রীলুইতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চিরিপ চিরিপ করে কাপড় ধুইতেছিলাম—লুইতের স্রোতে গলা ছেড়ে দিয়ে মরমীয়া আমার নাও বেয়ে বেয়ে যায়।

লুইতের চাপরিত নিতৌ পেপা বাও
করেনো বুকরে ধন
রাতিরে রাতিতো বিহুরে তলীতে
বিহুমারি থাকিবর মন।

লুইতের বালুচরে পেপা বাঁশীটি বাজিয়ে চলেছ কে তুমি বুকের ধন ? সারারাত বিহুতলীতে বিহুনাচে বিভোর হয়ে থাকতে চায় আমার মন।

বিহু নাচের ভঙ্গীতে, কোমরের দোলায়, বক্রচাহনি ও হাতের মুদ্রায় শৃঙ্গার রসের দ্যোতনা ; আবার ঢোলের বোলে, 'পেপা'র ফুকারে 'টকার' তালিতে মেঘ, বৃষ্টি ও বজ্রের অনুরণন। ভর যৌবনে মিলন না হলে ফসলের বান যে ডাকবে না। তাই—

লুইতই পাণীটুপি চোরা ঘূরে দাঙি
ভাটীলে ভটীয়াই যায়
আজি কালি করি যৌবন যায় ভটীয়াই
উলটি পাবলৈ নাই।

চেয়ে দেখ মুখ তুলে, লুইতের জল ভাটিদেশে বয়ে চলেছে ; আজ কাল করে যৌবনও যাচ্ছে, তেমনি ভাটির দেশে ফিরে পাবে না তাকে। যৌবনের খেলা যৌবনেই সাঙ্গ করতে হয়।

লুইতর পাররে কহুয়া ফুলনি
মিরিয়নী খেলিছে তাত
এনে ফাগুন দিনত
তোমার যৌবন ফুটিলে
মন মোর খেলিছে তাত।

লুইতের পারে কাশফুলের বন, মিরি মেয়েরা সেখানে খেলায় রত। এমন ফাগুন দিয়ে তোমার যৌবন হলো বিকশিত, সেই যৌবনের বনে মন চায় মোর খেলতে।

লুইতর বালি বগী চকেচকি
কাছই কণী পারে লেখি
গাতে জুই জলিছে সরিয়হ ফুটিছে
ধনক পানী-ঘাটত দেখি।

কচ্ছপের গুণে গুণে ডিম পেড়ে যাওয়া—লুইতের ঝিলমিল রূপালী বালুচর ; জলের ঘাটে বন্ধুকে দেখে সর্বাঙ্গে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।

লুইতত ভোটঙাই ওলাল শিশু
আজি বোলে রঙালী বিহু বিহু···

হুঁশ করে ওঠা শুশুকে ঢেঁামরা লুইতের জল, কাশ ফুলের বনে ঢাকা লুইতের

পার, 'নারায়ণ' শিমূলের ছায়ায় ঢাকা লুইত কচ্ছপের ডিম-পেড়ে-যাওয়া লুইতের ধবল বালুচর, মিরিমেয়েদের গা-ধোয়া লুইতের প্রবাহ—এইসব বর্ণনায় ধরা পড়েছে আসাম উপত্যকার মানুষ ও প্রকৃতি।

অসমীয়া লোকগীতি বিহু ও বনগীতের এই ঐতিহ্য, আধুনিক আসামের বিদগ্ধ কাব্য, গীতি ও সাহিত্যে প্রবহমান। আসামের প্রথম ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈ-এর প্রথম উপন্যাস 'মিরিজীয়রী'র নায়ক নায়িকার শোভনশিরি নদীর পারেই লীলাখেলা আবার শোভনশিরি নদীর জলেই দুজনের প্রাণান্ত। কিন্তু সেই শোভনশিরি নদী কিন্তু বুড়ো লুইতেরই ভার্যা। রজনীকান্তের নিজের ভাষায় "প্রবাদ আছে যে ব্রহ্মপুত্র বাবাই আগবাঢ়ি আহি তেওর পরম রূপবতী সর্বগুণে বিভূষিতা ভার্যা সোরনশিরিক বাটরে পরা আদরি নিছে।"

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের একজন পথিকৃৎ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার এক গীতিকাব্যে প্রেমিক যুগল ধনবর ও রতনী। নায়িকা রতনী লুইতের জলে আত্মহত্যা করার পর নায়ক ধনবর বিলাপ করছে, বিহুর সুরে –

বোপা মোর লুইত ঐ সামরি লোয়া মোক
বোলাত থান একেরি দিয়া
রতনী মরিল মোর সকলো পরিল ওর
আরু মোর একো নাইকিয়া।

আসামের সব নদীই বুড়ো লুইতের ভার্যা, কন্যা কিংবা দৌহিত্রী। আধুনিক অসমীয়া সংগীতের জনক, প্রথম অসমীয়া চলচ্চিত্রের স্রষ্টা, জ্যোতিপ্রসাদ সংগ্রামী আসামের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন যে গানটিতে সেটি হলো :

লুইতর পাররে আমি ডেকা লরা
মরিবলে ভয় নাই।

প্রথম অসমীয়া ছায়াছবি 'জয়মতী'র পরিচালক জ্যোতিপ্রসাদ রচিত যে গীতটির সুর আজো সারা আসামের বুক ভিজিয়ে দেয় সেটি হলো :

লুইতরে পানি যাবি অ 'বৈ'…
সন্ধিয়া লুইতর পানী সোনোয়ালী
চহরে নগরে যাবি অ 'বৈ'
জয়ারে কিরীতি দেশে বিদেশে
চহরে নগরে ফুরিবি কৈ।…

আসামের লোকগীতির একটি বিশিষ্ট ধারা হলো 'বনগীত'। বনগীতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা অনাদিরাম দাসের একটি অনুপম সৃষ্টি :

লুইতর শুয়নি রূপহী মাজুলি
মরো যেন লাগে তাত,
বাঁহরে শুয়নি আগে ঐ লেকেচি
পরে কপৌজুরি তাত
মরো যেনে লাগে তাত।

লুইতের শোভা রূপসী মাজুলী দ্বীপ, মন চায় সেখানে মরতে। বাঁশগাছের শোভা তার নুয়ে পড়া ডগায় বসে থাকা যুগল-ঘুঘু—আমার মন চায় সেখানে মরতে।

সমকালীন আসামের প্রধান গীতিকার ভূপেন হাজারিকার প্রথম গানের সংকলনটি হলো—'জিলিকাব লুইতরে পার' আসামের বাঙালী কবি অমলেন্দু গুহের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো—'লুইত পারের গাথা'।

লুইত মানে কৃষ্টি সৃষ্টি, লুইত মানে ধ্বংস কান্না, লুইত মানে আসামের ভবিষ্যৎ।

বিহুর মূল্যায়ন ও বিহুর ভবিষ্যৎ

শ্রদ্ধেয় ডিম্বেশ্বর নেওগ বিভিন্ন পত্রিকাতে আধুনিক যুগে বিহুর মৌলিক বিচার করতে গিয়ে কয়েকটি উক্তি করেছিলেন—যার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য ছিল মৌলিক। তাঁর লেখা 'আকুল পথিক' (অসমীয়া) পুস্তকটি বিহু সংগীতের এক অপূর্ব সম্ভার। ইতিমধ্যে বিহুর সংগ্রহ নিয়ে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বিহুর গান খুঁজতে হলে প্রথমেই মনে পড়ে 'আকুল পথিক'কে। নেওগ মহাশয় হলেন পরিকল্পিতভাবে বিহুগীত সংগ্রহের পথিকৃৎ। আমি যতদূর জানি 'আকুল পথিক' প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯২২ সনে আর নকুল ভুঞা মহাশয়ের 'বহাগী' বেরোয় ১৯২৪ সনে। অবশ্য এর অনেক আগেই রজনীকান্ত বরদলৈ ও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার রচনায় বিহুগীতের বহু উদ্ধৃতি দেখতে পাই।

বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের প্রথম প্রচারক হলেও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তার ভিত্তিকে প্রশস্ত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। ডঃ দীনেশ সেন হলেন বাংলা ভাষার প্রথম ইতিহাস রচয়িতা। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা ও লোকসংগীতের সংগ্রাহক হিসাবে নেওগ হলেন দীনেশ সেনের সমকক্ষ। এই নেওগ মহাশয় যখন বিহুর মূল্য বিচার করতে গিয়ে এমন উক্তি করেন যা বিহুর মর্মবাণীর ঠিক বিপরীত তখন তার গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

বিহু অসমীয়া 'রীতি না সংস্কৃতি' এই নামে নেওগ 'আমার প্রতিনিধি'তে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে আজকের ভদ্র শিক্ষিত সমাজের বিহু উৎসবগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন

> —"আমি আজি কিছুমান বছরর পরা দুঃখেরে মন করিছো ইতর সমাজত লুকাই-চুরকৈ গছতলে বাঁহতলে হোয়া বনরীয়া নাচ-গানে দেখাদেখিকৈয়ে নগরবোরত খুলি পুতিছে, আরু তথাকথিত শিক্ষিত সমাজর বহুতে তাকে সদৌ অসমীয়া সমাজর 'সংস্কৃতি' বুলি আনকো দেখুয়াবর অপচেষ্টা চলাইছে··· পরিতাপর কথা, অশ্লীল বনরীয়া নাম আরু কামোদ্দীপক বনরীয়া নাচত সংস্কৃতির "ওলটা যাত্রা" হে দেখিবলৈ পোয়া হয়। বনরীয়া নাম বোলোতেই অশ্লীল—এনে কথা আমার মনে-ঘরেও নাই,···এটি জীবর প্রতি আন এটির পবিত্র আকর্ষণ, ইয়াতকৈ আরু আধ্যাত্মিক বিষয় কি হব পারে? কিন্তু য'ত

কেবল পচাদেহর প্রতি পচাদেহর পচাভাবর উগার উঠিছে তাতেই সি বর্জনীয়। আরু এনেবোর গীতর লগত বিহু উছবর সম্পর্কই বা কি? হুচরি গোয়া বা নতুন বছরর পবিত্র লগ্নত 'হরি উচ্চরি' ঘরে ঘরে মংগল আশীষ যাচি ফুরা বিহু উছবর অংগ। আজিলৈকে সমাজর সম্ভ্রান্ত লোকর ঘরত হুচরি গায়; বনরীয়া নাচ-গান নকরে বা করিবলৈ দিয়া নহয়। তেন্তে সৰ্বসাধারণর ঘরত এনে উৎকট নাচ-গান সোমাল কেনেকৈ?...অসমীয়া সংস্কৃতির মহান কীর্তিস্তম্ভ বিহুত যথার্থতে আমি সংস্কৃতিকেই প্রথমে বলি দিছোঁ। বিহুর সামাজিক আরু সাংস্কৃতিক সকলো তাৎপর্য্য বাদ দি বাঁহতলীয়া ইতর নাচগানক আমার বর্তমান সমাজর শারীত আরু ড্রইংরুমত ধাই দিয়া কথাই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ।"

এর পরে 'আবাহন'-এ লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি বিহুর সংস্কার সাধনের সমস্যার বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন—"এই সকলোবোরলৈ লক্ষ্য রাখি বিহু অনুষ্ঠানর সংস্কার সংরক্ষণ আরু নবীকরণ (orientation) আবশ্যক যেন বোধ হয়। তার বাবে পোণতে গায়লীয়া সমাজত হুচরির এই নীচকরণ (vulgarisation) আরু ব্যবসায়ীকরণ (commercialisation) গুচার লাগিব, আরু তার লগে লগে নগরর বহুতো বিহু সম্মিলনত অসমীয়া জাতীয়তার নামত দেখুওয়া ককাল ভঙা অশ্লীল নাচ আদিও এরুয়ার লাগিব।"

গ্রহণ এবং বর্জন

যুগ পরিবর্তনের মুখে আমাদের প্রবহমান সংস্কৃতির সামনে একটি প্রকাণ্ড প্রশ্নবোধক চিহ্ন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাধা মোচনের জন্য প্রয়োজন মূল্যায়ন। মূল্যায়নে দুটি জিনিস থাকে—গ্রহণ এবং বর্জন। গ্রহণ যেমন বড় কথা তার থেকেও বড় কথা বর্জন। সংস্কৃতির সমন্বয় যেমন সত্য, তেমনি সত্য সংস্কৃতির সংঘাত। সংস্কৃতি সমাজের দর্পণই শুধু নয়, সংস্কৃতি রূপান্তরের অস্ত্র। প্রকৃত রূপায়ন সেই অস্ত্রকে করে ধারালো। গোঁড়াভাবে বর্জন যেমন এই অস্ত্রকে করে ভোঁতা, অন্ধভাবে গ্রহণ করলে তাতে মরচে পড়ে। শ্রীনেওগ মূল্যায়নের গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নটি সঠিকভাবেই তুলে ধরেছেন কিন্তু তাতে করে তিনি 'উল্টো যাত্রা' করেছেন অর্থাৎ যা গ্রহণীয় তাকে বর্জন করলেন আর যা বর্জনীয় তাকে গ্রহণ করলেন।

যেদিন মানুষকে সামগ্রিকভাবে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করতে হয়েছিল সেদিন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সংস্কৃতির স্বরূপও ছিল সামগ্রিক। সেদিন ছিল একদিকে বন্য প্রকৃতি, অন্যদিকে ছিল মানুষের হাতে আদিমতম উপকরণ। তা হলো productive force, উৎপাদনের উপকরণ আর তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল production relations, উৎপাদন সম্পর্ক—শ্রেণীহীন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ। কিন্তু উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন হয়ে ইতিহাসে শ্রেণী ও শ্রেণী সংঘাতের অধ্যায় শুরু হলো। তখন থেকে প্রকৃতি বিজয়ের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামই হলো মানব ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি। শোষক এবং শোষিত, শ্রমকারী আর পরশ্রম-ভোগীর মধ্যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সংঘাতই হলো অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির মর্মকথা। কিন্তু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংঘাত যেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম তেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নয়। কখনো তা অতি সূক্ষ্ম ও জটিল। কিন্তু তবু শ্রেণীসমাজের সংস্কৃতিকে সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই শ্রেণীসংগ্রামই হলো তার মূলকথা। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কেউ-ই শ্রেণী-সংঘাতের হাত থেকে অব্যাহতি পায় না। শ্রেণীস্বার্থ-নিরপেক্ষ কোন চিন্তা থাকতে পারে না। শোষক শোষিতের সংঘাত কখনো ধর্মীয়, কখনো জাতীয়, কখনো বা বর্ণসংঘাতের রূপ নেয়; কিন্তু মূলত তার স্বরূপ হলো একটিই—শ্রেণী সংঘাত।

ইতিহাসে আমরা দেখেছি শাসকের এক ধর্ম শাসিতের অন্য ধর্ম—দুই ধর্মের দুই দেবতার যুদ্ধ। মধ্য যুগে শাক্ত রাজধর্মের বিরুদ্ধে গণশক্তি হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব। উপরের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর শরিয়তী ইসলামের বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর আউল-বাউল এবং সুফী সাধকগণের আবির্ভাব। অগ্রগামী প্রগতিশীল শক্তি historical religion বা শাস্ত্রীয় ধর্মকে পরিত্যাগ করে religion of man বা মানবধর্মকে প্রচার করেছে। বছর কয়েক আগে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার বরপেটা অধিবেশনে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে শ্রীহেম বরুয়া সংস্কৃতির কেবল সহ-অবস্থানকেই দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সংস্কৃতিগত সংঘাত হচ্ছে নীচাত্মিকা মনোভাবের পরিচয়।" কিন্তু নীচ বা উচ্চ, ভাল কি মন্দ, বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করতেই হবে। এই সংঘাত হলো objective reality independent of human will।

সমন্বয় হয় ভাষায় ভাষায়, জাতিতে জাতিতে, কলার প্রকরণে প্রকরণে; কিন্তু শোষকের ভাবাদর্শ আর শোষিতের ভাবাদর্শের মধ্যে সমন্বয় কখনই হতে

পারে না। শাসিত জনগণ কখনো বা শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন নতুবা শাসকশ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। মেঠোসুরের বিহুগীতের কলি তখন স্বতঃই মনে পড়ে :

স্বৰ্গদেও ওলালে বাটচৰাৰ মুখলৈ
ঢুলিয়াই পাতিলে দোলা
কাণত জিলিকিলে মকৰ কুণ্ডলে
গাত গোম চেঙ চোলা।

কিংবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মানবপ্রেমমুখী বিহুগীতে পাই—

প্ৰথমে প্ৰণামো আই সৰস্বতী
দ্বিতীয়ে প্ৰণামো হৰি…ইত্যাদি।

অথবা গরুর 'গা-ধোয়া' (স্নান) নাম। এর সঙ্গে বর্তমানের বুর্জোয়া জাতি-বিদ্বেষের হাওয়া কোনো কোনো বিহুগীতকে কলুষিত করেছে।

বঙাল ঐ, বঙাল ঐ, লেতেৰা বঙাল ঐ
বঙালক নিদিবা ঠাই…ইত্যাদি।

('বণ-বেণু'—ডিম্বেশ্বর নেওগ)

গ্রহণ বর্জনের সমস্যাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত। এই প্রগতিশীল গণদৃষ্টি না থাকলে বিহুর সংস্কার হবে বিহুর সংহার।

বিহুর জীবনদর্শন

আমাদের পূর্বসূরী 'জোনাকী যুগের' শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সাহিত্যরথী বেজবরুয়া এবং কথাশিল্পী রজনীকান্ত বরদলৈর এই গণদৃষ্টি ছিল। বরদলৈ 'মিরি-জীয়রী'র সমর্পণে লিখেছেন :

"মোর আজলী 'মিরি জীয়ৰী'য়ে আজিকালির নব্য ধরণেরে বঙলা গান নিশিকিলে দুখ লাগিলে তাই আধা ভঙা অসমীয়া মাতেরেহে সামান্য সামান্য বিহুগান গাব জানে।…সেই দেখি আরু ভাই তুমি এই বিলাক বিহুনামেরে কলঙ্কিত হলেও শুনিবলৈ ভাল পোয়া বুলি জানিহে ইয়াত কেইটামান বিহুনাম দিলো। কুরুচি বুলি তুমি মোর দোষ নধরিবা। গাভরুয়ে বেয়া বিহুগান নাগায় আরু গালেও মোর একো উপায় নাই।"

কৃপাবর বরুয়া (লক্ষ্মীনাথের ছদ্মনাম) ছিলেন আরো স্পষ্টবাদী : "আপোনা-সকল 'চহরীয়া' মানুহ কেইটাই গোটেই অসম দেশখন নহয়। এ চরু শাকত

আপোনালোক এটা জানুক। বছরেকর মূরত গাওঁর ইমানখন মানুহে মন মুকলি করি দি, নাচিবাগি রং ধেমালি করি দুখীয়া জীবনটো শতাই লয়, আপোনালোকে তাকো দেখিব নোবারা হ'ল। গাওঁলীয়া মানুহ, মানুহ নহয়, আপোনালোক চহরীয়া মানুহ কেইটাই মানুহ।"

বরদলৈ বা রূপাবর বরুয়া যে সময়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন সেই সময়ে 'ভদ্রসমাজে' বিহু ছিল কলংকিত। ইতরজনের অসভ্যতা।

কিন্তু ইতরজনের সাহিত্য বলেই কি কেবল বিহু পরিত্যক্ত হয়েছিল? না। তা পরিত্যক্ত হয়েছিল বিহু কাব্যের জীবনদর্শনের জন্য যা ছিল বর্ণাশ্রমী হিন্দু ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিহুর secularism বা ইহজীবনমুখিতার বলিষ্ঠ মানবিক বাণী, নারী-পুরুষের সাম্য, নারীর প্রেমের স্বাধীনতা সমস্তই ছিল নিষ্ঠাবান হিন্দু উচ্চ সমাজের রীতি-নীতির, মনুর বিধানের বিরোধী। সেই হেতুই তা ছিল 'অশ্লীল'।

শ্রেণীহীন গোষ্ঠীসমাজের সংহত সামগ্রিক জীবনে ফসল উৎপাদনে মানব প্রজননের ঐন্দ্রজালিক অনুকৃতি থেকে যে fertility cult-এর জন্ম, তার থেকেই বিহুর উৎপত্তি। পৃথিবীর আদিম সংস্কৃতির নৃত্যসংগীতের এটাই ছিল আদি উৎস। কিন্তু যখন এই প্রজনন অনুকৃতি mother cult তথা লিঙ্গ পূজায় রূপান্তরিত হয়ে তান্ত্রিকতার রূপ নিল তখন থেকেই বিকৃতির সূত্রপাত। বিহু একান্ত মানবিক। অমানবিক, অলৌকিক হলো বিহু-বিরোধী জীবনদর্শন। বিহুগীতে 'পচা দেহের প্রতি পচাভাবের প্রকাশ' কখনো ধ্বনিত হয়নি। মানব-দেহের সৌন্দর্য, মানব দেহের চিরন্তন পবিত্রতাই হলো বিহুর জীবনদর্শন। মানব-দেহের নশ্বরতার কথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মই প্রচার করেছিল। বৈষ্ণবধর্মও বিহুর দর্শনের বিরোধিতা করেছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বিহুগীতে কখনো বা

বিষয়র দুঃখ জানি তথাপিতো একো প্রাণী
নেরে দুনাই তাকে ভুঞ্জি মরে—

এই বৈষ্ণবী দর্শনের প্রতিধ্বনি পাই।

ধনে ধনে করি ধনকে ঘটিলো।
পরম যতন করি,
ধন গ'ল উচলি দেহা গ'ল পিচলি
লগত গ'ল দুছলি খরি।

এ হলো বিহু-বিরোধী জীবনদর্শন। এটা প্রক্ষিপ্ত। বিহু জগতে এ বিজাতীয়।

এই ক্ষয়িষ্ণু বৈষ্ণব দর্শনের দ্বারাই শেষজীবনে প্রভাবিত হয়েছিলেন পরলোকগত নেওগ। তাঁর 'আমার প্রতিনিধি'তে লেখা প্রবন্ধে উল্লিখিত তাঁর মতের সারমর্ম হলো: বিহুর নৈসর্গিক এবং ধর্মমূলক অংশ চিরন্তন সংস্কৃতির অংশ এবং 'রঙ্গমূলক' আদি রসাত্মক অংশ বর্জনীয়। বিহু নাচ সম্পর্কে একে পাশবিক (vulgar) উত্তেজনামূলক বলে তিনি আমাদের সামনে নিজে মন্তব্য করেছিলেন।

সংস্কার-সংরক্ষণ-নবীকরণ

নেওগ মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত নীচকরণ (vulgarisation) ও ব্যবসায়ীকরণ (commercialisation)-এর অভিযোগ সত্য। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? যে কৃষিসমাজে বিহুর উৎপত্তি সেই কৃষিসমাজের সংহতি নষ্ট করল কে? সামন্ত সমাজের মহাশয় ব্যক্তিরা এবং ঔপনিবেশিক শোষণের ছায়ায় জন্মলাভ করা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী। পাথারের বিহুমণ্ডপে 'ইতর' জনসাধারণের মধ্যে তারা প্রবেশ করতে পারেন না। সেই সমস্ত 'ইতর' মানুষকে তাঁদের চাতালে আসতে হলো। নীচকরণ আর ব্যবসায়ীকরণের সূত্রপাত সেখানেই। আজ শহরগুলিতে বিহুর পুনর্জীবন ও সর্বজনীন বিহুমণ্ডপেও নীচকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের প্রবণতা অবশ্যই আছে। বাঁশতলা, বনতলার জিনিস যখন মঞ্চে স্পটলাইটের নীচে আসে, তখন তার চরিত্র সংযত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে। আজকের যুগ গণজাগরণের। আজকের বিহু মণ্ডপ 'মহাশয়-ব্যক্তিবর্গের' নিজস্ব চাতাল নয়। সেখানে গণমুখী শ্রেণী-সচেতন সংগ্রামী দেশপ্রেমিক জনগণেরও সমাগম হয়। দর্শক হলেন মুখ্যতঃ এঁরাই। অতএব বিকৃতি ও ব্যবসায়ীকরণের প্রতিবন্ধকও আছে। বোম্বে ছবির গীত ও নাচের বিকৃতি হয়তো এঁরা বিনা প্রতিবাদে দেখে থাকেন, কিন্তু নিজেদের সনাতন বিহুতে সেই বিকৃতি তাঁরা সহ্য করবেন না। বিহু নাচে একদা "ইতর যুবতীর কোমর বাঁকানো অশ্লীলতা' দেখে ভদ্রলোকেরা হয়তো চোখের লালসা তৃপ্ত করেছিলেন। কিন্তু আজ নৃত্য হিসাবে এটি জাতীয় সম্মান অর্জন করেছে। আগে বিহু নাচগুলিতে যে বিশৃঙ্খল দাপাদাপি দেখেছিলাম বর্তমানে সেখানে এসেছে choreography, নৃত্য পরিকল্পনা ও পোশাকের সামঞ্জস্য ইত্যাদি; অথচ বিহু নাচের মৌলিক চরিত্র সেখানে ক্ষুণ্ণ হতে দেখি না। ধুতি, জামা, গামছা, 'গগণা সপপা' সমস্তই আছে এবং থাকবে। কোমরের ভঙ্গিমাও

আছে ও থাকবে। কিন্তু সেখানে অশ্লীলতা কিছুই পাই না। পরিবেশনের উপর তা নির্ভর করে। কিভাবে একে নীচকরণ বলি? কিন্তু যে-সমাজে শিল্পীকে ধনীর দুয়ারে হাত পাততে হয় জীবিকার তাড়নায়, সেখানে ব্যবসায়ীকরণের প্রবণতা থাকবেই এবং তার বিরুদ্ধে থাকতে হবে সদা সতর্ক।

বিহুর ভবিষ্যৎ ও নবীকরণ

বিহুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অপরিসীম। বিহু কাব্যের তুলনাহীন ঐশ্বর্যের ও সংগীত হিসাবে তার চিরন্তনতার প্রসঙ্গ এখানে তুলবো না। বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষী জাতি, জনজাতি এবং উপজাতিতে সমৃদ্ধ আসামে বিহু হবে পরিপূর্ণ জাতীয় উৎসব আর বিহু মণ্ডপ হবে অন্তর-আদানপ্রদানের শ্রেষ্ঠ মিলন ক্ষেত্র।

দুঃখের বিষয় ভারতে প্রায় সমস্ত উৎসবই সাম্প্রদায়িক। বসন্ত উৎসব রূপান্তরিত হয়েছে হোলি বা চৈতন্য উৎসব ইত্যাদিতে, শারদীয়া পরিণত হয়েছে দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে। কারবালার কাহিনীমূলক মহরম হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের। কিন্তু বিহু এর মধ্যেও তার ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এটা বিহুর গৌরব, অসমীয়া জনগণের গৌরব।

কিন্তু বিহুর নবীকরণ বিহুর নতুন জাতীয় মর্যাদা উপরের কয়েকজনের প্রচেষ্টায় হতে পারে না। নতুন দিল্লীতে গণরাজ্য দিবসের শিল্পী সমারোহে বিহুর দল যোগ দিলেই বিহুর জাতীয় প্রতিষ্ঠা হবে না। যে কৃষি সমাজ থেকে বিহুর উৎপত্তি সেই কৃষি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরের সঙ্গে নবীকরণের সমস্যা জড়িত। আজ যে কৃষি সমাজের বিপর্যয়, তার বিরুদ্ধে কৃষককে ভূমির মালিকানা দেবার আন্দোলনের অর্থাৎ কৃষি বিপ্লবের ঢেউএর সাথে বিহুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ধারা প্রবাহিত হবে। তার সঙ্গে আসামের কবি স্বতঃস্ফূর্ত গীত রচনা করবেন। বিহুপ্রাঙ্গণে আবার সমগ্র জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগ হবে। নতুন যুগের বিহু মণ্ডপে সবাই ছন্দোবদ্ধ চেতনায় হাততালির তালে তালে গাইবে 'বিহুগীত'—'বিহুনাম' নয়। বিহু সংস্কৃতির চিরউজ্জ্বল কোহিনূর হয়ে আসামের দিগন্ত উদ্ভাসিত করে রাখবে।

२

কোলকাতার দেহাতী গীত

কোলকাতার পিচ্‌গলানো রোদ্দুরে কাঁঠালঠাসা বাসে বসে কোনোদিন কি লক্ষ করেছেন—এক ঠেলাগাড়ির উপরে গামছামাথায় আদুলগায়ে হাতের তালুতে কান লাগিয়ে কোনো দিনমজুর, কী অসীম নিরাসক্তিতে তারার সপ্তকে গান গেয়ে চলেছে ?

আমাদের বাঙালী ভদ্রলোকদের কেবল হাসির রসদ জুগিয়েই সে চলেছে। এর মধ্যে যদি কোনো বিদগ্ধজন থাকেন তবে তিনি রাজপথে 'কালচারের' এই 'সোচ্চার' উপস্থাপনায় মর্মাহত হবেন, আর যদি তিনি সুরজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে সংগীতের সময়, পরিবেশ স্থান ও কালের নিয়মভঙ্গে বিক্ষুব্ধ হবেন। অধিকাংশ বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীই নিজেদের সংস্কৃতির গর্বে এইসব 'প্রচণ্ড রামা হো মার্কা' গানে কেবল 'ছাতুর মাহাত্ম্য'ই দেখে থাকেন। এক কথায় তাঁরা জানেন—এ হলো দেহাতী গীত।

দেহাত থেকেই এসেছে দেহাতী। দেহাত মানে যদি হয় গ্রাম, দেহাতী হলো গ্রাম্য। কিন্তু তা বলে বাংলার গ্রামকে তা বুঝায় না। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলকে আমরা জানি দেহাত বলে। কোলকাতার আশপাশে শিল্পাঞ্চলে কিংবা কোলকাতার উপরে যে সব গায়-গতরে-খাটা অবাঙালী মেহনতী মানুষ আছে এদের অধিকাংশই বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের। এরা কারখানার শ্রমিক কিংবা দিনমজুর হলেও এবং এঁদের অধিকাংশই ভূমিহীন হলেও এঁদের আসল পরিচয় কিন্তু দেহাতী।

আমাদের বাবুদের অনেকে বলে থাকেন—এরা বাংলা দেশ থেকে উপার্জন করে লাখ লাখ টাকা প্রতি মাসে দেহাতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এঁরা দেখেন না এই দেহাতীরা বাংলাদেশে শ্রমশক্তি বিক্রী করে যে বাড়তি মূল্য পয়দা করে তা দিয়ে এখানে উঠছে আকাশচুম্বী ধনের চূড়া। যাক, সে হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার কথা। যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এই যে দেহাতী, এদের গীতমাত্রই কোলকাতা মহানগরের লোকসংগীত। আমার এই কথাটা অনেকেরই কাছে লাগবে আজগুবি নতুন। তাই এ-বিষয়েই সামান্য আলোচনা করবো।

এঁদের গীতকে দেহাতী বললেও বুলিকে আমরা বলি হিন্দুস্থানী। এখানেই

আমাদের আরেক মস্ত ভুল। এদের ভাষা ও সংস্কৃতি যে আঞ্চলিক সীমারেখা-গুলিতে চিহ্নিত তার নাম মৈথিলী, মগধী বা মগহী, ভোজপুরী ইত্যাদি। পাটনা ও গয়াকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল হলো মগধী বা মগহী, দ্বারভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল হলো মৈথিলী, আরাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমাঞ্চল হলো ভোজপুরী। এগুলি আর উপভাষা নয়, পরিপূর্ণ ভাষা হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ণভাষার স্বীকৃতি দাবী করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। বিদ্যাপতির কৃপায় আমরা সবাই মৈথিলীকে জানি, কিন্তু অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে আমরা ততটা ওয়াকিবহাল নই। কিন্তু এইসব ভাষাতে আজ পত্র-পত্রিকা এমন কি চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে। 'গঙ্গা মাঈয়া তো হে পিয়ারী চহ্‌ড়াইব" এই ভোজপুরী সবাক ছবিটি কোলকাতার বাঙালী দর্শকদের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়েছিল। কোলকাতার দেহাতীদের মধ্যে ভোজপুরী অঞ্চলের লোকই বেশী।

এইসব অঞ্চলের খেটে-খাওয়া মানুষগুলি কোলকাতায় যে দেহাতী গান গায় তা সুরে ও বক্তব্যে যেমন বিচিত্র, কাব্যেও অনুপম। বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন পর্বে সেসব গাওয়া হয়। শুধু দেহাতী বললে তো হয় না—'কাজরী', 'চৈতী', 'বিরহা', 'বিদেশিয়া' কত কিছু। আবার 'আলহার' মতো কতো বীরত্বপূর্ণ কাহিনীমূলক ব্যালাড! দিনের বেলায় যারা ট্রামের কনডাকটার, ঠেলাগাড়িওয়ালা, রিক্সাওয়ালা বা অফিসের দারোয়ান—রাতের বেলায় এঁরা সবাই এই সব বিভিন্ন রকমের দেহাতী গীতের রূপকার। 'রামা হো' তো একটা refrain বা ধুয়া মাত্র। এমন জীবনঘনিষ্ঠ এসব গান—এমন শুকনো মাটির গন্ধে ভরপুর যে স্বাদ মন দিয়ে শুনবার বুঝবার চেষ্টা বাবুরা কেউ করেন, তবে তাঁদের বিচ্ছিন্নতার ব্যধির অন্ততঃ সাময়িক উপশম ঘটবে।

এমনি একটি দেহাতী গীত শুনেছিলাম এবং শিখেছিলাম কোলকাতাতেই।

বারো বাজে রাত্তিতক্ ধোবী ধোয়ে কাপ্‌ড়া
মই ক্যা করু ভাই চলা যাঁউ ছাপরা।
হো রামা॥
ছাপরা মে নাহি মিলে চাউল ঔর মকৈয়া
উসি লাগি গোসা করে হামরা ঐ সৈয়া॥
আগে আগে বইলা চলে, পিছাসে কিষানোয়া
ক্ষেতোয়া জোতলারে কিষানোয়া।
শিরোপর পাগরীয়া, কান্ধেপর কোদালীয়া

ক্ষেতোয়া জোতলারে কিষানোয়া।
হো রামা॥

ছাপড়া জেলার কোনো এক অখ্যাত গাঁয়ের এক কিষান জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কোলকাতায় কোনো ধোবীর এখানে কাম নিয়েছে। সময়ের নিরিখহীন খাটুনি। তার মন পড়ে আছে সেই মাটিতে। সেখানে তো এরকম খাটুনি নয়, সেখানে মেহনতের ঘামে 'মকৈয়া' বা গেহু সবুজ পাতা মেলে দিত। সেখানেও জমিদার, মহাজনের শোষণ, বউ-এর গহনা বন্ধক, তবু প্রতি বৎসর "অগহনোয়া" বা অঘ্রাণ মাস নিয়ে আসতো মেহনতের প্রতিশ্রুতি। সেই স্বপ্নেই তো সে গান ধরে :

সব দুখ ভাগল্কী আহল্ অগহনোয়া
ধানোয়াকে লাগল্ কাটোনোয়া।
হো রামা।
লেই লেই হসুয়া, সখীন্ সব চললী
ভোজকে মনমা মগনোয়া
অবকী বখারীমে ভরি ভরি ধানওয়া
ছুট যইছে বন্ধক গহনওয়া হো।
রামজী।

এই অঘ্রাণ মাসে বউ-এর বন্ধকী গহনা ছুটাতে পারব। এর চেয়ে বড় আশার বাণী আর কি থাকতে পারে? স্ক্রু বল্টু হাইল পিনিয়নের রাজ্যে বসেও এরা দেখে ভুট্টাক্ষেতের স্বপ্ন :

মকইয়ারে তোহর গুণ গাইলো না জালা।
আগে আগে হর চলে পাছে সে বোয়ালা
তোক্‌রা পাছে হেঙা চলে তিন বের সোহালা॥
ভাত করে খুট্টর খুট্টর রোটী চিত্‌রালা
ভৈসি কে মঠঠা'ম সট্‌সট্ ঘোটালা॥

কোথায় লাগে ভাত আর, কোথায় লাগে রোটী, মহিষের দুধের ঘোলের সঙ্গে ভুট্টা পিষে ঘুঁটে নিয়ে যদি একবার—আঃ। কোলকাতার কানা বস্তির মাটির ভাণ্ডের চা-য়ে চুমুক দিয়ে একথা ভাবতে এ গান গাইতে কত ভাল লাগে।

অনেক সংগীতানুষ্ঠানে লোকসংগীত গাইবার জন্ত আমার ডাক পড়ে। বিভিন্ন প্রদেশে লোকসংগীত গাইতে গিয়ে যখনি এইসব দেহাতী গীত খাঁটি সুরে ও

ঢঙে গাইবার চেষ্টা করেছি—তখনি দেখেছি ভদ্রশ্রোতাদের মধ্যে, চাপা-হাসি ও মজা-তামাসার মনোভাব। ওঁরা হয়তো ভাবেন—এই ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালাদের রামা হো গীত-ও তো 'বিদগ্ধ প্রেক্ষাগৃহে' বেশ চালিয়ে দিচ্ছি। অনেকে অবশ্য এর ছন্দ ও সুরে মুগ্ধ হন। কিন্তু দেহাতী গীতের মাটির মরম অনুভব করেন কয়জন ?

আরেকটি রামা হো গীত শুনুন তবে।

ছাপক পেঁড় ছিহুলিয়া হো রাম
তে' পতওন গহওর হো
তোহি তরে ঠাঁডি হরিনিয়া হো রাম,
তে' মন অতি অনমন হো॥
কি আহো তোরা চরহা ঝুড়ান
কি পানী বিনা মারঝাই লে হো॥
হরিণা আজু রাজাকে ছটি হা
তোহে মোরি দেই হেঁ হো।

হরিণী খলরিকে খঞ্জরী বানাইব
সে লাল মোরা খেলিহাই হো।

এই দেহাতী গীতটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক করুণ লোককাহিনী : রাজা হরিণশিশুকে শিকার করে নিয়ে গেছে। হরিণ-মাতা তার সন্ধানে পাগলী। এদিকে রাজা সেই হরিণশিশুর চামড়া দিয়ে রাজপুত্রের জন্য একটি খঞ্জরী বানিয়ে নিয়েছেন। হরিণ-মাতা পাগলিনী হয়ে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল—তখন হঠাৎ সেই খঞ্জরীর বাজনা শুনতে পায়। বাজনার সাথে সাথে তার কলিজায় যেন পড়ে হাতুড়ীর ঘা। সে জানতে পারে ঐ খঞ্জরী তারই শিশুর চামড়ায় তৈরি। দেহাতী কবি এ কাহিনী গাওয়ার পর নিজের মন্তব্য দিয়ে শেষ করেন :

হরিণা মুয়াইল মসোয়া সিঝাইল
খলরিকে খঞ্জরী বানাইল, হো রাম
যব যব বাজয়ী খঞ্জরীয়া, হো রাম
সুনি হরিণী অই করই হো।—

মাঝে মাঝে যখন রাজপুত্রে খেলাচ্ছলে খঞ্জরী বাজায়—তার ধ্বনি পাগলিনী হরিণমাতার বুক এমনিভাবে বিদ্ধ করে।

গ্রাম্যজীবনে শ্রেণীসংগ্রামের—অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এমন গীত আমি খুব কমই শুনেছি। বাংলা লোকসংগীতও এরকম দৃষ্টান্ত খুব বিরল।

বাংলাদেশের যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তাঁরা শ্রমিকদের এই দেহাতী মানসিকতার কোনো খবরই রাখেন না। এক কথায় তাঁদের কাছে এ হলো 'ফিউডাল কালচার'। আমাদের মতো, লোকের সঙ্গে দেখা হলে 'শ্রমিক কালচার' গড়ার মতো গান নাটক দেবার জন্য বক্তৃতা দেন বা দাবী জানান। ওদের দেহাতী অর্থাৎ national regional form' আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতির হদিস না রাখলে এবং প্রধানত সেই আঙ্গিকের আশ্রয় না নিলে proletarian culture বা শ্রমিক শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলা যায় না। এই রূপান্তরের কিছু নমুনা আমাদের গণনাট্য আন্দোলনের অতীত ইতিহাসে আছে।

১৯৩৬ সালের পর থেকে গান্ধীবাদের শ্রেণীসমন্বয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সারা ভারতের কৃষকশ্রেণী যখন লাল ঝাণ্ডার নীচে সংগঠিত হতে লাগলো তার অগ্রসারিতে ছিল বিহারের বলিষ্ঠ কৃষকশ্রেণী। তাদের দেহাতী সংস্কৃতিতেও তার ফলে বহেছিল এক নতুন প্রবাহ। একটি গান তখন সর্বভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল :—

কেকরা কেকরা নাম বাতাউ
 ইস জগমে বড়া লুটেরোয়া হো।
মলিক উর মহাজন লুঠে, লুঠে
 ঘুষখোরোয়া হো,
মিলওয়ালা লুঠে, জমিদার লুঠে
 মরগিয়া কিষান মজদুরোয়া হো
পাণ্ডা উর পূজারী লুঠে, ঔর লুঠে
 ঘুষখোরোয়া হো,
গুরু ঔর পুরোহিত লুঠে
 সাধু লুঠে ঔর চোরোয়া হো।

এই গানেরই অবলম্বনে পরবর্তী সময়ে কোলকাতার একজন দেহাতী রচয়িতা রচনা করেন

কেকৃরু কেকৃরু নাম বাতাউ
জগমে বড়া লুঠেরোয়া হো
দেখশুনকর কুছ না কহ না
গালে সাথী রাম ভজনোয়া হো ॥
কারখানামে মেহনৎ করকে
খুন কিয়া পসিনা হো
বুড়াপনমে ছাঁটাই ভইল্‌বা
বড়ে দয়াল মালিকোয়া হো ॥

না মিলে লুগা না মিলে লহঙ্গা
কালে বাজারমে ছপ্‌পাল্‌ হো
নও হাত শাড়ী চৌদা রূপায়া
বড়ে রসিক দুকানিয়া হো ॥

বাচ্চেকো মেরা ভইল্‌ বুখারোওয়া
কহে লে যা হাসপাতালোয়া হো
গড্‌, মড্‌ আংরেজী ডাঁগ্‌তার কহিলা
ঘুষ মাঙ্গিলা বিশ রূপাইয়া হো ॥

রেশন লেনে কণ্ট্রোল যাউঁ
সেরমে ছটাক ভোরাইলা হো
বাপ দাদাকে নাম পুছবার
ডাঁটিয়ে ইন্‌স্পেক্টরোয়া হো ॥

ভারতে নাকি দ্রুত শিল্পায়ণ হচ্ছে। কিন্তু শিল্পায়ণ যতো হচ্ছে ততোই বিদেশীর নিকট অর্থনৈতিক বশ্যতা বাড়ছে। গরীব আরো গরীব হচ্ছে—ধনী আরো ধনী হচ্ছে। আজব কারবার। একটি দেহাতী গানের কলি শুনছিলাম:

বক্সহার মে বিজলী তার গৈল
হামনিকের উজার ভৈল।—

ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এমন সুন্দর 'কমেণ্টারী' আর কি হতে পারে? গ্রামে আসছে 'বিজলী তার ভাইয়া আমরা হচ্ছি উজার।'

কোলকাতার শিল্পী সাহিত্যিক সব বিচ্ছিন্নতার ব্যাধিতে ভুগছেন। সমষ্টি-চেতনার সুস্থ মিডিয়াম নেই। বিভক্ত বাংলার গ্রামের 'কমিউনিটি সঙ'—আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কোলকাতাতে বা আশেপাশের কলোনীতে নিত্য কাজে, ব্যবসায়ে জীবিকা সংগ্রামে আত্মগত-প্রাণ কখনো কখনো সমষ্টি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার মতো লোক-সংগীতের মাধ্যমগুলি নির্জীব হয়ে গেছে।

যেমন বসন্ত উৎসবের হোলী। আদিরসাত্মক, উল্লাস উদ্দীপনা ও জীবনবাদের সমষ্টি-সংগীত। আমাদের অঞ্চলে গ্রামে দেখেছি এক সঙ্গে দেড়শ' দু'শজন সারা রাত্রি ছড়ানো আবিরের মধ্যে ঢোলক ও করতাল নিয়ে সবাই গাইছে—

দুরন্ত বসন্ত আর যে আসে না
তারে কইরোগো মানা—
আইলরে বসন্তকাল
দুঃখিনীর দুঃখের কপাল
প্রাণকান্ত—বিনে আর প্রাণ তো বাচে না।
তারে কইরোগো মানা।···

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা হারিয়ে গেছে। রাজধানী কলকাতার যুবক শ্রেণী বসন্তকে হোলী গানে আবাহন করতে জানে না, তারা হয়ে যান 'হুলিগান'।

গত বৎসর হোলীতে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম—লাল রঙ, রঙ বদলিয়ে কিরকম কর্পোরেশনের নর্দমার জলের রঙে রূপান্তরিত হয়। কাদা ছোড়াছুড়ি—তারপর হানাহানি—তারপর কোনো কোনো জায়গায় খুনোখুনি। বাংলার সংস্কৃতির কী রূপান্তর। আমার ঘরের সামনেই বিহারের মজফ্‌ফরপুরের মুচিদের একটি ছোট্ট ডেরা। সেদিনই হোলীর সন্ধ্যায় সেখানে রাস্তার উপরে ত্রিশ-চল্লিশজন কোলকাতাবাসী হোলীমত্ত দেহাতীর আসর বসল।

বন্দী বিহঙ্গের কাকলি : '৬৭-র পরের গণসংগীত

কিছুদিন যাবৎ ঘূর্ণিঝড়ে ডানাভাঙা পাখীর মতো কিছু গান আমার খাতার পাতায় এসে বাসা বেঁধেছে। একদিন গান খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি, আর আমার শেষ বয়সে গান আমাকে খুঁজে খুঁজে ঘরে এসে হাজির হচ্ছে। গানগুলি একেবারে নতুন স্বাদের। আনন্দে আপ্যায়ন করি, কণ্ঠে তুলে নেবার চেষ্টা করি; কিন্তু দুঃখে সেইদিনগুলোর কথা ভাবি যখন নতুন গানকে সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার সব উপকরণই আমাদের ছিল। সেদিনও ব্যবসায়ী ও সরকারী একচেটিয়া গণমাধ্যম এবং 'জনপ্রিয়' শিল্পীরা ছিলেন—কিন্তু আমাদের সংগীত-অভিযাত্রীদের উদ্দামতার কাছে তা ছিল নিষ্প্রভ। আর আজ ঠিক তার উল্টো ছবি। অনামী রচয়িতাদের এই সব বলিষ্ঠ গান আশায় মন ভরে তোলে ঠিকই, কিন্তু কোথায় আজ প্রচারের সেই মাধ্যম ?

শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত দিক থেকে এসব গান অনেক উন্নততর। খাঁটি গণসংগীতের একমাত্র উৎস যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ আপোষহীন শ্রেণীসংগ্রাম, এ প্রত্যয় গানগুলিতে স্পষ্ট। কয়েকটি গানের সুর আমরা পেয়েছি, অনেকগুলিরই পাইনি। কিছু গানের ভগ্নাংশমাত্র সংগ্রহ করতে পেরেছি। কারা এইসব গানের রচয়িতা ? দু একজন ছাড়া কারো নাম জানা যায় নি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া একজন রাজবন্দীর কাছে স্বরলিপি সহ একটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি পাই। খাতার উপর মেদিনীপুর জেলের অধিকর্তার ছাড়পত্র দেওয়া সই। ভেতরে প্রথম পাতায় ভূমিকা : "আমরা যারা গানগুলো তৈরী করেছি তারা প্রত্যেকেই পাঁচ বছর বা তার অধিককাল জেলে রয়েছি। এই জেলখানাতে আমরা গান শিখেছি, আর যারা আগে গান জানতাম জেলে এসে ভুলতে বসেছি। তাই গানের বাঁধনে, সুরে, বাণীতে প্রচুর ত্রুটি রয়েছে···। আমাদের ভুলত্রুটি মার্জনা করবেন এবং আপনাদের পরামর্শ ও অভিজ্ঞ মন্তব্য দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করতে সাহায্য করবেন।

—বিপ্লবী অভিনন্দনসহ, মেদিনীপুর জেলের বন্দীরা। ৫. ৭. ৭৪।"

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, এখানে কোথাও 'আমি' নেই, আছে 'আমরা'। এক জীবনবোধ, এক সংগ্রাম-সংহতিজাত এই 'আমরা'। গানগুলিতে অনেকেই হয়তো

অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন কলি সংযোজন করেছেন—সুরের ক্ষেত্রেও হয়তো তেমনটা ঘটেছে।

তবু, ব্যক্তিপ্রতিভাকে আমরা অস্বীকার করি না। মাঝে মাঝে কোনো গানের রচনার মধ্যে পারিপাট্য ও বৈদগ্ধ্যের মধ্যে ব্যক্তিমনের স্পষ্ট পরিচয় মেলে। একটি গান :

ঝড়ের বিষাণ উড়িয়ে নিশান
বেজেছে কখন জানোনা বন্ধু
পাগল ফাগুন এনেছে আগুন
কখন দুলেছে সপ্তসিন্ধু,
তুমিতো জানো না বন্ধু।
দেখেছো কেবল শত্রুর মুখ ভয়ানক যেন দৈত্য
দেখনি তো তার থর থর বুক দেখে মেহনতী সত্য,
কালো হাত তার কেড়ে নিতে পারে কিছু শহীদের প্রাণ
জানেনাতো তারা তাতে আরো বাড়ে পতাকার সম্মান।
ওঠো, হে বন্ধু, ভাই ভাই জান
এক হাতে অস্ত্র আর হাতে প্রাণ
রক্ত ফাগুন আনে যে আগুন
কখন যে জলে ক্ষোভ নিদারুণ
কখন দুলেছে সপ্তসিন্ধু, তুমি তো জানোনা বন্ধু।

খাতার মধ্যে যে ক'টি গান পেয়েছি তার মধ্যে কয়েকটিতে যে স্বাদ পেয়েছি তা রচনায় ও সুরারোপে অভিনব। চাষীর অতি কাছাকাছি ভাষায় ও রাঢ় অঞ্চলের সুরের মিশ্রণে এই গানটি হয়েছে অপূর্ব আকর্ষণীয় :

মোর জান প্রাণ ঐ লাল ধান আহা রে
তোল ভাইসব লক্ষ হাতে খামারে
লাগরে সবাই কোমর বেঁধে বাহারে
তোল ধান সব লক্ষ হাতে খামারে।

পৌষের এই শিশির ভেজা ভোরেতে
চল্ ভাই সব কাস্তে হাতে ক্ষেতেতে

ও বৌ শোন্ আলপনা দে দুয়ারে,
তুলবো ঘরে সোনার দানা এবারে।

সব সনে এই ক্ষেতে সবজনে এই হাতে
রুয়েছি এ ধান সাথে
পাইনিকো এক কণা রক্তে মোর ধান বোনা
জান গেছে মান গেছে সেই কথা ভুলবো না
জীবন কেটেছে বড় দুঃস্বপনে।

পৌষের এই শিশির ভেজা ভোরেতে
চল সব ধান তুলে মোদের ঘরেতে
ও বৌ শোন্ আলপনা দে দুয়ারে
তুলবো ঘরে সোনার দানা এবারে।

রোদেতে ঝড়েতে জলেতে জাড়েতে
ফলাই সোনা মাটির বুকে
সইব না সইব না—ভুখেতে দিনগোনা
দেবো না দেবো না এই মাটি এই সোনা
শেষ লড়াই লড়বো মোরা ফিরবো না রে।

'শেষ লড়াই'য়ের মধ্যে মাটির অন্তরঙ্গতা মাখানো এই গানটি বড়ো ভালো লেগেছে।

ভালো লেগেছে আরেকটি গান, যাতে দুই কাঠুরিয়ার জীবনালেখ্যের টানাপোড়েনে বোনা হয়েছে মিলিত সংগ্রামের কাহিনী। ভূমিহীন দুই কাঠুরিয়া বনবিভাগের সংরক্ষিত বনে গোপনে কাঠ কাটে :

মোরা চলি শুধু ভয় ডর ভাঙি গভীর অন্ধকারে
নির্জন পথে দুই কাঠুরিয়া কাঠ কাটিবার তরে—
ধরা পড়িলেই মোদের বন্ধু বাড়াভাতে পড়ে ধুলো
মোরা ভূমিহীন জমি নেই মোটে, জমিদার সব নিলো
... ...
কাছাকাছি গ্রামে কোলাহল থামে
গাছের পাতায় রাত্রি যে নামে

মোরা চলি শুধু ভয়ডর ভাঙি গভীর অন্ধকারে,
নির্জন পথে দুই কাঠুরিয়া কাঠ কাটবার তরে।

কাঠুরিয়ার নতুন পথের সন্ধান ও পরিশেষে জনগণের শেষ যুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মধ্যে গান শেষ হয়েছে। গানগুলির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে আহ্বান ;

এবার আসুক পাহাড়ী নদীর ঢল
ক্ষেতের কৃষক গণফৌজের গানের তালেতে চল।

ব্যক্ত হয়েছে স্বপ্ন :

মজুররাজের সত্যস্বপ্ন কৃষকের চোখে এনেছে আলোর বন্যা !

কিংবা—

আমাদের মুখে চেয়ারম্যানের নাম
মনের ছবিতে গাঁথা হয়ে আছে মুক্ত শ্রীকাকুলাম।

ব্যক্ত হয়েছে প্রতিশ্রুতি :

রক্তসাগরে ভাসাবো এবার আমাদের এই ছোট্ট নাও
যে-দরিয়াতে খুন ঢেলেছেন কৃষ্ণমূর্তি, সুব্বারাও !

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু যে শোধনবাদ তারই মূর্ত প্রতিভূ ক্রুশ্চেভ-ব্রেঝনেভকে নিয়ে ব্যঙ্গ ঝলসে উঠেছে কোনো কোনো গানে।

রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে এগিয়ে থাকা এসব গানের জন্মদাতা হলো দার্জিলিং জেলার সনের বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। সেই বজ্রনির্ঘোষের প্রথম প্রতিধ্বনি আমাদের কাছে কলকাতায় বহন করে নিয়ে এসেছিল একটি গান :

সর্ সর্ সর্ সর্ হাওয়া আয়ী
লালঝাণ্ডা উড়ী ফরফরকী
লড়াই কী ময়দান—
আজ চলা কিসান চলা মজুর
নিকলি না ঘব কিরে
লড়াই কি ময়দান···

নিভাঁজ ওরাওঁ সুরে এ গানটি রচনা করেছিলেন নকশালবাড়ির কৃষকনেতা শুক্রা গাওয়া ওঁরাও। শুক্রা ওরাওঁয়ের নিজের গলায় গানটি টেপ রেকর্ড করে এনেছিলেন উৎপল দত্ত, নির্মল গুহরায় ও তাপস সেন 'তীর' নাটকের মালমশলা সংগ্রহ করতে গিয়ে। অদ্ভুত জোরালো ও সুরেলা সেই কণ্ঠে আদিবাসীদের গলার একটা বিশেষ ভাঁজ ছিল—যা শত চেষ্টা করেও আমরা গলায় আনতে পারিনি।

এই রকম আরো কয়েকটা গান তাঁরা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তার মধ্যে ছিলো দার্জিলিঙের চা-মজুর শ্রমিক বীর প্রধান সম্পর্কে ভাঙা সুরে কয়েকটা ভাঙা গানের কলি। দার্জিলিঙ জেলার প্রধান গণনাট্য শিল্পী কালু সিং কলিগুলো সম্পূর্ণ করে দেন। 'তীর' নাটকের সংগীত পরিচালক হিসেবে এই সব গানকে ব্যবহার করার দায়িত্ব ছিল আমার, আমি এই বীর প্রধান গানটিতে একটি জনপ্রিয় নেপালী সুর সংযোজনা করি। দার্জিলিঙের চা-মজুর ও কৃষকের জঙ্গী সংহতির কথা অনেকেই জানতেন না, তাই এ গানটি 'তীর' নাটকে উপস্থিত করা আমাদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। গানটি আমাদের গণসংগীতের ভাণ্ডারে একটি অমূল্য সংযোজন হয়ে আছে।—

বীর প্রধান ও বীর প্রধান ও
দার্জিলিং কা চিয়াবাড়ি সরমায়াদারকো থলো
লড়নে পরছো ভন্নে বাটো তিমিলাই দেখায়ো
তেই ভুককো লড়াই মা ভয়ো শহীদ
তিমলাই লাল সেলাম ছ!…

সে সময়কার আরো কিছু জনপ্রিয় কালো গানের উল্লেখ করি। তরাই বন্দনায় লেখা হয়েছিলো গান :

তরাই জ্বলে গো, জ্বলছে আমার হিয়া
নকশালবাড়ির মাটি জ্বলে সপ্ত কন্যার লাগিয়া।…

লং মার্চের সবচেয়ে সংকটময় অধ্যায় টাটু-নদী অতিক্রমের ঘটনাকে স্মরণ ক'রে পশ্চিম বাংলার জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য ঘরছাড়া একদল যুবকের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিলো এই অমর গানটি :

টাটু নদীতে চলেছি সবাই
সিন্ধু গর্জনে কোনো ভয় নাই—…
কোটি জনকে পথ দেখায়
কমরেড মাও, কোনো ভয় নাই,
টাটু নদী আমরা পার হয়ে যাবো
পার হয়ে যাবোই সবাই… …

সবচেয়ে চমক লাগিয়েছিলো দুটি গান। একটি হলো 'বোকা বুড়োর গান', অন্যটি 'গাজীর গান'। পাঁচালী ঢঙে রচিত 'বোকা বুড়ো' গানটিতে অসাধারণ দক্ষতায় মাওয়ের সুবিখ্যাত 'বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন' রূপক কাহিনীর শিক্ষাকে

প্রয়োগ করা হয়েছিল এদেশের পরিস্থিতিতে। প্রস্তুতিপর্ব (প্রস্তুতি) এপ্রিল '৭৪ সংখ্যায় গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। সুদীর্ঘ এই গানটির সামান্য অংশ উল্লেখ করলাম :

...তিন পাহাড় মোদের দেশে বড়োই আপোষে।
জনতার বাঁচার পথ আগুলিয়া বসে॥
বিপ্লবেরই দল মোদের গল্পের বোকা বুড়া।
যে বুড়া নামাইতে চায় পাহাড়ের চূড়া॥
(বাঁচার পথের দিশা দেখরে···)
সবার সম্মুখে আছে গ্রামের পাহাড়।
প্রথমে ঘটাইতে হবে পতন তাহার॥
একথা বলিয়া মোদের বিপ্লবের দল।
গ্রামের চাষীর সাথে ধরেছে শাবল॥ ইত্যাদি ইত্যাদি

প্রস্তুতিপর্বের (প্রস্তুতি) একই সংখ্যায় প্রকাশিত 'গাজীর গান'টি আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয় নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গকৌতুকে শানানো। 'ওপেন থিয়েটার' গোষ্ঠী মাঠে ময়দানে এ গান গেয়ে সংগ্রামী মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। গানটির কিছু অংশ :

নয় জারের কথা শুনে ব্যথা পাবেন সত্যকথা
লম্বা চওড়া বাক্যি শুনে ধরবে আপনার মাথা।
—লেনিনের দেশের নেতা—
লেনিনের দেশের নেতা ব্রেঝনেভ হোতা আইলেন মোদের দেশে
গণ্ডা গণ্ডা চুক্তি হইল কত কলম পিষে
—ন্যাকা চৈতন্য—
ন্যাকা চৈতন্য, মান্যগণ্য কত মহাজন
চুক্তি কইরা দেশটারে ভাই দিলরে বন্ধন···
ভিলাই বানাইল পিঠ কিলাইল ঐ রাশিয়ান
আর রেডিওতে শুনি রোজ সমাজবাদের গান
—দেশে খাদ্য নাই—

এ প্রসঙ্গে আর দুটি গানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শ্রীকাকুলামের মহান নাট্যকার ও গণগীতিকার শহীদ সুব্বারাও পানিগ্রাহীর অবিস্মরণীয় 'কাষ্টাজীবুলম মেমু কম্যুনিষ্টলম্' গানটির বাংলা অনুবাদ করেছেন অনুজপ্রতিম বোম্মানা

বিশ্বনাথম্। 'মেমু কম্যুনিষ্টলম্' নামেই সারা তেলুগুভাষী জনতার মধ্যে পরিচিত। গানটির কিছু অংশ :

ন্যায়ের পতাকা তুলেছি আমরা
অন্যায়েরই যম
বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে লক্ষ্যে
চলেছি জোর কদম।···আমরা কমিউনিস্ট্
মোদের ঝাণ্ডা লালে লাল খুনে
মেহনতী জনতার,
দুচোখে স্বপ্ন শত শহীদের
চলেছি দুর্নিবার। আমরা কমিউনিস্ট্
হাত দিয়ে বলো, সূর্যের আলো
রুখিতে পারে কি কেউ
আমাদের ধ'রে ঠেকানো কি যায়
গণ জোয়ারের ঢেউ।···আমরা কমিউনিস্ট

* * *

থাকব না মোরা নিজেদের জেলা
নিজেদের জাতি নিয়ে
সারা দুনিয়ার মজদুর মোরা
বাঁধিব ঐক্য দিয়ে।···আমরা কমিউনিস্ট্।

এ বেলায়ও আমার আফ্শোষ এসব গানের সঠিক সুরগুলো এখনো পেলাম না। সুর পেলে নিশ্চয়ই কিছু গান পশ্চিমবঙ্গেও চালু করা যেত।

অন্য যে গানটির কথা বলবো, সেটি একটি সাঁওতালী গান। যে মহিলার কাছ থেকে গানটি পেয়েছি, তিনি নিজে ছিলেন একজন বিপ্লবী কর্মী। কয়েকজন সাঁওতালী বিপ্লবী বন্দী মেয়ের সঙ্গে এক জেলে ছিলেন তিনি। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর গলা ছিলো অত্যন্ত সুরেলা, আদিবাসী সুরের ঢংটি তিনি অদ্ভুত আয়ত্ত করেছিলেন। খাঁটি সাঁওতালী ভাষায় ও সুরে গানটি রচিত।—

হুডুর বিজলী মালকা কাণা
দা-আই কাওতে
দিসম হরকর চমকা কাণা
লড়াই আই কাওতে···

মাও সেতুং চিন্তাতে
মারাং মারাং তে
সানাম জাতি রেজেঞ্জ বোইহা
দায়া একোরা······

গানটি সাঁওতালী ভাষায়, কাজেই পুরো গানটি এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ১৯৬৯ সালে গোপীবল্লভপুরের কৃষক সংগ্রাম এ গানটির জন্মদাতা। রচনা করেছিলেন ওখানকারই এক সংগ্রামী দম্পতি লোকচাঁদ টুডু ও কুনী টুডু। অর্থটা মোটামুটি এই রকম : আকাশে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। এখনি বৃষ্টি আসবে। অস্থির হয়ে আছে আকাশ বাতাস পৃথিবী। তেমনি অস্থির হয়ে আছে সমস্ত গরীবগুলি। কোকিল-কোকিলা বলছে, শত্রু এখন সজাগ সতর্ক হয়ে আছে। তাই আরো ঐক্যবদ্ধ হও। মাও সেতুং চিন্তাধারায় ধাপে ধাপে মুক্তির দিকে এগিয়ে চলো। আদিবাসী চতুর্স্বরিক সহজ, প্রাণবন্ত সুরে গাওয়া এই গানটির আবেগ অসাধারণ। লোকসংগীতের রূপান্তরের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার একটি অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত এই গান।

উপসংহারে একটি কথা বলতে চাই। তেলেঙ্গানার বিদ্রোহ তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বের চরম ভ্রান্তির জন্য ব্যর্থ হলেও সেদিন গানে, কবিতায় নাটকে তার যে প্রতিধ্বনি আমরা শুনেছিলাম—বিশেষতঃ দক্ষিণভারতের কৃষিসমাজের সাংস্কৃতিক সৌধে যে পূবারুণ দেখেছিলাম—তা ব্যর্থ হয় নি। অন্ধ্র গণনাট্যের "মাভূমি" ছিল আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ নাটক। লোকগাথা ও বুররাকথা'য় শংকর সত্যনারায়ণের মতো বিপ্লবী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল। ঠিক তেমনি বাম হঠকারী চরম ভ্রান্তির জন্য নকশালবাড়ি ব্যর্থ হয়ে গেলেও বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত ভারতের চাষীসমাজে যে নতুন চিন্তার ঢল নেমে এসেছিল, যার প্রতিফলন পাই বিভিন্ন গানে, কাব্যে, নাটকে, তা অবিনশ্বর।

…সত্তরে যাঁরা গণসংগীতের ক্ষেত্রে এসেছিলেন তাঁরা পরম্পরা রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা অনেকেই নিজেরা গান বাঁধতেন, সুর দিতেন, গাইতেন। যাঁরা গান বাঁধতেন না, একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণে গানের বাণী হয়ে উঠত তাঁদেরও নিজেদের কথা। এই সহমর্মিতার ফলে গান গায়কেরও নিজস্ব হয়ে উঠত। এই আন্দোলনের জোয়ারে স্বতঃস্ফূর্ত গান এসেছে মেহনতি মানুষের কাছ থেকে, শহরের ছেলেদের কাছ থেকে, সমাজের অবহেলিত মানুষের কাছ থেকে। এই নির্বিশেষ একাত্মবোধ এই আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল দিক। শুকরা ওরাঁও-এর গান-শোনা গেছে শহরের ছেলেমেয়েদের গলায় অবিকৃত রূপে। শহরের ছেলের জেলে বসে লেখা গান গেয়েছেন গ্রামের মানুষ। গণসংস্কৃতির এই ব্যাপারটি আমাদের দেশে যাঁরা নিছক রাজনীতি করেন, তাঁরা সকলে বুঝতে চান না।

দুঃখের বিষয়, নকশালবাড়ির নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বৈপ্লবিক ভূমিকার তাৎপর্য প্রথম থেকেই বুঝতে পারেন নি। নকশালবাড়ীর সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেসব শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী নূতন বৈপ্লবিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের অধিকাংশই এই পার্টির সদস্যভুক্ত ছিলেন না, যদিও তার প্রতি তাঁরা অনুরাগী ছিলেন। এইসব শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব তাঁরা নিলেন না। তাঁরা বুঝলেন না যে সাংস্কৃতিক লড়াই সশস্ত্র লড়াইয়ের ময়দান তৈরী করে। 'ইয়েনান ফোরামের' কথাও তাঁরা ভুলে গেলেন। সামরিক বাহিনী ও সাংস্কৃতিক বাহিনী না হলে জয়লাভ সম্ভব নয় বলে মাও-য়ের উক্তির গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। যখন তাঁরা সংস্কৃতির কথাও বলতেন তখন তাঁরা প্রলেট কাল্টের ডাণ্ডা ঘুরিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথকেও বর্জন করেছেন। পার্টিভুক্ত না হলেই যাঁরা বিরূপ হতেন, তারা কি জানতেন না যে লু শুন পার্টিভুক্ত ছিলেন না।

কোনো শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেবার আগে প্রস্তুতি হিসাবে, সামরিক বাহিনী পাঠাবার অনেক আগে সাংস্কৃতিক বাহিনীকে ময়দানে পাঠায়। এ হল ইতিহাসের বাস্তব সত্য। প্রথম আন্তর্জাতিক গঠনের পর থেকেই ইয়োরোপ শ্রমিকশ্রেণী তার সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়তে শুরু করেছিল। উনিশ শতকে রুশ দেশে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিল্পসাহিত্যের অসাধারণ বিকাশ ঘটেছে। অক্টোবর বিপ্লবের অনেক আগেই গর্কির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিকদের বাহিনী ময়দানে নেমেছিলেন। চীনের পার্টিগঠনের আগেই ১৯১৯এর ৪ঠা মের আন্দোলনে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাংস্কৃতিক বাহিনীর সংগঠন শুরু হয়। সাংস্কৃতিক সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে চীনে সামরিক বাহিনীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পথ তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। বিপ্লব সফল হবার পরেও এই সংগ্রাম তীব্র আকারে চলতে থাকে। না হলে সেই পথেই শত্রুবাহিনী আবার ক্ষমতাদখলের চক্রান্ত করে। তার মানে সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষ যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নিলেও সাংস্কৃতিক বাহিনীর কোনো পর্যায়েই বিশ্রাম নেওয়া চলে না। কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক বাহিনীর রণনীতি ও কৌশল অত্যন্ত জটিল, সেই বাহিনী গড়বার কৌশলও আলাদা। মেহনতী মানুষের পার্টি যদি সেই কৌশল আয়ত্ত না করতে পারে, তবে মতাদর্শগত যুদ্ধে তার পরাজয় কে ঠেকাবে। তার প্রভাব তার সামরিক বাহিনীর উপর পড়বেই।

বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও ব্যবস্থা যখন দেউলে হয়ে যায়, জনসাধারণের প্রতিরোধকে যখন সে আর রুখতে পারে না তখন সে সাংস্কৃতিক দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা ও প্রত্যাঘাত করতে চায়। সেটা তার সবচেয়ে নিরাপদ দুর্গ। এটা কি আমরা সত্তরে দেখতে পাইনি? এখনও কি দেখতে পাচ্ছি না! ১৯৬২ সালের ঘটনা থেকে কি আমরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করব না? প্রতিক্রিয়ার দমননীতি কিংবা কোনো বিশিষ্ট শিল্পীর বিশ্বাসঘাতকতা একটা আন্দোলনকে দমাতে পারে না, যদি সে আন্দোলন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট নীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সেটাই হয়নি।

এই না-হওয়ার কারণে নয়া গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলা এখনও সম্ভব হয়নি। এই আন্দোলন আমাদের অনেক গণসংগীত দিয়েছে, অনেক শিল্পী দিয়েছে, অনেক লেখক দিয়েছে। বর্তমান গণসংগীতের প্রচারে রয়েছে অনেক চারণদল। এই সব চারণদলের স্বল্প-পাওয়া ছেলেমেয়েরা অপসংস্কৃতি ও স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইতে ভাগ হয়ে রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে। এরা নিরলস-ভাবে গণসংগীতের প্রচার ও প্রসারে লেগে রয়েছে। এঁরা বিভক্ত বলে এঁদের সাধ্য ও ক্ষমতা সীমিত। বৃহতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে বৃহৎ প্রস্তুতির দরকার, তারই অভাব এঁদের মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে বড় অভাব যা তা হলো, স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে একই সংগ্রামে পারস্পরিক সহযোগিতার। পার্টির তরফ থেকে কোনো রাজনৈতিক দিশা না থাকার কারণে এই ছত্রভঙ্গ অবস্থা। বার রাজপুতের তের হাঁড়ি হলে কি লড়াই জেতা যায়?

একটা জিনিস বোঝা একান্ত প্রয়োজন যে, গণসংগীতের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হচ্ছে মাস মিডিয়া বা স্থিতিরক্ষার সর্বব্যাপী প্রচার মাধ্যমগুলি। এই প্রতিপক্ষ অত্যন্ত সক্রিয়, তার শক্তি ও ক্ষমতা অপরিসীম। গণসংগীতকে স্থিতাবস্থার প্রচার-মাধ্যমের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে হবে সৃষ্টির ভিতর দিয়ে। এই মোকাবেলায় সংস্কৃতি দিয়ে অপসংস্কৃতিকে হঠাতে হবে।

কিন্তু সংগীত তো সুর বা বাণীমাত্র নয়। সংগীতের প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে কণ্ঠ। এই গানের লড়াই কণ্ঠেরও এক জোরদার লড়াই। অপসংস্কৃতিতে এমনও সুকণ্ঠ আছে যা চর্চা দ্বারা পরিশীলিত, যার আকর্ষণী ক্ষমতাও অপরিসীম—যাদের কণ্ঠের যাদুর টানে মানুষ এদের গানের দিকে ঝোঁকে। এরা স্থিতাবস্থার অন্যতম সহায়। গান শুধু সুর বা বাণী দিয়ে শিল্প হয় না। যেহেতু তা নয়, তার শিল্পরূপের ব্যাপারটাই নির্ভর করে পরিবেশনের উপর। স্থিতাবস্থার শিবিরের সুকণ্ঠের সঙ্গে

লড়াইয়ে নামতে হলে দরকার উপযুক্ত সুকণ্ঠের। চর্চার দ্বারা কণ্ঠ তৈরি না করে লড়তে গেলে লড়া যাবে না। দুঃখের বিষয় যাঁরা গণসংগীত করেন তাঁরা অনেকেই কণ্ঠের দিক থেকে সেই স্তরে উঠতে পারেন না—যে-স্তরে কণ্ঠকে হাতিয়ার করে তোলা যায়। কয়েকটা গান গাইলেই তা গণসংগীত হবে না, যদি তা সুর, বাণী ও কণ্ঠের সমন্বয়ে মানুষকে আকর্ষণ করতে না পারে, সজাগ করতে না পারে। তাই পরিবেশনের দিক বাদ দিয়ে গণসংগীত ভাবা যায় না।

কয়ের বা বৃন্দ গানে দেখা গেছে, যাঁরা মিউজিক কর্ড বোঝেন না, সাংগীতিক নিয়ম বা প্রক্রিয়া জানেন না, তাঁরা সেই ঢঙে গান তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। যার ফল আদৌ আশাব্যঞ্জক হয়নি।

গণসংগীত দিয়ে যদি মানুষকে টানা না যায়, তাকে উদ্দীপিত করা না যায়, তাহলে সেই সংগীতের উদ্দেশ্য কী? গণসংগীত আজ ব্যাপকভাবে গাওয়া হলেও তার পরিবেশনের মান কি খুব একটা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে? স্থিতাবস্থার প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য হাতিয়ারে যে শাণ প্রয়োজন, তা কি দেওয়া সম্ভব হয়েছে? ভোঁতা হাতিয়ার নিয়ে কি লড়াই চলে?

আরও একটা কথা এই যে, জনতার কাছে যেতে গণসংগীতের ভিত্তি করব কোন্ মাধ্যমকে? গণসংগীত এবং লোকসংগীত এক নয়। গণসংগীতের ভিত্তি একমাত্র লোকসংগীত হতে পারে না। গণসংগীত আরো ব্যাপক, আরো বৃহত্তর। মুকুন্দদাস লোকসংগীতের রূপের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন রাগসংগীতকে। সেই সংশ্লেষে গড়ে উঠেছিল মুকুন্দদাসী রীতি। এই রীতি একদিন এ দেশের জনচিত্তে তুমুল সাড়া তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ দেশী শিল্পরূপকে মনে রেখেই তাঁর গানে ঘটিয়েছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নানা সুরের আত্তীকরণ। সেই সমন্বয়ের স্রোতে বিচিত্র সব উপাদান এক হয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রসংগীতের ধারা। প্রয়োজন মতো আধুনিক গানের রীতি এবং স্প্যানিশ গীটার, বঙ্গো প্রভৃতির গুণাবলীও গণসংগীতে আত্তীকরণ করতে হবে। এইগুলির মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, জনচিত্তকে দোলা দেবার উপাদান আছে তা ব্যবহার করতে হবে। মাও বলেছিলেন, আমরা অতীতের আগাছা নিড়াই নূতন সৃষ্টির কাজে। অতীতকে না জেনে অতীতের আগাছা নিড়ান সম্ভব নয়। পরম্পরকে আমাদের জানা প্রয়োজন, সংশ্লেষ, গ্রহণ, বর্জন, নবীকরণের কাজে। যে নিজের পরম্পরাকে জানে না, তার পায়ের নিচের মাটিও মজবুত হতে পারে না। ইতিহাসজ্ঞানের দ্বারাই ইতিহাসের বিশ্লেষণ সম্ভব, পল্লবগ্রাহী বিদ্যা দিয়ে নয়। আর স্তালিনের কথা টেনে ফের বলতে হয়, শিল্প

বিষয়গতভাবে আন্তর্জাতিক, কিন্তু রূপগতভাবে দেশীয়। গণসংগীতের ক্ষেত্রে এই কথা বিশেষভাবে খাটে। গণসংগীতে মেহনতি মানুষের আন্তর্জাতিক সহমর্মিতার বাণী থাকবে, কিন্তু তাঁর অজস্র রূপগত আত্তীকরণের মাধ্যমে তাতে থাকবে দেশীয় আইডেনটিফিকেশন।

পরিশেষে, সত্তরের উত্তরাধিকারে আজ অনেক গণসংগীত গোষ্ঠী সক্রিয় থাকলেও, ঐক্যবোধের অভাবে সংগ্রামের আসল শক্তিই শিথিল হয়ে পড়ছে। গণসংগীতকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করতে হলে চাই একতা, ও পারস্পরিক যোগাযোগ। বিচ্ছিন্নতাই গণসংগীত আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

৬

লোকসংগীতের একাল না আকাল ?

মারিফতী গানে মুরীদ অর্থাৎ শিষ্য তার মুরশিদ অর্থাৎ গুরুকে জিজ্ঞাসা করছেন : "মুরশিদ কই আইলাম অ, নির্ণয় না পাই মুরশিদ কই আইলাম অ।" সে যুগে মুরশিদের কাছে প্রশ্ন ছিল একটাই। কিন্তু একালের মুরশিদের সামনে হাজার জনের হাজার রকমের প্রশ্ন—বলুন তো, লোকসংগীতের সংজ্ঞাটা কী ? আকাশবাণী আগে ঘোষণা করত পল্লীগীতি এখন বলে লোকগীতি, এটা কি আকাশবাণীর কর্তাদের শুধু মর্জি, না এর মধ্যে কোনো তাৎপর্য আছে ? প্রাচীন লোকগীতি ও আধুনিক লোকগীতির সীমান্তরেখাটা কোন্ তারিখ ও কোন্ সনের ওপর দিয়ে টানা হয়েছে। যদি টানা না হয়ে থাকে তবে এই সীমান্ত-বিরোধের মীমাংসা করছে কে ? গ্রামোফোন কোম্পানী দমদম কারখানায় 'ফোক-সং' তৈরি করে স্টার লেবেলে বাজারে যা ছাড়ছেন, সেগুলি সত্যি 'সং' না 'সঙ' ? অমুক বিশ্ব-বিখ্যাত পল্লীগীতি গাইয়ে কিংবা তমুক গোল্ডমেডালিস্ট বাউল ফাংশনে ফাংশনে যা পরিবেশন করে বেড়াচ্ছেন—এর নামাকরণ কি ফোক, না ফোকো-মডার্ন ? লোকসংগীতে বাহে, বা বাঙ্গালদের উপভাষা পরিশোধিত করে নেয়া উচিত না অনুচিত ? ......ইত্যাদি শত শত প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত মুরশিদ। শহরের সুরের সুরা আর তালের তাড়িতে মাতালদের ভাটিখানায় গাঁয়ের জলভরা সুন্দরী কন্যাকে রোজ ধর্ষিতা হতে দেখছেন মুরশিদ অসহায়ের মতো। "দুঃখের কথা কার কাছে কই গিয়া ?" এমন সময় সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদিকা তাঁর বহুল প্রচারিত পত্রিকার গণ্যমান্য বিদগ্ধদের সভায় মেহেরবাণী করে এই গ্রাম্য আউলিয়াকে দু-কথা পেশ করার জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু মুশরিদ তো আলিম আদমী নয়। গবেষক পণ্ডিতদের ভাষায় সে তো কথা বলতে জানে না। মুরশিদ মরমীয়া। নিম্নস্তরের হালধরা ও 'হাইল ধরা' কড়াপড়া হাতের গ্রাম্য মানুষগুলির সুখে-দুঃখে ও শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মরম দিয়ে মিশ্‌লেই কেবল লোকগীতির সমজদার হওয়া যায় মুরশিদ এই কথা মনে করে। পণ্ডিতালীতে তা বোঝা যায় না। তাদের পক্ষ থেকেই সহজ ভাষায় মুরশিদ কিছু নিবেদন করতে চায়।

'এমন উল্টা দেশ বা গুরু'

গ্রাম্য পালাগানের প্রস্তাবনা গাইতে গিয়ে গ্রামের বয়াতী আরম্ভ করেন :

পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর—
একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর।

কিন্তু মুরশিদ এই আলোচনায় প্রস্তাবনায় কী গাইবে? 'চৌদিকে পশর' ত সে দেখতে পাচ্ছে না। সে দেখছে চৌদিকে কুয়াশা। ধোঁয়াশা আর সেই ধোঁয়াশার পশ্চাৎপটে চলছে এই উলটপুরাণ পালা। চারদিকে লোকসংগীতের ছয়লাপ। আকাশবাণীতে সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে দশটা অবধি কত নতুন নতুন গলা। লোকসংগীতে গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট পেলেন কত সুধীব্যক্তি। সংগীত-নাটক একাডেমী কত বৃত্তির আয়োজন করেন প্রতি বৎসর। সরকারী সাহায্য পাওয়া কত সংগীত গবেষণা কেন্দ্র। পাড়ার 'ফাংশন' নামীয় বিচিত্র বারোয়ারী ভোজে লোকসংগীতের চাটনি না থাকলে তো চলেই না। তাই বলছিলাম চারদিকে লোকগীতির ছয়লাপ। অথচ লোকগীতি কই? বানে ভেসে গেল দেশ—কিন্তু পিয়াসার পানি কই? তাই মুরশিদের গাইবার মন যায় দেহতত্ত্বের একটি গান "এমন উল্টা দেশ বা গুরু কোন জায়গায় আছে?"

এখানে কেউ আবার বলতে পারেন—কিন্তু এই 'উলটপুরাণ' কি কেবল লোকসংগীতের বেলায়? দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং সেজন্য যত অর্থব্যয় বাড়ছে—শিক্ষিতের মান ও সংখ্যা তত যাচ্ছে কমে। দেশ উন্নয়নের জন্য যতই পরিকল্পনা হচ্ছে ততই বাড়ছে বেকারী, বিদেশ থেকে যতই খাদ্য আমদানী হচ্ছে ততই খাদ্যের অনটন ইত্যাদি। তার জবাবে মুরশিদ বলতে চান—সে জন্য আছে আন্দোলন, বিক্ষোভ মিছিল, ঘেরাও, ধর্মঘট ইত্যাদি। কিন্তু সংগীতের উলটপুরাণ পালার গায়ন ও বায়নদের ও তাদের প্রধান আখড়া আকাশবাণী কিংবা গ্রামোফোন কোম্পানীকে ঘেরাও করার কথা কি কেউ ভাবতেও পারেন? সংস্কৃতির বিকৃতির বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন তো দেখছি না, বরঞ্চ এই বিকৃতির উপাসনায় রত মুনাফার কাপালিকরা মঞ্চ দখল করে আছে সর্বত্র। সেখানে তার প্রথম বলি, বাপ-মা হারা এতিম লোকগীতি। রবীন্দ্রসংগীত, রাগসংগীতের পাহারাদার অনেক আছেন। বিকৃতির বিরুদ্ধে কাগজেপত্রে তাঁরা লেখালেখিও করেন। কিন্তু গেঁয়ো চাষার গানের বিকৃতির বিরুদ্ধে সওয়াল জবাব করার মতো কোনো উকিল মোক্তার নেই। রবীন্দ্রসংগীত, রাগসংগীতের মুরুব্বীয়ানদের অনেককে দেখেছি লোকসংগীত সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানেন না, এবং এই না জানার জন্য এঁরা লজ্জাবোধও করেন না। এঁদের এই অজ্ঞতাই সেই বিকৃতিকে সাহায্য করে চলেছে।…

॥ দুই ॥

…সাপুড়ের বাঁশী যখন বাজে—একটানা সুরে তিন-চারটি স্বরের স্বরসঙ্গতি এমন মাধুর্য, এমন মোহ সৃষ্টি করে যে, তার প্রধান শ্রোতা ফণামেলা বিষধরটিকেও তখন মনে হয় কী সুন্দর! আধুনিক 'ফাংশন' নামীয় বিচিত্রানুষ্ঠানের দর্শককে যদি সাপের সঙ্গে এবং শিল্পীকে সাপুড়ের সঙ্গে তুলনা করি তবে সুরপ্রেমী বিষধরকে অপমান করা হবে। আধুনিক শিল্পীকে বলতে পারেন 'জকি' এবং দর্শককে ঘোড়-দৌড়ের জুয়াড়ী। যে উপমাই দেন না কেন এ-দর্শকের সংজ্ঞা ঠিক করা কঠিন।

কিছুদিন আগে আমাকে কলকাতার একজন খ্যাতনামা গায়ক বলেছিলেন: "কলকাতা এবং জেলা শহরের বিচিত্রানুষ্ঠানগুলির সংগঠক হলো স্থানীয় মাস্তানরা কিংবা ঘুঘু ফড়েরা, শিল্পীকেও তাই তবলচী-'কাম'-লড়াকু বডিগার্ড একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়, কখন কী হয় বলা যায় না।" এতো হলো সংগঠকদের চরিত্র, কিন্তু দর্শকের চরিত্রটা কী? এরা কেবল শুনতে আসে না, দেখতেও আসে। তা না হলে ওদের শ্রোতাই বলতাম—দর্শক বলছি কেন? কাকে দেখতে আসে? তাদের প্রিয় স্টার শিল্পীকে। এই স্টাররা স্বকীয় গুণে ততটা ঝলসান না, যতটা ঝলসান ধারকরা রশ্মিতে। পাবলিসিটির গ্র্যাণ্ড কোরাসে—চলচ্চিত্রের নেপথ্যকণ্ঠ, বেতারের ইথারকণ্ঠ, রেকর্ড কোম্পানীর ভৌতিককণ্ঠ সব মিলে কিছু নির্বাচিত কণ্ঠ মানুষের কানের ভিতর দিয়া দিনরাত মরমে বিদ্ধ হয়ে যায়, আর সেই বিশেষ বিমূর্তকণ্ঠগুলি বিচিত্রানুষ্ঠানে বিশেষ বিশেষ শিল্পীর আকারে বায়ুস্ফীত ব্যক্তিত্বের মূর্তিধারণ করে হাজির হয়। এদের দেখবার আনন্দ আছে—খালি শুনবার নয়। তখন কিন্তু কেউ ভাবে না এই বিড়ালই বনে গেলে বন-বিড়াল হয়।

স্টার লোকসংগীত গায়ককেও ভেক ধারণ করেই হাজির হতে হয়, না হলে ভিখ মিলে না। কিন্তু কী গান দর্শক চায়? দর্শকের 'মুড' সাধারণত কী থাকে? এককথায় সে আসে ফুর্তি করতে। প্রেক্ষাগৃহের ভাটিখানায় সুরের সুরা পান করে মাতাল হয়ে নাচতে। যাঁরা গলা বেচে খান—অর্থাৎ শিল্পীরা হলেন সেখানে সুরাপাত্র হাতে সুরা-সাকী। কাজেই তাঁরা লয়ের খেল দেখিয়ে কণ্ঠনালী ও মিউ-জিকের মল্লযুদ্ধে আসর সরগরম করে তোলেন।

এই হুল্লোড়বাজীতে লোকসংগীতজ্ঞকেও এসে যোগ দিতে হয়। ভাবের চেয়ে ভঙ্গি সেখানে বড়—মাথার চেয়ে বড় খোঁপা। ভঙ্গি মানে 'স্টাইল' অর্থে নয়—একেবারে অঙ্গভঙ্গি। একথায় আসার আগে মিউজিকের কথা একটু বলে নিই। নৃত্য-সম্বলিত লোকসংগীতে ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়াও বাজে। কিন্তু আমাদের

শহুরে লোকশিল্পীরা দোতারা—একতারার গান গাইতে গিয়েও পারেন তো ঢাক-ঢোল কাড়া নাকাড়ার সাথে আফ্রিকান 'বঙ্গো, কঙ্গো'কে হাজির করেন। সে আবার অতি স্পর্শকাতর দু-তিনটি মাইকের সাথে একেবারে নরক গুলজারী ব্যাপার। এর মাঝে মাঝে বন্ধুরে—ভাইরে—ভোলামন বলে তারার পঞ্চমে প্রচণ্ড চীৎকার মারলেই হলো।

এতসব যদি বাদও দেন তবু এখন খমক আগে বাউল পরে। কোমরে বাঁধা ডুগী, পায়ে নূপুর আর এক হাতে একতারা, বাউলের সেই পুরাতন মোহন ছবিটি আর দেখি না। শহরে তা অচল। গুব্‌গুবীরই জয়জয়কার। কোনো নিমীলিত নেত্র-রবীন্দ্রসংগীতের পর ঝিমিয়ে পড়া দর্শক মাইকের মধ্যে গুব্‌গুবীর প্রচণ্ড আওয়াজে কোমর সিধা করে, কান খাড়া করে উঠে বসেন। এবার আসর জমবে। এর সাথে যদি থাকে নাচ, তবে তো গরম চায়ের সাথে তেলে ভাজা (ভেজাল তেলের হোক না)।

এবার ভঙ্গির কথায় আসা যাক।

আকাশের বিজলী হানা
বুক হইলো মোর ফানা ফানা
বুকের কাপড় হাওয়ায় উড়াইয়া নিলরে—

লোকসংগীতের এই সহজ কলি কয়টিতে বাংলার প্রান্তরের পল্লীমেয়ের যে অপূর্ব ছবিটি ভেসে ওঠে কোন্ শহুরে কাব্যে এর তুলনা মেলে? কিন্তু একেলে শহুরে লোকশিল্পী সেখানে হারমনিয়মের হুল্লোড়ে আর তবলার চাঁটিতে অঙ্গভঙ্গি করে 'বুকের কাপড়' কথাটার সাথে বুক নাচানোমাত্র দর্শকের মধ্যে কী প্রচণ্ড আলোড়ন! সেই বুকের কাপড় খসে পড়ার কল্পিত অশ্লীলতায় কী মজা। গাঁয়ের মেয়েকে 'টপলেস' ভাবতে কী ভাল লাগে!

আরেকটি গানের কথা বলছি। লোকসংগীতে বা লোকসংস্কৃতিতে সবকিছুই ভালো এমন নয়। লোকসাহিত্যে সামন্তযুগের অবক্ষয়ী ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান। এ-গানটিও সেই অবক্ষয়ী ধারণাপ্রসূত, লোকসংগীতের জীবনধর্মী ঐতিহ্য-বিরোধী। এক বিমর্ষ শ্মশান-বৈরাগ্যের গান:

আমি হারাইলাম দুকূল,
একূল আর ওকূল
কবে ফুটিবে মন তোর
বিয়ের ফুল।

যেই 'বিয়ের ফুল' কথাটা শোনা, অমনি দর্শকের প্রাণ নেচে উঠলো। গায়কও এই শব্দটিকে কত ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপরেই কিন্তু আছে :

যাব চলন করি বাঁশের দোলায় চড়ি
জাতবেহারার স্কন্ধে চড়ি
সকল হবে ভুল
আগেপাছে কাষ্ঠের বোঝা
ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা
শ্বশুরবাড়ি হবে রে তোর
নদীর কূল।

গানটার তারপরে আছে শবদাহের বর্ণনা।

...কিন্তু কে তা শোনে ? শ্মশানঘাটেই হোক বা যমরাজের বাড়িতেই হোক 'বিয়ের ফুল' ফুটলেই হলো !

আপনারা হয়ত বলবেন মুরশিদ বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। হ্যাঁ, মুরশিদ তিক্ত, একটু বেশি তিক্ত। কিন্তু 'সিনিক' নন। তিক্ত। শহরের শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মত এমন অশিক্ষিত বিকৃত শ্রেণী দেশে আর কেউ নেই। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই। কিছুদিন আগে মুরশিদ মেডিকেল ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সংগঠক ছিলেন ছাত্র ফেডারেশন নিয়ন্ত্রিত কলেজ ইউনিয়ন। কাজেই কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট সমর্থক ধরে নিতে পারি। তাও আবার মেডিকেল ছাত্র। কাজেই ছাত্রদের মধ্যে এরা প্রগতিশীল রুচিবান অংশ এও ধরে নিতে পারি।

এক একেলে বাউল উঠলেন—গান গাইতে। তাঁর কাছে অনুরোধ এলো "গোলেমালে পীরিত করো না।" এই গানটি নাকি 'নায়িকা সংবাদ' নামক এক চলচ্চিত্রের 'বক্স অফিস' বাউল। বাউল গলায় বিভিন্ন কণ্ঠের প্যাঁচ কষে দুটি শব্দে ঘুরে-ফিরে আসছিলেন "পীরিত করো না।" ছাত্ররা কী খুশি। কিন্তু বাউল দেখলেন তাতেও ঠিক জমছে না। তখন তিনি নাচতে নাচতে একবার এসে মাইকের মুখে মুখ লাগিয়ে ফিসফিসানিতে পীরিত করো না বলেই একটা চোখ টিপে দিলেন। আর যায় কোথা। 'হল্' একেবারে ফেটে পড়লো। মঞ্চ থেকে বাউল নেমে এসে মুরশিদকে এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললেন : "দাদা, আপনার খারাপ লাগবে জানি, কিন্তু আপনার কথা শুনলে গরীব বেচারাকে না-খেয়ে মরতে হয়। দেখলেন তো মেডিকেল ছাত্ররা পর্যন্ত কেমন নিয়েছে ?" (অবশ্য টাকাও পুরো পে করেছে)।

কোনো উত্তর দিতে পারি নি তখন। কারণ তখন আমি বাউলের কথা ভাবছিলাম না। ইংরেজীতে যাকে বলে 'পেইড পাইপার' আজকের শিল্পী হলেন সেই 'কেনা গায়েন।' আমি ভাবছিলাম দর্শকের কথা। এই হলো 'বিপ্লবী' ছাত্রদের রুচিবোধ। এই দেশের হবে কী?

আমি আগেই বলেছি সামন্ত প্রভাবে উচ্চশ্রেণীর ধ্যান-ধারণার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিকেও আচ্ছন্ন হতে দেখা যায়। কিন্তু তারও একটা প্রকৃতি আছে। তিন্নাথের কিংবা বাউল-আউলের গাঁজার আড্ডায় সবকিছুই ভালো নয় —কিন্তু মুরশিদ সেখানে বারে বারে যেতে রাজী, কারণ—সুর পাওয়া যায়, গান পাওয়া যায়, যার মধ্যে অনেক কিছু আছে। কিন্তু শহরের এই হাফ্-হিপিদের 'এল এস ডি' বা 'মারিজুয়ানার' আড্ডায় সুরের কিছুই নেই। আছে অসুরের হুল্লোড়।

এখানে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন—কে কাকে নষ্ট করছে? দর্শক শিল্পীকে, না শিল্পী দর্শককে? প্রশ্নটা বড়। পরে আলোচনা করবো। আজ এখানেই তবে ইতি টানি।

॥ তিন ॥

এক গ্রাম্য কবিরাজ নাকি খবরের কাগজে বেহালার পাচনের বিজ্ঞাপন দেখে বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অনেক পাচনেরই নাম আছে কিন্তু বেহালার পাচনের কোনো উল্লেখ তো পাই নি। চরক সুশ্রুতের আমলে বেহালা ছিল কি না জানি না, অন্তত সংগীতশাস্ত্রে তার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু এ যুগে আকাশবাণীর রসের ভিয়ানে যে বেহালার পাচন তৈরি হচ্ছে— তার আস্বাদ সংগীতাক্রান্তরা প্রায়ই পেয়ে থাকেন।

একজন নতুন লোকসংগীতশিল্পী একদিন আমাকে বলছিলেন, আকাশবাণীর বাদ্যযন্ত্রীদের খেয়ালের কথা। তিনি চাইছিলেন 'খমক'। খমক বাজিয়ে সেদিন নাকি অনুপস্থিত কিন্তু আকাশবাণীর একজন যাদুকর-যন্ত্রী নাকি বলে উঠলেন "তাতে কি যায় আসে, বেহালা দিয়েই আমি খমকের 'এফেক্ট' দিতে পারি।" বিশ্বাস করুন আর না করুন বেচারা নতুন শিল্পীটি সেদিন বেহালার খমকেই বাউল গাইলেন। এরই নাম 'বেহালার পাচন'। বিশেষ করে নিরীহ নতুন শিল্পীদের জন্য এই পাচনের ব্যবস্থা। শুধু বেহালা নয়, কান খাড়া করে শুনবেন, হামেশা দোতারার প্রক্সি দিচ্ছে মেণ্ডোলিন কিংবা স্বরোদ, বাঁশের বাঁশীর প্রক্সি দিচ্ছে সানাই আর ঢোলের কাজ করছে ডুগী-তবলায়। এই প্রক্রিয়ায় যে

সুর-সালসা তৈরি হচ্ছে আধুনিক ভাষায় একে বলে 'পাকিং।' সুরাজগতে নাকি পাকিংটা একটা মস্ত বড় আর্ট। সুরজগতেও তাই। আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে শ্রীসুধীর সরকার মহাশয় হয়ত অতশত বোঝেন না কিন্তু যশস্বী সংগীতবিদ শ্রীজ্ঞান-প্রকাশ ঘোষ মশাইকে বললে তিনি হয়ত বলবেন—বেহালা, সানাই, সরোদ এরা তো উচ্চবর্ণের যন্ত্র, অন্ত্যজ লোকসংগীতের সাথে যদি ওদের পরিণয় ঘটানো যায়, তাতে ওরাই তো জাতে উঠলো। সুর-শঙ্কর সৃষ্টি হলেও এতে আপত্তির কী আছে ?

মুরশিদের শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ নেই, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোক-গীতির সঙ্গে বিশেষ ধরণের লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগের পিছনে যে লোক-জীবনের বিবর্তনের প্রকৃতি, ইতিহাস এবং ভাবানুষঙ্গ জড়িত তা উপলব্ধি করার মতো কান, মন ও চোখ তার আছে।

আমাদের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রকাররা বাদ্যযন্ত্রগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন যথা তত. বিতত, ঘন, সুষির। তত অর্থাৎ তারের যন্ত্র যথা বীণা, তম্বুরা ইত্যাদি। বিতত—চামড়ার ছাওয়া তালযন্ত্র যথা ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, তবলা ইত্যাদি। ঘন—ধাতুনির্মিত তাল রাখার যন্ত্রাদি—যথা কাঁসর, করতাল, মন্দিরা ইত্যাদি। সুষির—মানুষের মুখের ফুৎকারে যে যন্ত্রগুলি বাজানো হয় যথা শিঙা, মুরলী, সানাই ইত্যাদি। আমাদের শাস্ত্রকাররা এইগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করে গেছেন। ইদানীং কলকাতার যাদুঘরে বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহশালার বিভাগ খোলা হয়েছে। কিন্তু লৌকিক বাদ্যযন্ত্রগুলি দিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক আলোচনা কেউ করেন নি। লোকসংগীত যদি উচ্চাঙ্গ সংগীতের আদিমাতা হয়ে থাকে, তবে লৌকিক বাদ্যের বিশ্লেষণে আমরা বর্তমান বহু উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের জন্মকাহিনীও পাব। সে যা হোক, লোকসংগীতে লৌকিক বাদ্যের ভূমিকা নিয়েই আমি কিছু আলোচনা করতে চাই।

কিছুদিন আগে দিল্লীতে ভারতবর্ষের ৫০০টি লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সংগীত নাটক একাডেমী এই প্রদর্শনী সংগঠিত করেন। (সংগীত নাটক একাডেমী মাঝে মাঝে হঠাৎ কিছু ভালো কাজ করে বসেন)। সেইখানে "সেমিনারে" যেসব "পেপার" পড়া হয়েছিল—মুরশিদের তা হস্তগত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সেখানে বিশেষজ্ঞরা আজকের সমস্যার দৃষ্টিতে লোকসংগীতে সেই বাদ্যযন্ত্রগুলির ব্যবহারের তাৎপর্য নিয়ে কোনো আলোচনা করেন নি। তা করলে আকাশবাণীর খামখেয়ালীর কথাও উঠতো

এবং আকাশবাণীতে সেই সব বাদ্যযন্ত্র কিভাবে কতটা ব্যবহার করা যায় তারও উপায় বাৎলাবার চেষ্টা হতো।

বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ কোনো লোকসংগীতে—জাতি বা উপজাতির গীতে যে বিশেষ পরিবেশ বা মুড্ সৃষ্টি করে—বা সেই গানের ছন্দ ও চলনে সাহায্য করে, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। লৌকিক যন্ত্রকে কেবল সুরের একম্পেনিমেণ্ট ভাবলে ভুল হবে। সুরের প্রাণভোমরার প্রথম পক্ষসঞ্চালন হয় তারের যন্ত্রে কিংবা বাঁশী ইত্যাদি যন্ত্রে। ধরুন একতারের যন্ত্র, পূর্ববঙ্গের 'লাউয়া।' পূর্ববঙ্গের বৈরাগী বা বাউল জাতীয় গানের সঙ্গে এর যে একেবারে হরিহরাত্মা ভাবটি তাতে পশ্চিমবঙ্গের বাউলের একতারা দিলে সেই ভাবের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। অন্তত মনের অমিল ঘটবে। পূর্ববঙ্গের লাউয়াটিতে দু'পাশের দুটি বাঁশে অঙ্গুলির চাপে যে গমক ও ছন্দ তোলা যায় পশ্চিমবঙ্গের একতারায় তা সম্ভব নয়। একটি দণ্ডে বাঁধা শুধু একটি স্বরের গুঞ্জন পশ্চিমবঙ্গের একতারায়। তার মেজাজের প্রকৃতি আলাদা। সেই একতারা বা তনতনিতে যখন শুনি মাদ্রাজের 'হরিকথা' বা মহারাষ্ট্রের 'লাউনি' তখন তারা আরেক কথা বলে। কিংবা ধরুন চামড়ার ছাওয়া যন্ত্র। পূর্ববঙ্গের ঢোলক এবং ঢোল, বিহারের ঢোলক, আসামের বিহুর ঢোল কিংবা আদিবাসীর মাদল, নেপালীদের ছোট্ট মাদল, সবকিছুরই মেজাজ সেই বিশেষ বিশেষ জাতির গীতের প্রকৃতির সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। এদের মধ্যে আবার কোনো অঞ্চলে তার কলাকৌশল এতো উচ্চপর্যায়ের যা যে কোনো শহুরে বড় তবলচীকে তাক লাগিয়ে দেয়। জ্ঞানপ্রকাশবাবু তো বাংলার ক্ষীরোদ নট্ট এবং আসামের মঘাই ওজার ঢোল শুনেছেন, তিনি কি পারবেন তাঁর তবলায় সেই জনসাধারণের শিল্পীর জটিল বোলতানী তুলতে? ঐসব শিল্পীর ঘরানা স্বতন্ত্র। ওরা কোনো শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে এই দক্ষতা অর্জন করেন নি। ওদের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। যা হোক আমার বক্তব্য হলো আকাশবাণীতে তবলা দিয়ে লৌকিক ঢোলকের 'এফেক্ট' সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়। লোকসংগীতের ছন্দ ও চলন স্বতন্ত্র। দোতারা আর সরোদে পার্থক্য বিশেষ নেই। তা বলে আকাশবাণীর কোনো ওস্তাদ যাঁর লোকসংগীত সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, যদি তিনি দোতারার কাজ সরোদে করতে যান তবে শিল্পীর গলাতে প্রতি মুহূর্তে ফাঁস লাগাবেন তিনি। কারণ দোতারার 'ড্যাম্প' হলো আমাদের লোকগীতের ছন্দ ও লয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক। লৌকিক আড়াচলনটি সরোদীর 'ড্যাম্পে' পাওয়া যাবে না—যদি না সেই সরোদী লোক-সংগীতকে পুরোদস্তুর রপ্ত করে থাকেন। আবার আকাশবাণীর কর্তা ও ওস্তাদজীরা

কি জানেন পূর্ববঙ্গের ইস্পাতের তারের দোতারা এবং উত্তরবঙ্গের মুগার সুতোর দোতারার পার্থক্যটা কী ? ভাওয়াইয়ার সঙ্গে ঐ মুগার সুতোর দোতারা না দিলে আকাশবাণীর মহাভারত হয়ত অশুদ্ধ হয় না, কিন্তু ভাওয়াইয়া সত্যি অশুদ্ধ হয়। এবং তার বাজানোর ধরনও ইস্পাতের দোতারার থেকে আলাদা। আকাশবাণীর স্টাফে লৌকিক যন্ত্রশিল্পী আরো কিছু নিযুক্ত করা আজ অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।…

॥ চার ॥

অনেকদিনের নীরবতা ভাঙবো একটা সুখবর দিয়ে। ওপার পদ্মা—এপার গঙ্গা, মধ্যিখানে বিরহিণী নক্সীকাঁথার মাঠ পেরিয়ে কলকাতার হুলুস্থুলের হাটে সুজন-বাদিয়ার ঘাটের মাঝি নাও ভিড়িয়েছেন এক যুগ পর। কিন্তু মাত্র দু'সপ্তাহের মেহমান। খবর ছড়ানো মাত্র ভাবের বেপারী সব ভেঙে পড়লো সেই ঘাটে। সবাই তাঁর কুটুম। কুটুম্বিতার বহর দেখে মুরশিদ তো বেওকুফ, কেউ বা সহ-পাঠী, কেউ বা গানের দোহার, কারও বা কবিকাকা, কারও বা কবিদা, কারও বা আবার কবিদাদু, কেউবা তাঁর পাতানো মেয়ে, কাউকে আবার ডাকছেন বৌমা বলে, কেউ বা করছে কোলাকুলি, কেউ নিচ্ছে মাথায় তাঁর পায়ের ধুলি। তাজ্জব মিলাত্‌!

মুরশিদের সাথে নামে মানুষে দেখাদেখি এই প্রথম। মুরশিদ যে কথা কইতে চায় মরমে মরমে। একটু নিরিবিলি না হলে তো চলে না। হুলুস্থুলের হাটে তো মুরশিদের লাউ বাজে না। কিছু মোকা মিলে গেল। তিনি নিজেই কলকাতার এই মুরশিদের লগে বিশেষ মোলাকাতের ইচ্ছা জানালেন।

মুরশিদে মুরশিদে কোলাকুলি

জ্যৈষ্ঠ মাসের মিষ্ট ফল,
আষাঢ় মাসের নয়াজল রে।

বিরহের বারমাস্যা পার হয়ে এই আষাঢ়ের এক মেঘলা সকালে পদ্মাপারের মুরশিদের সাথে গঙ্গাপারের মুরশিদের মোলাকাত হলো। মারিফতী দর্শনের এক বয়ান দিয়ে আমাকে সম্ভাষণ জানালেন : "মারিফতে ভেদ সিনায় সিনায়।" অন্তর দিয়ে জান অন্তরকে ; মুহূর্তে অপরিচয়ের পর্দা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কী সহজ মানুষ কবি জসিমউদ্দীন। আগের দিন কলকাতার কোনো দৈনিকে এক

সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারের পড়েছিলাম—তাঁর নামে এখন ঢাকার এক রাস্তার নাম—বাড়ি, গাড়ি, টেলিফোন সবই আছে—আর কী চাই ? আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভবের সওদা করে যদি ভাবের বেপার শেষ হয় তবে আবার কিসের লোককবি। তিনি হেসে আমাকে বললেন, "চল না ঢাকায় আমার ঘরের বৈঠকখানায়। দেখবে সেখানে আউল-বাউল নিয়েই আমার আসর। এদের সাথেই আমার দোস্তি। এদের সাথেই গানে গানে আমি দেওয়ানা হৈয়া কান্দি হাসি।"

আমি বললাম, গোড়া থেকেই সুরু করুন। আমার লোকগীতির গবেষণার সাথীরা কাগজ-কলম নিয়ে আর টেপ-রেকর্ডারের মাউথপিস হাতে নিয়ে উন্মুখ। আমি বললাম মহানগরীর কেয়ারীকরা ফুলবাগিচার শোভা বর্ণনায় যখন বাংলা কাব্য মত্ত, তখন সেখান থেকে আপনি আমাদের চোখ ফেরালেন এক ডালিম গাছের তলে—"ঐখানে তোর দাদীর কবর, ডালিম গাছের তলে।" শুক্‌নো দেশে যখন মেঘের আরাধনায় রুদ্ধ দরবারে মল্লারের কঠিন কালোয়াতী চলছিল, তখন হঠাৎ আপনার কণ্ঠে আমরা শুনলাম,

কালো মেঘা নামো,
ফুলতোলা মেঘা নামো
ধুলট মেঘা, তুলট মেঘা,
তোমরা সবাই নামো।
কালো মেঘা নামো,
নামো চোখের কাজল দিয়া
তোমার ভালে টিপ আঁকিব
মোদের হলে বিয়া—
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা,
কড়িয়া মেঘার নাতি
নাকের নোলক বেচিয়া দিব
তোমার মাথার ছাতি।
কৌটাভরা সিন্দুর দিব
সিন্দুর্যা মেঘার গায়
আজকে যেন মেঘার ডাকে
মাঠ ডুবিয়া যায়।

...   .

আজ আবার আমরা আবাহন করছি তুলট মেঘা—সিন্দুর‍্যা মেঘাদের। পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের গাঙের পানি শুকিয়ে এসেছে। কতোরকমের কাঁটা ফুলের দাবি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আবার লাগে দেয়া-ডাকা মাঠ-ডুবানো বান। এজন্যই তো আপনার প্রতি কলকাতার এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। শুধু কি সেজন্য? অপসংস্কৃতির নাগপাশে আবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ, ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের রক্তে রচিত পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সাহিত্যের নতুন জীবনবেদ পাঠ করেছেন। শুধু কি তাই, এই সেদিন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শত শত আত্ম-বলিদানে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম্যজীবনে যে কৃষিবিদ্রোহের মহাকাব্য রচিত হলো—পশ্চিমবঙ্গ মন ভরে, কান পেতে তা-ও শুনেছে। আপনার অভ্যর্থনার পশ্চাৎপট রচনা করেছে—এ সবই। আপনি হয়ত জানেন, বঙ্গভঙ্গের পর, আমাদের রেডিওতে আপনার গান গাওয়া হলে রচয়িতা হিসাবে আপনার নাম ঘোষণা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল—কারণ আপনি পাকিস্তানী ন্যাশনাল।...কিন্তু ভাষা সংস্কৃতির বাঁধন কি এভাবে ছেঁড়া যায়? নতুন করে আবার যখন আমরা সেতু বাঁধতে সুরু করেছি—তখন ছাতপিটানো সুরে আমাদের সবাইকে আবার গলা মিলতে হবে। তা ছাড়া আমাদের লোকসংগীতের চর্চার আর কী মূল্য আছে। তাই বলছিলাম প্রথম থেকেই যদি আবার সুরু করেছি—আপনিও প্রথমদিনকার কিছু কথা আমাদেরকে প্রথম শোনান।

সেদিনের কলকাতা

"এর আগে কয়েকবার এলেও ১৯২৭ ইংরেজী থেকে অনেকটা স্থায়ীভাবে এলাম কলকাতায়। কলকাতার শিক্ষা, সভ্যতা, চালচলনের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চাইলেও মনে মনে আমি রয়ে গেলাম সেই ফরিদপুরের গোবিন্দপুরের গ্রাম্য ছেলেটি। শহরের সংগীতের জলসা শুনতে যেতাম—ভালো লাগতো, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত খুবই ভালো লাগতো, কিন্তু তথাপি গ্রামে শোনা গানগুলিতে যে কী যাদু ছিল—আমাকে পাগল করে দিত। কিন্তু শহরের শিক্ষিতের দরবারে তার অবহেলা দেখে আমার মনে খুব দুঃখ হতো। কিন্তু এ-সময় হলো অসহযোগের Back to Village—আন্দোলন: 'গ্রামে চলো'র আন্দোলন। আমাকে সে নতুন উন্মাদনা দিল। তখন এ-কাজে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে। কিছু উৎসাহী যুবক ও যুবতীকে নিয়ে গ্রাম্যসংগীত প্রচারের কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু তখন

কলকাতাতে এ-কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম বাংলাদেশ কলকাতার দিকেই তাকিয়ে থাকে—কলকাতাকে দেশের লোক অনুসরণ ও অনুকরণ করে—কাজেই কলকাতার অনাবাদী মাটিতে ফসল ফলাতে হবে—সংকল্প নিলাম। কলকাতার কলেজে কলেজে বক্তৃতার আয়োজন করতাম—গান সহযোগে। শুধু কলকাতা নয়—একাজে তখন বাংলার অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এই অভিযান চলাকালীন বীরভূমে সিউড়িতে গুরুসদয় দত্তের সাথে দেখা হলো। গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে গঠিত হ'ল Rural Heritage Revival Society—গুরুসদয় দত্ত হলেন সভাপতি আর আমি হলাম সেক্রেটারী। সে সময়কার শিক্ষিতসমাজে লোকসংগীতের কদর কী ছিল তা বুঝতে পারবে একটি দৃষ্টান্ত দিলে। সে সময় আমাদের সোসাইটির সভাপতি হিসাবে গুরুসদয় দত্ত পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন দেন—'যিনি আমাদের কাছে এসে লোকসংগীত শিক্ষা করবেন—তাঁকে মাসে মাসে পনের টাকা করে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে।' আমিই প্রধান শিক্ষক। ছাত্র জুটলো মাত্র একটি। নাম তার বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ। গানের হাতেখড়ি হয়েছিল ভীমনাগের বড় সন্দেশ দিয়ে, অন্তত মিষ্টির প্রলোভনেও ছাত্রটি যাতে নিয়মিত আসে।"

মুরশিদ কবি জসিমউদ্দীনের কাছে তাঁর প্রথম ছাত্র বিনয়বাবু কলকাতাতেই আছেন জেনে তাঁকে খুঁজে বার করেন। তাঁর কাছ থেকে মুরশিদ জানতে পারেন যে, প্রথম যে-দুটি গান তিনি কবির কাছে শিখেছিলেন সে-দুটি হলো :

ঘাটে লাগাও রে নাও—
আমি চিন্তা লই বেপারীরে।
বাইলাম তরী ঘাটারে ঘাটে
না পাইলাম রে কূল—
এই ঘাটে ভাসিয়া গেছে,
আমার সুবর্ণের ফুল॥
—ইত্যাদি

অন্য গানটি হলো :

আগে জানিনা রে দয়াল
এমন হবে রে,
আগে না জেনে পাছে না শুনে
প্রেম যেজন করে—

ঘসির আগুন তুষের ধুম
সদা জইলে জলে ওঠে রে ॥
—ইত্যাদি

লোককবি তাঁর সেদিনকার কলকাতার পাথুরে পথে গ্রামের শ্যামল মাটি ছড়াবার কাহিনী বলে চললেন। আরো উৎসাহী যুবক-যুবতী যাঁরা সেদিন জুটেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে বিমলকৃষ্ণ দত্ত (জলি দত্ত) এবং নমিতা দত্তের নাম করলেন। শ্রীদত্ত কবির অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন। এর মধ্যে কবির নিজের রচনা ছিল কয়েকটি। তার মধ্যে "পাখি কইও বন্ধুয়ার লাগ পাইলে"—"আমার হাড় কালা করলাম রে ও বাদিয়া সম্মুখে নাচে তোর"—প্রভৃতি গান সে-সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সেদিন জসিমদা'র দলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই নাচ, গান, ছবি আঁকা কিছু না কিছু জানতেন। অনেকটা এ্যাযেচারী ব্যাপার তাতে থাকলেও—তাঁরা নিজেদের চারণ বলেই ভাবতেন—তাই সঙ্কোচ, লজ্জা, ভয় কিংবা প্রতিকূল সমালোচনা তাঁদের দমাতে পারে নি। এইরকম একটি দল নিয়েই তাঁরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে শোনাতে। রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংস দৃষ্টিতেই সব দেখেছিলেন এবং পরে আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু সেখানে অনেক ছাত্রেরই তা ভালো লাগে নি। কবি জসিমউদ্দীন আমাদের হেসে হেসে বলেছিলেন—কোনো কোনো ছাত্র নাকি তাঁদের শুনিয়ে বলেছিল—"এদের ঘুঁটের মালা দিতে হয়।"

লোককবি বললেন, ইতিমধ্যে আব্বাসউদ্দীন কলকাতায় এসে গেছেন। তাঁকে নিয়ে প্রথমে প্রথমে তিনি কলেজে কলেজে এবং অনেক বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে গানের ও আলোচনার বৈঠক সংগঠিত করেন। কিন্তু পরে গ্রামোফোনে লোকসংগীতের সাফল্যে ও আব্বাসউদ্দীনের ব্যক্তিগত সাফল্যে গ্রামোফোনের দিকেই বিশেষ নজর পড়লো সকলের।

'জাপানি খদ্দর'

গ্রামোফোনের কথা আসতেই আমি তার ব্যবসায়িক সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার খাতিরে রচনার মধ্যে 'গ্রাম্যতা'কে পরিমার্জিত করার উল্লেখ করলাম। সাপ্তাহিক বসুমতীতে মুরশিদের শেষ লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। এখানে আমাদের আলোচনা লোকসংগীতের কয়েকটি গভীর সমস্যার বাঁকে মোড় ফিরলো।

সেদিন ছিল শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীকে দিয়ে গ্রহণ করানোর সমস্যা, কাজেই খাঁটি গ্রাম্যভাষায় যে সব গান ওদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল তাতে কিছু ভাষার অদল-বদল করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তারাও "লোকে নেবে না" বলে ভাষাকে মার্জিত না করে রেকর্ড করতে চাইতেন না কিছুতেই। তৃতীয়ত সংগ্রহ বললে যে টাকা পাওয়া যেত, নিজের রচনা বললে দক্ষিণা তার চেয়ে অনেক বেশি মিলতো। এই প্রলোভনও পিছনে কাজ করছিল। আরেকটা সমস্যা ছিল, দেহতত্ত্বের জবরুৎ, মালাকুত কিংবা 'আটকুঠুরী নয় দরজা' প্রভৃতি সেদিনের, এমন কি আজকেরও শিক্ষিতশ্রেণীর কাছে দুর্বোধ্য। সেদিক দিয়েও দেহতত্ত্বের গানকে অনেক সময় প্রেমের গানে রূপান্তরিত করতে হয়েছিল। সেদিনের সে-সব সমস্যা উল্লেখ করতেই কবি জসিমউদ্দীন একটি উপমা দিয়ে বললেন: "গানের মুখটিতে মৌলিক গ্রাম্য-গীতির কথা রেখে বাকী অংশের কথা অনেক সময় আমরা কিছু অদল-বদল করেছি, যেমন, অত্যন্ত জনপ্রিয় গান—'ওরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি'। মূল গানটির কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

ওরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি,
এই ঘাটে লাগাইয়া নাও, নিগুণ কথা
কইয়া যাও শুনি
কাওয়াতো কাণ্ডারী নৌকার—
শকুন ভাণ্ডারী
বনের শৃগাল বলে আমি
এই নৌকার বেপারী॥
—ইত্যাদি

মূল গানের মুখটি আমি ঠিকই রাখলাম। কিন্তু অন্তরা বদলিয়ে রচনা করলাম:

তোমারনি পরাণ রে বন্ধু
হরিয়াছে কেউ
কলসী ভাসাইয়া জলে
গণে গাঙের ঢেউ॥
—ইত্যাদি"

আমি বললাম, এ রচনা ঠিক আছে—আপনার অধিকারও অস্বীকার করবো না। কিন্তু যখন লিখলেন, "কইব কথা শিশিরের সনে" তখন কিন্তু মৌলিক

থাকলো না, হলো রাবীন্দ্রিক। তিনি স্বীকার করলেন এবং বললেন: "দেখ তখন মোটা খদ্দর কেউ পরবে না বলে—আমরা কিছু 'জাপানী খদ্দরও' দিয়েছিলাম।" আমি বললাম সে-কথা বুঝি, কিন্তু আজ বাংলায় চলেছে প্লাষ্টিকের খদ্দর। সে-সমস্যা নিয়েই আপনার সঙ্গে আসল আলাপ। কিন্তু আজ তো আলোচ্য বিষয় অসমাপ্ত রইলো। আমার গরীবের মোকামে আপনার দাওয়াত রইলো, সেদিন আলাপ করবো সব।

॥ পাঁচ ॥

আমার বাড়ি বন্ধুর বাড়ি
মধ্যে সুরনদী—

মুরশিদের মোকামে তশ্‌রীফ্‌ নিয়ে এলেন কবি জসিমউদ্দীন। সঙ্গে এলেন তাঁর প্রথমদিনকার গানের গানের সাথী বিনয়বাবু, বিমলবাবু আর নমিতা দেবী। সেই মিলাত্‌-এ এলেন কয়েকজন গুণী রসিক, লোকসংগীতের অনুরাগী। আরো এলেন একজন খ্যাতনামা দোতারাবাদক এবং কয়েকজন বিশিষ্ট লোকগীতি গায়ক ও গায়িকা। গানের আলাপ হলো গানে গানে। মাঝে মাঝে বয়ান ও চা-পান, আবার গান। চললো সন্ধ্যা থেকে রাত বারটা অবধি। মুরশিদের সাথী দু'জন গবেষক হাতে টেপরেকর্ডার ও কাগজ-কলম নিয়ে উৎকর্ণ।

গানে টানে কথা, কথার টানে গান। ছন্দের মাকুতে কথার টানায়, সুরের পোড়েনে তাঁতী কবি পল্লীর নক্সা তোলেন। কিন্তু মানসপটে অনেকদিনের ছিটে-ফোঁটা রঙে তা আঁকা হয়ে থাকে আগে থেকেই। পল্লীকবির সেই মনের পটের মূল রঙটি হলো সুর। সুরের গুনগুনানিতেই কথা পাখা মেলে। নানা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গান গেয়ে চলেছিলাম আমরা। কাজেই কবি জসিমউদ্দীনও গান ধরলেন। পূর্ববঙ্গের রাখালীয়া গানের বিলম্বিত সুরের সূক্ষ্ম খোঁচগুলি এমন চমৎকার তাঁর গলায় উঠছিল যে সরল সবুজ গ্রাম্যতার স্পর্শ আমরা সবাই তাতে পাচ্ছিলাম। অথচ গায়ক বলে কিন্তু তাঁর নাম নেই। এ-গানই হয়ত রেকর্ড বা রেডিওতে অচল। অন্য যে কোনো শহুরে পল্লীগায়ককে দিয়ে গাওয়াতে গেলে তাঁর গলার এই গান জল ছাড়া মাছের মত ছটফটিয়ে মরবে।

দোতারার টুংটাং-এর মধ্যেই সমস্যামূলক আলোচনায় এসে গেলাম। আগের দিনের সমস্যা—যা লোককবি তাঁর 'স্মৃতির পটে'-তে ধরে রেখেছেন। আজকের

লোকসংগীতের সমস্যার তীব্রতা বুঝতে গেলে সেদিনের সমস্যার সমীক্ষার প্রয়োজন। 'স্মৃতির পটে'-তে জসিমউদ্দীন লিখছেন—

"ইহার কিছুদিন আগে বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ নামক একটি যুবক এই গানটি ('গহীন গাঙের নাইয়া') শিখিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করাইতে যায়। তাহার গলাটি বেশ সুরেলা। গ্রামোফোন কোম্পানীর মিঃ ভট্টাচার্য এবং কাজী নজরুল ইসলাম গানটি শুনিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, 'পূর্ববঙ্গের ভাষায় এই গানটি রচিত বলিয়া ইহা দেশের সকল স্থানে বোধগম্য হইবে না। এই গানের কমার্শিয়াল মূল্য নাই।'

"ইতিমধ্যে কবি নজরুল ইসলাম 'ও আমার গহীন জলের নদী' এবং 'আমার সাম্পান যাত্রি না লয়' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম্য-আধুনিক মিশ্র সুরের গান রেকর্ড করাইয়া ফেলিলেন।...পূর্বেই বলিয়াছি আব্বাসকে গান শেখানো (পূর্ববঙ্গের) সে এক অসামান্য ধৈর্যের ব্যাপার। তখন তার মনে তেমন সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি জাগে নাই। আমি কোনো গ্রাম্য গানে হারমোনিয়াম বাজান পছন্দ করি না। আব্বাস তাহা মানিত না, আমার রচিত 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না' গানটিতে আব্বাস এক জায়গায় গান থামাইয়া খানিকক্ষণ হারমোনিয়াম বাজাইয়া লইয়াছে। ইহাতে গ্রাম্য গানের আবহাওয়া যে কত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা আব্বাসকে বুঝাইতে পারিতাম না। আব্বাস তখন খ্যাতির এমন উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে যে সে যেভাবে যাহা গায় তাহাতেই লোকে ধন্য ধন্য করে। পূর্ববাংলার গ্রাম্য গানের যে ঢংটি আছে—তাহা আব্বাসকে কিছুতেই শিখাইতে পারি নাই। কিন্তু আব্বাসের সুরেলা কণ্ঠে গ্রাম্য গান প্রচারের এ বড় সুযোগ হইল। তাই তাহার গানের খুঁটিনাটি ত্রুটি অবহেলা করিতাম।"...

মুরশিদের সঙ্গে আলোচনায় কবি বলেছিলেন: "লোকসংগীতকে জনপ্রিয় করাটাই ছিল সেদিনকার আসল সমস্যা। এবং তার প্রধান মাধ্যম ছিল গ্রামোফোন কোম্পানী। কাজেই কিছু আপোষরফা করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। অবশ্য সেটা কথার দিক থেকে, সুরের দিক থেকে নয়। সেদিন গ্রামোফোনের কর্তারা কেবল গ্রাম্য কথাতেই আপত্তি করতেন—সুরে নয়।"

এখানে আমি বললাম আজকের দিনের সঙ্গে সেদিনের এটা প্রধান পার্থক্য। সেদিন ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালীর কেবল কথা পরিমার্জিত করা হতো।

জনসমক্ষে আব্বাসউদ্দীন যে প্রথম 'পল্লীগীতি' গেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সেটি 'নদীর নাম সই কচুয়া' এই গ্রাম্য গানটির নজরুল কর্তৃক পরিমার্জিত

রূপ—'নদীর নাম সই অঞ্জনা'। শচীনদেবও যে প্রথম ভাটিয়ালী গান করেন সেটি ছিল পরিমার্জিত ভদ্র-ভাটিয়ালী—। রচনার দিক দিয়ে এগুলিকে পল্লীগীতি বলা চলে না কিছুতেই। গায়কী এবং মিউজিক ইত্যাদির দিক দিয়েও তার গ্রাম্য চেহারাটাকে পালিশ করে দেওয়া হতো। এখানে জসিমউদ্দীন বললেন, "সুরের দিক দিয়েও আমরা কিছুটা পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছি। তখন একই অঞ্চলের প্রচলিত দুই তিন ধরনের সুরের আশ্রয় নিয়েই তা করা হয়েছে কিন্তু কখনো সেই অঞ্চলের লোকসংগীতের সীমানার বাইরে যাই নি। যেমন: 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না'—সেই ভাটিয়ালী গানটিতে সারির কায়দায় সঞ্চারী জুড়ে দিয়েছিলাম:

ছল ছল কল কল
করে জল টলমল
নাহি বল তবু চল
ওরে মাঝি তুই কেন হলি আজ বিমনা।—ইত্যাদি"

আমি বললাম—আঞ্চলিক সুরের মূল কাঠামোর মধ্যে থেকে ভঙ্গির অদলবদল লোকসংগীতের ধারাতেই আমরা পাই, লোককবি হিসাবে আপনারও সে-অধিকার আছে। এবং গানটিতে আপনার এক্সপেরিমেন্ট ভালোই হয়েছে, কারণ ভাটিয়ালীর মূল কাঠামোর মধ্যে থেকেই সেটা করেছেন। কিন্তু ব্যবসায়িক কারণে বৈচিত্র্য আনবার জন্য এক্সপেরিমেন্ট করাতে বিপদ আছে।

সেই সূত্রেই আবার বললাম—কিন্তু খাঁটি জিনিসকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনারা লড়াই করেছিলেন। আব্বাসউদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন: "মাতৃভাষাকে (কুচবিহারী ভাষা) অবিকৃত রেখে গান দিতে পারলাম না। মনে জেগে আছে ক্ষোভ। এই গান বাজারে বের হবার তিন-চার মাস পরে ম্যানেজার-বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা এবার ঐ ধরনের ভাওয়াইয়া গানই দিন।' আমি বললাম, 'দিতে পারি এক শর্তে। আমার দেশের ভাষাকেই রাখতে হবে অবিকৃতভাবে।'...তারপর গাইলাম, 'ও কি গাড়িয়াল ভাই—কত রব আমি পন্থের দিকে চায়ারে।'"

শুধু গ্রাম্যভাষা নয়—গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্রের স্থলে কখনো কখনো অন্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল বলে পল্লীপ্রাণ আব্বাসউদ্দীন শেষ জীবনে গভীর অনুভূতি দিয়ে লিখে গেছেন যে ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া গানে তিনি কানাই শীলের দোতারা ও রাজাবাবুর বাঁশীই বেশি ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাঁদের অবর্তমানে

তাঁকে দু'-চারখানা পল্লীগীতির রেকর্ড ম্যাণ্ডোলিন বাদ্য সহযোগে করতে হয়েছিল। সে-বিষয়ে আব্বাস আক্ষেপ করে লিখছেন : "গ্রাম্য সুরকে যেমন আমি চির-অবিকৃত রেখেছি, উচিত ছিল সেই সুর যে যন্ত্রসহযোগে আবহমানকাল ধরে গীত হয়ে আসছে, সেই যন্ত্র ব্যবহার করা।...আজ মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি সেভাবে আদৌ এক্সপেরিমেণ্ট করা উচিত ছিল না আমার। সারা দুনিয়া আজ তৎপর হয়ে উঠেছে পল্লীগীতি ও সুর, তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।... দু'হাজার বছর পরেও যেন আগামী দিনের মানুষ আমাদের অতীত ও বর্তমানের পল্লীসুর ও তাদের আদিমপুরুষের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে।"

আমি বললাম, আপনারা সাময়িকভাবে পিছু হটেছিলেন এগিয়ে যাবেন বলে। কবি সেই প্রসঙ্গে বললেন, "এটা শুধু কি আপোষ ? গ্রাম্য পরিবেশ থেকে শহরের পরিবেশে উপস্থিত করতে সেটা কি অপরিহার্য ছিল না ? উদয়শঙ্কর প্রথম যে লোকনৃত্য মঞ্চে উপস্থিত করলেন, তা কি গ্রাম্য লোকনৃত্যের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ ছিল না ?" আমি সে কথা মেনে নিয়ে বললাম—গ্রামের আট-পৌরে জিনিষের মঞ্চ উপস্থাপনায় বিশেষ করে মাইকের মাধ্যমে কিছুটা পোশাকী হতে বাধ্য ! কিন্তু সে এক কথা আর শহুরে ব্যবসায়ী তাগিদে মঞ্চে উপস্থাপনায় জামদানী ছাড়িয়ে জর্জেট পরানো আরেক কথা।

কিছুটা পোশাকী উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন : "যে সব খাঁটি লোকশিল্পী আমাকে গ্রামে মাতিয়েছিল, কাঁদিয়েছিল, যেমন মমতাজ আলী বা হরিপদ শীল, তাদের শহরে এনে যখন রেকর্ড করালাম তখন সে রেকর্ড মোটেই বিক্রি হলো না"। কবি জসিমউদ্দীন একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'স্মৃতির পটে'র কয়েকটি কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠলো। বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ দোতারাবাদক ও গায়ক কানাই-এর দলকে নিজের খরচে ফরিদপুর থেকে কলকাতায় রেকর্ড করাবার জন্য নিয়ে আসেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর জনৈক ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাঁদের গান শুনে মন্তব্য করেন "ইহাদের কাহারও গলার স্বর কলকাতার গায়কদের মতো ঘসা-মাজা নয়। ইহারা উচ্চ পর্দায় গান গাহে বলিয়া ইহাদের কণ্ঠস্বরের অনেক জায়গা চিরিয়া গিয়াছে। ইহাদের গান রেকর্ড করিলে সেই ক্ষতচিহ্নগুলি আরো প্রকট হইয়া উঠিবে। রেকর্ড বাজারে বিক্রি হইবে না। ইহাদের গানের ভাবালুতা দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইয়াছেন। রেকর্ডের গানে ঘষামাজা কণ্ঠস্বর চাই। ভাবালুতার দাম এখানে অতি অল্পই।"

এই প্রসঙ্গে আমি বললাম, রেকর্ড বা মাইকে গাইতে গেলে গ্রাম্য স্বতঃস্ফূর্ত গলার pitch-এর তন্ময় খোলাভাবকে অনেক সময় সংযত করতে হয়। কিন্তু অনন্তবালা বৈষ্ণবী, ললিতা দেবী বা নিরঞ্জন সূত্রধরদের মতো পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য গায়কদের রেকর্ড তো ভালো বিক্রি হয়েছিল বলেই জানি। কিংবা ভাওয়াইয়া অঞ্চলের নায়েব আলী, কেশব বর্মণ, ধীরেন চন্দ, সুরেন্দ্রনাথ রায়, বসুনিয়ার এঁদের গানও তো খারাপ বিক্রি হয় নি। তবে হ্যাঁ আব্বাসউদ্দীনের, শচীন দেবের পরিবেশনায় শিক্ষিত 'রেওয়াজী গলা'র সচেতন ভঙ্গিমা ছিল, যেজন্য হয়ত তা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তো কোথাও মূল সুরের বিকৃতি করেন নি। এবং গ্রাম্য গায়কীও ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

এখানে কবি আরেকটা প্রশ্ন তুললেন। গ্রাম্য কাব্যে নতুন ভাব ও প্রকাশ-ভঙ্গি আসছে। কোনো কোনো গ্রাম্য রচয়িতার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন বর্তমান বাংলাদেশের যশোহরের বিজয় কবিয়াল। তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনি গ্রাম্য শ্রোতার সামনে গাইছিলেন যার ভাবটা হলো—'কূল তুমি কূলের বাঁধন খুলে দাও। আমি অকূলের যাত্রী, তাই আমি তোমার কূলে বারে বারে আঘাত করি।' প্রকাশভঙ্গি রাবীন্দ্রিক, অথচ গ্রামের মানুষেরা তা খুব নিচ্ছে। পাকিস্তানের আবদুল মজিদ যখন রচনা করেন :

আমার শ্যামলা কচি প্রিয়া
আঁশিতে তারে রাখলে পরে
আঁশি যায় ফাটিয়া
কেমনে রাখবে আবদুল মজিদ
বুকেতে ধরিয়া।...

এটাও নতুন প্রকাশভঙ্গি। আমি বললাম, এ-বিষয়ে আমিও একমত। এ-বিষয়ে আমার কোনো গোঁড়ামি নেই। বরঞ্চ আমি মনে করি এ-বিষয়ে গোঁড়ামী লোকসংগীতকে চলমান জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংগ্রহশালার মৃত বস্তুতে রূপান্তরিত করে। ভাবের ও প্রকাশভঙ্গির গতিশীলতা কিন্তু সুরের ও গায়কীর রক্ষণশীলতা—লোকসংগীতের রূপান্তরের এই হলো রূপরেখা—এটাই আমার বক্তব্য। কিন্তু নতুন রচনার অধিকার সবাইকার নেই। পল্লীজীবনের ও পল্লী-সাহিত্যের মধ্যে ডুব না দিলে এ-অধিকার কেউ অর্জন করতে পারে না। এ-বিষয়ে অধিকারভেদ আমি মানি। আপনি এ-অধিকার অর্জন করেছেন। তাই আপনি যখন দেহতত্ত্বের গানের মুখটা নিয়ে পরে তাতে পল্লীপ্রেম ও প্রকৃতির

কথা বসিয়েছেন, তখন কথাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এতো মুখে মুখে বসে গেছে যে, মনে হয় না কারও জুড়ে দেওয়া।

কবি বললেন, "অনেক সময় পল্লীগীতির মধ্যে অশ্লীলতাও থাকতো, সেগুলিও নতুন শব্দ দিয়ে ভরাট করে দিতে হতো। আবার কোনো কোনো সময় ভাঙা ভাঙা দু-তিন কলি পাওয়া যেতো—পুরো গান খুঁজে পাওয়া যেতো না। অথচ সেই ভাঙা কলিগুলি এমন কাব্যমাখা থাকতো যে, ওদের পূরণ করে দেবার লোভও সামলানো যেতো না।"…

আমি বললাম, এতে কি অনেক সময় মূল পল্লীগীতি রচয়িতার প্রতি অবিচার করা হয় নি? কবি তা স্বীকার করে নিজেই একটা দৃষ্টান্ত দিলেন। একবার মেগাফোন 'পাখী কইও বন্ধুয়ার লাগ পাইলে' গানখানা জসিমউদ্দীনের রচনা বলে রেকর্ড করেন, কিন্তু ফরিদপুর থেকে আইজদ্দী চিঠিতে তাঁর কাছে প্রতিবাদ করে জানান যে, এটা তাঁর গান। কবি দুঃখ প্রকাশ করে তাঁকে চিঠি দেন এবং এ-গানের জন্য তাঁর প্রাপ্য সমস্ত রয়্যালটি আইজদ্দীকে পাঠিয়ে দেন।

গ্রাম্য প্রেমগীতির কাব্যমাখা ট্র্যাডিশনাল গান যেখানে এখনো অফুরন্ত সেখানে ভণিতাহীন সেই সহজাত গানগুলিকে উপস্থিত না করে সেই ভাবেরই ঘরে চুরি করে নতুন গান রচনার রেওয়াজও তখন এসেছিল—কারণ সংগৃহীত সহজাত গানে কোন পয়সাও ছিল না, নাম যশও পাওয়া যেত না। যেমন আব্বাস উদ্দীনের ভাই আবদুল আলিম এমন বহু গান রচনা করেছিলেন যা পল্লীর সহজাত গানেরই হেরফের মাত্র। তাছাড়া সমাজবিকাশের যে-স্তরে উত্তরবঙ্গের গান আমাদের কাছে এসেছে সেই ভাওয়াইয়া গানে কোনো ভণিতা থাকে না এবং কে তার রচয়িতা জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে কোনো কৌতূহলও থাকে না। সার্থক কবি জসিমউদ্দীন কোনো কোনো সময় এমন গান রচনা করেছেন—যা পল্লীগানেরই সামান্য হেরফের মাত্র। বাউল-শ্রেষ্ঠ লালন ফকিরের 'কথা কয়রে দেখা দেয় না' গানটির মুখ নিয়ে তিনি তখন যে গানটি রচনা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ অসার্থক এবং লালনের প্যারডির মতো মনে হয়।

সেই পরিপ্রেক্ষিতেই—কবিকে আমি নতুন রচনায় অধিকারী ভেদের কথা বারে বারে বলছিলাম।

লোকগীতিকে জনপ্রিয় করার প্রথম দিককার আন্দোলনের এই সংক্ষিপ্ত নক্সাটি আমাদের মনে রাখা দরকার আজকের সমস্যার চরিত্রটা বুঝতে হলে।…

। ছয় ।

…কবি জসিমউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা গড়িয়ে গড়িয়ে আধুনিক যুগে এসে পড়লো। প্রথম সাক্ষাতে তিনি বলেছিলেন, "আর যাই বলুন এখন পল্লীগীতি সর্বজনপ্রিয়, তাকে জনপ্রিয় করার জন্য আমাদের মতো এখন আর কষ্ট করতে হয় না"। সেই কথারই জের টেনে আমি তাঁকে বললাম, এই জনপ্রিয়তাই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ এই 'জনপ্রিয়তা'র বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। এ-লড়াই আপনাদের আমল থেকে বহুগুণ কঠিন। আপনার কাছে আমার এ-বক্তব্যটাই বিশেষভাবে রাখতে চাই। এখানে 'জনপ্রিয়' শিল্পী, সাহিত্যিক কবিগীতিকার - এঁদের কারও প্রাণসত্তা নেই। এঁরা হলেন সবাই 'ট্রেডমার্ক'। প্রচারিত 'জনপ্রিয়' পণ্য। এঁরা 'বক্স-অফিসে' বাস করেন। এঁরা গান করেন না, গলা বেচে খান।

জনপ্রিয়তার দু'-একটি নমুনা আপনার সামনে হাজির করতে চাই। গত বছরের 'শারদ অর্ঘ্যের' থালা থেকেই একটি আধুনিক পল্লীগীতির 'পুষ্প' আপনাকে উপহার দিতে চাই। একজন 'জনপ্রিয়' গীত রচয়িতার বাগান থেকে এই ফুলটি এসেছে। রেকর্ড আরম্ভ হওয়ার আগে—রচনা একটু শুনুন।

রুনুর ঝুনুর পায়
সুন্দরী যে যায়
ইতি উতি চায়, সুন্দরী যে যায়
ও শাড়ির ভাঁইজে ভাঁইজে
থাইকা থাইকা রে
যেন বিজুলি চমকায়।
কাঁচা অঙ্গে ঢেউ উঠেছে
রসে টলমল
আহা পদ্মমধু খেয়ে ভ্রমর
হয়েছে পাগল
ঈষৎ কটাক্ষে সে যে মন ভুলায়।
…ইত্যাদি।

এই রচয়িতারই দ্বিতীয় গানটি হলো :

ডাগর দীঘল চোখে কন্যা
যার পানে চায়

ভুজঙ্গী হইয়া কন্তা ছোবল মারে গায়।
বিষের জ্বালা বড়ই জ্বালা
ওষুধ নাহি তায়
এ জ্বালা যে সুখের জ্বালা
অঙ্গ শীতল হইয়া যায়।
…ইত্যাদি।

এ রচনার কোনো বিশদ বিশ্লেষণ না করে শুধু বলব, বাক্যভঙ্গি শুনলেই মনে হয় শহরের কোনো eve-teaser বা বিড়িভূক ক্ষুদে মস্তান পাড়ার কোনো 'ভুজঙ্গী' আধুনিকার দিকে শিস দিয়ে গান গাইছে। এ কোন্ গ্রাম্য মেয়ে?

এর পাশাপাশি মৈমনসিংহ গীতিকার দু'টি কলির উদ্ধৃতি দিতে চাই:

সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি
যে দেখে পাগল হয় বাভ্যার নন্দিনী।
হাটিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পড়ে চুল,
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনকচাম্পার ফুল।

বেদের মেয়ে সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে নয়। তার মাথায় সাপের মণি জ্বলে। 'পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিষ শিবে বান্ধা' তার। 'সুতের শেওলা হৈয়া' যে দুরন্ত ঘাটে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়—তারও কটাক্ষ আছে, তবু সে কিন্তু এরকম ফ্লার্ট করে না। তার প্রেমের গভীরতা পাঠককে স্পর্শ করে। এই বেদের মেয়েটিও গ্রাম্য মেয়ে। আমাদের চিনতে ভুল হয় না।

অবশ্য সুরের বিচার না করে শুধু রচনার আলোচনায় গানের সমীক্ষা কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। সে-আলোচনায় আমি এক্ষুণি আসছি। আমাদের আলোচ্য রচয়িতা সেই শারদ অর্ঘ্যের থালায় আরো নানা উপচার সাজিয়েছেন। পল্লীসাহিত্যে ছেলে-ভুলানো ছড়া, মেয়েলী ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া ইত্যাদি অনেক রকমের ছড়া আছে। এই ছড়াগুলির ভাঙা বাক্য, ধ্বনি এবং দুর্বোধ্যতার মধ্যে এমন একটি সহজ চিত্র পাই—যা একান্তই পল্লীর। কিন্তু আজকের 'জনপ্রিয়' গীত রচয়িতা ছড়ার অবলম্বনে একটি আধুনিক nonsense rhyme লিখেছেন—গেয়েছেন একজন অতি জনপ্রিয় চিত্র-তারকা, নাম কিশোরকুমার। দীর্ঘ ছড়াটির কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

বম বম মাকু
প্রাণ হাঁকু পাঁকু জান হাঁকু পাঁকু

রাম রাম কুক্ কুক্ লাল বৌ টুকটুক
দুধ খায় চুক চুক
চামচিকে চিকে বাম চিকে চিকে
বম বম চিকে বম, বম চিকে বম বম
... ...
বম বম চিকে বম, বম চিকে বম বম
যদু মাস্টার শ্বশুর-বাড়ি,
রেলকম ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম
... ...
জালাভরা চিটেগুড়
চৌরঙ্গী চিৎপুর
মধুপুর. বোলপুর
ভাগলপুর, ছাগলপুর
রাঁচী রাঁচী পাগলপুর ॥
...ইত্যাদি।

এ দীর্ঘ ছড়াটি শুনলে কেবল একটি কথাই মনে থাকে 'রাঁচী রাঁচী পাগলপুর।'

এই জনপ্রিয় রচয়িতা পুজার থালায় বহু রকমের নৈবেদ্য নিবেদন করেছেন। একটি অতি আধুনিক গানও রচনা করেছেন এবং তা গেয়েছেন বোম্বের একজন 'টপ' শিল্পী, আশা ভোঁসলে।

এই এসো না—কাছে এসো না প্লীজ
—আসবে না ? (সংলাপ)
এই এদিকে এসো এসো না
কথাটি শোন শোন না প্লীজ
(ও) কেন দূরে দূরে সরে থাকো ?
... ...

কবি জসিমউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এমন সব্যসাচী রচয়িতা কি আপনাদের আমলে সম্ভব ছিল ? রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদের দেশে তাদের উত্তর-সাধক অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, শৈলেন রায়, হিমাংশু

দত্ত সুরসাগর, সুধীরলাল প্রমুখ ছোট বড়ো রচয়িতা বা গীতিকারের পক্ষে কি এই কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব ছিল ?

রেকর্ড প্লেয়ারটি প্রস্তুতই ছিল। প্রথম গানটি বাজিয়ে শোনালাম। বলুন, লেবেলে লোকসংগীত লেখা না থাকলে কি একে বারোবাজারী আধুনিক থেকে আলাদা করা যেতো ? গানখানা গেয়েছেন এখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় একজন লোকসংগীত শিল্পী। শহরের 'ভুজঙ্গী ছোবলমারা' মেয়ের চলনকে অনুসরণ করে সুর সংযোজনা করতে হলে সুরকেও কোমরভাঙা ঢুলকীছন্দে বাঁধতে হয়। সুরাশ্রয়ী সুরের 'পাঞ্চ' চাই। শুধু রচয়িতা ও গায়ককে দোষ দিচ্ছি না—শ্রোতাদেরও এই চাহিদা।…

॥ সাত ॥

একালের কথা কবি জসিমউদ্দীনকে বলতে গিয়ে বঙ্গসংস্কৃতির কেন্দ্র—তাঁদের সময়কার কলকাতা আর আমাদের এই কলকাতার ফারাকটা কী ও কোথায় সেটা অল্প কথায় বোঝাবার চেষ্টা করেছি। বাঙালীর আধুনিক পপ্ গান, 'রাগী' কবিতা, বিবস্ত্র উপন্যাস, অশোককুমার নাইট বা যুক্তমেলার 'জীবন দর্শনের' বিকার না বুঝলে লোকসংগীতের বিকৃতিও বোঝা সম্ভব নয়। মুরশিদের আগের লেখায় তার কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু কবি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মুরশিদের মনে হলো না। কবি রবীন্দ্র সদন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আকাশবাণী প্রভৃতি বহুস্থানে বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু কোথায়ও লোকসংস্কৃতিকে আজকের এই ব্যবসায়িক হামলা থেকে রক্ষার জন্য একটি ক্ষীণ আবেদনও জানালেন না। কোনো শিল্পী বা সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি বলবেন তা আমরা চাই নি। আমরা শুধু চেয়েছিলাম তিনি মূল বিপদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে শ্রোতাদের কিছু সতর্কবাণী শোনাবেন। কিন্তু মুরশিদকে তিনি হতাশ করলেন।

তিনিও কি সময়ের পিছনে পড়ে গেলেন, না এটা তাঁর সুবিধাবাদ ?

ব্যক্তিগতভাবে মুরশিদের মোকামে ফেলে-আসা গ্রামের মাটির সুবাস পেয়েছেন বলে যাবার আগে তিনি মুরশিদকে এক প্রশংসাপত্র দিয়ে গেছেন। তার জন্য মুরশিদ কৃতজ্ঞ। কিন্তু মুরশিদ তা চায় নি—মুরশিদ চেয়েছিল আজকের লোকসংগীতের বিকৃতির বিরুদ্ধে মুরশিদের সংগ্রামে তিনি মদত জোগাবেন।

এ যুগে কোনো কবি কলকাতায় এমন সম্মান পান নি। কিন্তু তাঁর প্রতি এতো লোকের এতো মরম কেন ? শুধু তাঁর অতীতের দানের জন্যই নয় ;

বর্তমানেও বিচ্ছিন্নতায় বন্দী কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে সম্মান জানাবার অছিলায় জনজীবনে যাবার নিজেদের অক্ষমতার আক্ষেপের কথাই জানিয়েছিলেন। তাঁদের সামনে লোকসংস্কৃতিই যে জনজীবনে যাবার কাদামাটির পথের একমাত্র সাঁকো সে-কথা বলবার সবচেয়ে বড়ো অধিকার ছিল কবি জসিমউদ্দীনেরই। আর সেই বেত-বাঁশের সাঁকোটির ওপর দিয়ে যাঁরা আজ হাওয়াগাড়ি চালিয়ে গ্রামে যেতে চান তাঁদের অপচেষ্টার নিন্দা করবেন এটুকুই তাঁর কাছ থেকে চেয়েছিলাম। কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ তাঁর কাছ থেকে আমরা চাইনি—সেটা আশাও করি নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের "সাংস্কৃতিক জাগরণে" উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি নাকি ভাগীরথীর পার থেকে পদ্মার পারে ফিরে গেছেন।

এটাও কি তাঁর উদারতা? না অন্য কিছু? পূর্ব-পাকিস্তানের বুকের লহু আজ টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু কবির মধ্যে তার কোনো উত্তাপ পেলাম না। মুরশিদের এই আক্ষেপ। পূর্ব-পাকিস্তান এখন ভিন্ন দেশ; কাজেই কূটনৈতিক সাবধানতা এবং কোনো কোনো বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন—নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উত্তাপ তো কথার জিনিস নয়, পরশের জিনিস।

যাহোক একটি বিষয়ে মুরশিদ কবির মত পাল্টাতে পেরেছিলেন। সে বিষয়টাই আজ লিখছি।

প্রথম দিনের আলাপেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কয়েকমাস আগে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে পূর্ব-পাকিস্তানের সারুয়া কালো মাটিতে যে রুধিরের বান ডেকেছিল—লোকসংগীতের ক্ষেতে কি তা কোনো ফসল ফলায় নি? সেই ফসলের কোনো খবর তাঁর কাছে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—যদি কোনো পল্লীরচয়িতা লৌকিক সুরে ও কথায় সেই গৌরবের কাহিনী গানে বা পালাগানে লিপিবদ্ধ করে থাকেন তবে কি আপনি তাকে লোকসংগীত হিসাবে স্বীকার করে নেবেন? আমার কাছে ছিল এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন—যার উত্তরের ওপর নির্ভর করছে আজকের লোকসংগীতের বিকাশের ঠিকানা আর ভবিষ্যতের নিশানা। আমার প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব দিলেন না। তিনি Encyclopædia Britanica-তে দেওয়া লোকসংগীতের সংজ্ঞার কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন "যদি তার ভাষা সুর ও প্রকাশভঙ্গী লৌকিক হয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়—ওপর থেকে কোনো রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার তাগিদে রচিত না হয়ে থাকে"—ইত্যাদি বহু 'যদি' দিয়ে নিজেকে ঘেরাও করে দ্বিধাগ্রস্ত জবাব দিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম লোকসংগীতের সংজ্ঞার পূর্বশর্ত—সুর, ঢঙ, ভাষা, বাচনভঙ্গী এবং আরেকটি বড়ো জিনিস জন-

সাধারণ কর্তৃক গ্রহণ—ইত্যাদি বিষয়ে কবির সঙ্গে মুরশিদের কোনো মতপার্থক্য নেই। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার মতপার্থক্য দেখা দেয়।

যে-আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ লোকের মনে এমন দোলা লাগায়, শত শতাব্দীর কৃষিভিত্তিক সমাজে শোষকশ্রেণীর আত্মসমর্পণের এবং খোদার দরবারে নালিশ জানানোর জীবনদর্শনের মূল উৎপাটিত করে—আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রত্যাঘাতের প্রেরণায় নসিবের দোহাই ছেড়ে শোষকের দরবারে হানা দিতে শেখায়—সেটায় কি স্বতঃস্ফূর্তি থাকে না? আত্মসমর্পণের জীবনদর্শনে শোষণ ও অত্যাচারকে 'নসিব' বলে মেনে নিয়ে গ্রামের সর্বহারা কৃষক যখন দেহের অনিত্যতা ও সংসারের অসারতার গান গেয়ে সান্ত্বনা লাভ করে—তখন সে-লোকসংগীতে রাজনীতি থাকে না, সেটা হয় স্বতঃস্ফূর্ত। আর সেই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেই তা হয় 'রাজনীতি'—কাজেই তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া জিনিস—কাজেই লোকসংগীত নয়; ভাষায় সুরে বাচনভঙ্গীতে লৌকিক হলেও কিংবা লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ সেই গানে মাতোয়ারা হলেও। এহেন যুক্তি ও গোঁড়ামী আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকসংগীত গবেষকের মধ্যে দেখেছি। কাজেই কবি জসিমউদ্দীনের দ্বিধার কারণও বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছিল না।

গত শতাব্দীতে ও এই শতাব্দীর প্রথম দিকে সারা ভারতে বৃটিশ শাসক ও তাদের আশ্রিত ভূম্যধিকারী ও মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ ঘটেছিল। সে-সময় স্বতঃস্ফূর্ত ছড়া ও গান জন্মেছিল, কিন্তু গবেষকদের গোঁড়ামীতে এসব লোকসংগীতের স্বীকৃতি পায় নি। এসব গানের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোনো চেষ্টাই তেমন করা হয় নি। তাই লোকসংগীতের এই গৌরবময় ঐতিহ্যের অনেক নিদর্শন আজ অবলুপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য।

বিদ্রোহ করেছে কিন্তু বারে বারে পরাজিত হয়েছে আমাদের জনসাধারণ। তাই বিফলতার এবং বঞ্চনার করুণ সুরটাই বেশি করে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে আমাদের লোকসংগীতে। এই লোকসংগীতগুলি জনতার জীবনের ট্র্যাজেডিরই দর্পণ।

কবি জসিমউদ্দীন আত্মজীবনীমূলক 'স্মৃতির পটে'-তে "আঙুল কাটিয়া কলম বানাইয়া নয়নের জলের কালী" দিয়ে এমন কয়েকটি জমিজিরাতহীন গ্রাম্য শিল্পীর মরমী ছবি এঁকেছেন—যা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁদের মধ্যেই এক সময় তিনি ঘুরেছেন—তাঁদের শূন্যঘর থেকেই লোকসংগীতের সম্পদ আহরণ করেছেন।

চরভদ্রাসনের আইজদ্দীর বউটিকে তিনি ভুলতে পারেন নি—মুরশিদও ভুলতে পারছে না। উপোস করে মরলো কিন্তু ইজ্জৎ বিক্রি করলো না।

"শাকপাতা নুন ফেন খাওয়া আইজদ্দীর বউ-এর 'বুহির দুধ' শুকাইয়া গেছে—কচি ছাওয়ালটারে চাইলের গুঁড়া পানিত বলক দিয়া খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখছে—কেবল কবির 'দোওয়ায়'। কবি তো সাধারণ লোক নন—পীর মুরশিদেরও বড়।......আইজদ্দী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'কবি সাব, ক্ষিধার সময় ও যহন কান্দে তহন মনে অয় ও যদি না ঐত তাই যেন্ বাল ছিল।......আমাগো গরিবির পুলাপান না অওয়াই বাল।

রাত্রে মুর্শিদা গানের আসর বসিল। একপাশে আইজদ্দী বসিয়া। গানের পর গান চলিতেছে—

দুবলার শিষে যেমন নিহারের পানি
কোনজনা বেইমানে কইছে এই দেহ আপনি।
বড়ঘর বাইন্দাছ সোনা ভাই বড় করছাও আশ।
রজনী প্রভাতের কালে পঙ্খী ছাড়বে বাসা।

গান শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিলাম, জীবনে যাহারা কিছুই পাইল না, পৃথিবীর সুন্দর ভোগের পাত্রখানি যাহাদের কাছে চিরকালের মতোই রুদ্ধ, এই বৈরাগ্যের গান তাহাদিগকে কে শিখাইল!

কি হালে কিভাবে রাখছরে দয়ালচান তুই আমারে
যেভাবে রাইখাছ ওরে দয়ালচান
আমি ভাইতি সুখী আছি রে।
তুমি কার বিছাও দালান কোঠা আমার ভাঙ্গা কুইড়ারে
তুমি কারে খাওয়াও চিনি সন্দেশ আমার খুদের জাউরে।

এই গান উহাদের কে শিখাইল ?......কিন্তু আজ খুদের জাউও যে তাহাদের নিকট হইতে অপসারিত হইয়াছে, দয়াল আল্লা আজ কী সান্ত্বনা তাহাদের দিবেন ?......যাহারা বড় ঘর বান্ধিয়া, বড় আশা করিয়া আছে, রজনী প্রভাতের কালে পঙ্খী বাসা ছাড়িয়া যাইবে এই অভিশাপের বাণী শুনিয়া সেই বড় লোকেরা কি এক মুহূর্তের জন্যও এই সব অনাহারী ভাইবোনদের কথা একবারও চিন্তা করিবে ?...

গানের মজলিশে সবার চোখের পানির সঙ্গে আমারও চোখের পানি মিশাইয়া এই কথারই মীমাংসা খুঁজিতেছিলাম।......মুর্শিদা গানের করুণ সুরের ওপর পা

ফেলিয়া আইজদ্দীর সেই সুন্দর বউটি যেন তার কঙ্কালসার পুত্রটিকে কোলে লইয়া ডুকরিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে।"

লোকসংগীতের স্রষ্টা যাঁরা তাঁদের সৃষ্টিশীল উপোসী আত্মার এমন ছবি কেবল জসিমউদ্দীনই আঁকতে পেরেছেন। এ-ছবি যাঁদের চোখের সামনে থাকে না তাঁরা কোনোদিন আবেগ দিয়ে লোকসংগীত গাইতে পারেন না। একথাটাই আমি কলকাতার লোকসংগীত গায়কদের অনেকবার বলবার চেষ্টা করেছি। আবেগ ধার করা যায় না। আবেগ অনুশীলনের জিনিস নয়। আবেগ আসে জীবনে জীবন মেলানো থেকে।

এই পশ্চাৎপট মনে নিয়েই কবি জসিমউদ্দীনকে বলেছিলাম—আপনার আইজদ্দীরই দোসর জমৃছেউদ্দীন, বা রসিদউদ্দীনরা যখন নেত্রকোণায় সর্বভারত সম্মেলনের লক্ষাধিক জমায়েতে গেয়ে ওঠেন,

আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কার কাছে জানাই
সুখের স্বপন ভাঙলোরে চুরাইবাজারে।
ও ভাইরে ভাই—তেরশ' পঞ্চাশের কথা
মনে কি কেউর পড়ে রে মনে কি কেউর পড়ে
ক্ষুধার জ্বালায় বুকের ছাওয়াল মায়ে বিক্রি করে রে
চুরাইবাজারে।
... ...

কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে লক্ষ লোককে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানিয়ে জমৃছেউদ্দীন তাঁর দীর্ঘ গানের পালা শেষ করেন। কৃষক সভার আন্দোলনের ঢেউ-এ পাল তুলে আপনার আইজদ্দীর জীবনের ভাঙা নাও নিয়ে উজান বেয়ে নতুন প্রাণ ও স্বাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাঁরই একজন দোসর—জীবন-বন্দরে পৌঁছবার জন্য বৈঠা হাতে তুলে নিয়েছিল। এটা কি লোকসংগীত নয়? কৃষকের একমাত্র বিলাস—পান-সুপারী ও তামাক। সেই পান ও তামাকের ওপর যখন ট্যাক্স বসলো তখন সিলেটের আব্দুল গফ্ফর প্রচণ্ড শ্লেষ ও বিদ্রূপে গান লেখেন:

সজনি, গুয়া গাছো টেক্স লাগিল নি—
বাটার উপর পইলো ঠাটা
গাল ভরি পান খাইতায় নি॥

টেক্স দিও বিয়া বইলে
টেক্স দিও পুয়া হইলে
মইলে পরে টেক্স দিয়া
চিতার আগুনে জলবায় নি।
তারার টেক্সীর তেল জুগাইয়া
আমরা মরি টেক্স বইয়া
ভূতের বেগার খাটি মইলাম
মইলে ভূত রইমু নি॥

(গুয়া—সুপারী। ঠাটা—বাজ। পুয়া—ছেলে। সব মটর গাড়িকেই গ্রামে 'টেক্সী' বলে। নি—মানে কি। খাটি—খাটিয়া)।

এই গানখানা পুরো গাওয়া হবার পর কবি এই রচনার তারিফ করেন পঞ্চমুখে। এটা যে লোকসংগীত—নতুন ভাবের, একথা কবি জসিমউদ্দীন অস্বীকার করতে পারলেন না।

সাবধানে গুরুজীর নাম লইও রে—সাধুভাই
সাবধানে গুরুজীর নাম লইও।

এই সারিগানের ধারা বেয়েই যদি একজন আজকের রচয়িতা লেখেন—

তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শাণ কিষাণ ভাইও—
কাস্তেটারে দিও জোরে শাণ
ফসল কাটার সময় এলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান-রে
কাস্তেটারে দিও জোরে শাণ॥
ইত্যাদি……

এই গান যখন বাংলার গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ কৃষকের কণ্ঠে, ঘাটে পথে, জমায়েতে, ধানের ক্ষেতে ধ্বনিত হতে শুনি তখন কি তা লোকসংগীত হয় না? —যেহেতু কান্নার কথা নেই—আছে লড়াই-এর কথা?

বলা বাহুল্য, আমি লোকসংগীতে গণনাট্য আন্দোলনের অধ্যায়ের কথাই তাঁকে বলছিলাম। কবি জসিমউদ্দীনরা লোকসংগীতকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন—কিন্তু সারা ভারতে গণনাট্য আন্দোলন লোকসংগীতকে পুনঃসঞ্জীবিত করেছিল নতুন ভাবসম্পদে—শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনায়।

গণনাট্য আন্দোলনে প্রধানত দু'ধারায় গীত রচিত হয়েছিল। একটি ডি, এল,

রায়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদী স্বদেশী গানের ধারায়। যার নাম হলো গণসংগীত। আরেকটি প্রবহমান বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকসংগীতের ধারায়—এগুলি কৃষক আন্দোলনের গান বলে সেদিন পরিচিত হলেও—ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে লোক-সংগীতের শীর্ণ স্রোতে আনে নতুন ভাবের বন্যা। রচনায়, সুরে, জনগ্রাহ্যতায় তা হলো লোকসংগীতের ক্ষেত্রে একেবারে নতুন সোনালী ফসল।

আমি একথা বলছি না যে, সে সময়কার সব গানই সার্থক হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন লোকসংগীতেও বহু অসার্থক গান আছে—দেহতত্ত্বের কিংবা কানাই বলাই-এর পুনঃপৌনিকতায় একেবারে রচনার শিথিল গ্রন্থিতে অত্যন্ত দুর্বল। গণনাট্য গানেও তেমনি হয়েছে অনেক। লোকসংগীতের কাব্যমাধুর্য অনেকেই বজায় রাখতে পারেন নি। তাছাড়া শত শত বৎসরের যে জীবনদর্শনে জনজীবন আচ্ছন্ন সেখানে লোককবির যদি কোনো নতুন জীবনদর্শনে মনের গভীরে দানা না বাঁধে—তবে তাঁর প্রকাশভঙ্গী অনেক সময় যান্ত্রিক হয়। কবি রমেশ শীলকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনার মাইজভাণ্ডারের দেহতত্ত্বের গানগুলিতে যে কাব্যগুণ পাই—কৃষক আন্দোলনের গানগুলিতে তা পাই না কেন? তাঁর সঙ্গে আলোচনার অভিজ্ঞতা থেকেই আমি একথাগুলি বলছি। তবু পূর্ববঙ্গের কবিয়ালের ঐতিহ্য অনুসরণ করে রমেশ শীল যখন' মাউণ্টবেটনী স্বাধীনতা'-র স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন—

কুদিন গেল, সুদিন এল
বড় সুখের কথা—
বসন্তের বাতাসে কেনে
ঝরে গাছের পাতা?
দেশের কি স্বাধীনতা আসিল?

তখন রমেশ শীল অগণিত মানুষের মনের কথাটাকে প্রকাশ করে আজকের যুগের কবিয়ালের মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণায় সেদিনের লেখা বহু গান লোকসংগীতের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হয়ে জমা হয়েছে। আজ রেডিও বা রেকর্ড কোম্পানী বা কিছু গোঁড়া লোকসংগীত গবেষক সেগুলিকে বাদ দিতে চাইলেই তা বাদ হয়ে যাবে না—জনসাধারণের মনের মণিকোঠায় জমা হয়ে থাকবে। কিন্তু এ ধরণের গান হবার পর, পূর্বপাকিস্তানের—তথা বাংলা ভাষার মোড় ফেরানো ঘটনা ২১শে ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে—ময়মনসিংহের চারণ সুরে রচিত ব্যালাড

'ঢাকার ডাক' কবি জসিমুদ্দীনকে মুরশিদের সহযোগী শিল্পীরা শোনালেন— । সমস্ত অন্তর তাঁরা সেদিন ঐ গানে ঢাকার প্রতিনিধির সামনে ঢেলে দিয়েছিলেন ।

শোন দেশের ভাইভগিনী
শোন আচানক কাহিনী
কান্দে বাংলা জননী
ঢাকার শহরে ॥

ভাই রে ভাই—বুড়িগঙ্গার মরাপানি—
তার বুকে কে আনলো জোয়ানী—রে
কা'র কইলজার খুনে বয় উজানী
শুকনা বালুর চরে ।

ভাইরে ভাই—
২১শে ফেব্রুয়ারী দিনে
খুশির মধু নয়া ফাগুনে রে
হঠাৎ দিনদুপুরে অমানিশার
ঢাকলো অন্ধকারে ॥
... ...

ভাইরে ভাই—
যে ভাষায় আমার ফুটে বুলি
ফুটে আমার প্রাণের কলি—রে
সে গুলবাগে চালাইল গুলি
নিতে সেই ফুল ছিঁড়ে ।
... ...

ভাষা আন্দোলনের ঘটনার ও শহীদদের আত্মদানের বর্ণনা সুরের আশ্রয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল—তাতে কবি জসিমউদ্দীন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। গান এগিয়ে চলেছিল—

কাইন্দ না মা কাইন্দ না আর বঙ্গ জননী ।
... ...
যে ভাষায় আমি কান্দি হাসি ভাষা আমার জান—
যে ভাষায় রাখাল বাজায় বাঁশী মাঝি ধরে টান—

আজ মেশিনগান কি রুখতে পারে আমার বাংলা গান—
জান যাবে তো যাবে না জবানী ॥
শহীদস্তম্ভ ভাঙে কারা সাধ্য আছে কার
মোদের সিনায় সিনায় ওঠে শহীদের মিনার
সেই মিনারে মোয়াজ্জীনের নয়া জমানার
শোন ভোরের শোন আজান ধ্বনি ॥

গান শেষ হবার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে কবি মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন লৌকিক ঢঙে যে এই বিষয় নিয়ে এমন গান তৈরি হতে পারে—তিনি তা ভাবতে পারেন নি।…

॥ আট ॥

যেদিন মাহুত শিকার যায়
নারীর মন ঝুরিয়া রয় রে।

সাধারণ মানুষের এক অসাধারণ শিল্পী বর্তমানে আছেন, কলকাতায়। নাম তাঁর প্রতিমা বড়ুয়া। সারা ভারতের অনেক লোকশিল্পীর সঙ্গে মুরশিদের মোলাকাত হয়েছে—দোস্তিও আছে অনেকের সাথে, কিন্তু মুষ্টিমেয় যে-কয়জনকে দেহে-মনে-প্রাণে লোকসংগীতেরই প্রতিমূর্তি বলে মুরশিদ ভাবেন—প্রতিমা বড়ুয়া তার অন্যতম।

অনেকেই মুরশিদের উপর খাপ্পা—ভাবেন সে দুর্মুখ, কারণ নেতিবাচক কথাই তাঁকে বেশি বলতে হচ্ছে; লোকসংগীতের এমনি দশা। কিন্তু বালুচরের লোক-সংগীতকে ভালোবাসি বলেই, বেতারের 'অলৌকিক' গায়ক ও গবেষকদের অপ্রিয়-ভাজন হয়েছি। যা হোক শত বিতর্কের চেয়েও বড়ো একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। সেই সার্থক দৃষ্টান্তটিই আজকে পাঠক সাধারণের কাছে উপস্থিত করতে চাই। জানি গানের পরিচয় গানেই—কথায় নয়। মাঝে মাঝে আকাশবাণীর ছায়াছবির গানের 'স্টারমার্কা' স্খলিত কণ্ঠের ধারার মাঝখানে হঠাৎ একটি 'বন্যকণ্ঠ' শুনে অনেক সমজদার ব্যক্তিকে চমকে উঠতে দেখেছি—"গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে।"—জিজ্ঞেস করেছেন, কি জানি নামটা? ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে যে মহিলাটি মাহুতের গানটি গেয়েছেন? উত্তরে বলেছি ভুল করেছেন মশাই, বলুন, যে মহিলাটির সঙ্গে ভূপেন হাজারিকা গেয়েছেন। নাম প্রতিমা বড়ুয়া। প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাইঝি।

আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় গৌরীপুর। আসামের সবচেয়ে পশ্চাদপদ জেলা গোয়ালপাড়া। কোমরের মেখলার মতো মাঝখান দিয়ে বহে গেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। বৃটিশ শাসকদের খেয়ালখুশিমাফিক—১৯১২ ইংরেজী পর্যন্ত গোয়ালপাড়া জেলাগতভাবে স্থিতিলাভ করতে পারে নি। ১৭৬৫ সনে এই জেলার ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাংশ আসে কোম্পানীর কবলে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬৪ সনে ভুটান যুদ্ধের পর—অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দী পর গোয়ালপাডার উত্তরাংশ বৃটিশ শাসনের অধীনে আসে। ১৭৭৫ থেকে ১৮২২ সন পর্যন্ত গোয়াল-পাড়া, ধুবরী ও কোকরাজার থানা রংপুর জেলার অন্তর্গত করা হয়। ১৮২২ সনে এই ৩টি থানাকে গারোপাহাড়ের সঙ্গে জোট বাঁধিয়ে উত্তর-পূর্ব রংপুর নামে এক নতুন জেলা গঠন করা হয়। ১৮২৬ সনে বাংলা দেশ থেকে সেই জেলাকে আসামে আনা হয়। কিন্তু ১৮৬৭ সনে ঐ ৩টি থানাকে আবার কুচবিহার কমিশনারশিপের অধীন করে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। ১৮৭৪ সনে আবার ঐ থানাগুলিকে আসামে এনে গোয়ালপাড়া জেলা পত্তন করা হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর আবার পূর্ববঙ্গের সাথে জুড়ে দেয়া হয়। কিন্তু ১৯১২ সন থেকেই স্থায়ীভাবে ঐ জেলা আসামেরই অন্তর্গত হয়ে আছে। আসাম উপত্যকার একমাত্র গোয়ালপাড়া জেলায়ই জমিদারী প্রথা ছিল: ১৯৫১ সনে জমিদারী প্রথা রদ হওয়ার পরও গোয়ালপাড়ার জনসাধারণের জীবনের কোনো পরিবর্তন আসে নি।

এই টানা-হ্যাঁচড়ায় জনজীবনে দুর্ভোগ এলেও গোয়ালপাড়া জেলা নিজস্ব লোকসংস্কৃতির ধনে ধনী। এই লোকসংস্কৃতির আবার প্রধান দুটি ধারা। একটি গৌরীপুরকে কেন্দ্র করে কোচ-রাজবংশী ধারা—আরেকটি কোকরাজারকে কেন্দ্র করে বড়ো সংস্কৃতির ধারা। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় গৌরীপুরের লোকসংগীত।

কুচবিহারকে কেন্দ্র করে কুচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে কোচ-রাজবংশী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে—গৌরীপুর সেই সংস্কৃতিরই অঙ্গীভূত। বিশেষ করে তার ভাষা। এ-ভাষা বাংলাও নয়, অসমীয়াও নয়—যদিও অসমীয়ার সাথে এর সাদৃশ্য বেশি।

ভাষাতত্ত্ববিদরা তার জ্ঞাতিগোত্র নিয়ে যাই বলুন, আজ এই আঞ্চলিক ভাষাটি ভাওয়াইয়া সুরের মাধ্যমে, তার ধ্বনিমাধুর্য, বাক্যবিন্যাসে, শব্দগঠনে ও প্রকাশভঙ্গিতে, অপূর্ব জীবন-ঘনিষ্ঠতায় ও গণমানসের আকুতিতে এমনি ভরপুর যে উপভাষা বলে তার মর্যাদা খাটো করতে ইচ্ছে হয় না। বৈপ্লবিক গণসংগ্রামের

সাথে সাথে অনেক অবহেলিত উপভাষাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষার মর্যাদা অর্জন করেছে—আমাদের দেশেও ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়মেই অসংখ্য অবজ্ঞাত উপজাতি ও উপভাষা জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

গৌরীপুরের গান যদি কোচরাজবংশীর গান—ভাওয়াইয়ারই অঙ্গীভূত হয়ে থাকে তবে তাকে গৌরীপুরের গান বলে আলাদা করছি কেন? আমি এর আগে আলোচনা করেছি যে, লোকসংগীতের 'ঘরানা' নেই আছে 'আঞ্চলিকানা'। মোটামুটি ভাষার ঐক্য থাকলেও সুরের দিক দিয়ে ও ভঙ্গীর দিক দিয়ে এই আঞ্চলিকানাকে কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চলে বিভাগ করা যায়—যদিও কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা টানা মুস্কিল। গৌরীপুরের ভাওয়াইয়ার সুর শুনলেই কুচবিহারী ভাওয়াইয়ার সাথে তার পার্থক্য ধরা পড়ে। অবশ্য কিছু কিছু ভাওয়াইয়া গান আছে যা কোন্ বিশেষ অঞ্চলের তা বলা মুশকিল। যেমন:

দীঘল শিমিলার গগনে ম্যালে ডাল
নারী হয়া রসের যৈবন রাইখবো কত কাল
বিরিক্ষ শিমিলারে—

এই গানটির সুরে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়ার অতিপরিচিত রূপটিই ফুটে ওঠে। গৌরীপুরের কোনো বিশেষত্ব পাই না।

কিন্তু যখন শুনি—

"আজি আউলাইলেন মোর বান্দা ময়ালয়ে"—তখনই ধরা পড়ে গৌরীপুরী ভাওয়াইয়ার বিশিষ্ট চেহারাটি। সুরের এই আঞ্চলিক ঢঙটিই লোকসংগীতের প্রাণভোমরা। আর গৌরীপুরের লোকগীতিরই প্রাণভোমরাটিকে প্রতিমা নিজের কণ্ঠে বন্দী করতে পেরেছেন। এখানেই তাঁর সাফল্য। এর সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে মিশেছে সামন্ত সমাজে নিগৃহীত মেয়েজীবনের বেদনাবোধ। গৌরীপুরের তথা উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের অন্তর্লীন আবেদনটি মেয়েজীবনের রুদ্ধ আকুতির। আদি যৌথ ট্রাইবাল সমাজে সামন্তবাদের প্রচারক ও রক্ষক ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত হিন্দুধর্মের সাথে সাথে এল সিঁদুর, ঘোমটা, বাল্য-বিবাহ, পণপ্রথা, সামাজিক দ্বৈতনীতি। পুরুষের বহুবিবাহ, স্ত্রীর চিরবৈধব্য প্রভৃতি মনুর বিধান। ভাওয়াইয়া হলো মূলত সামাজিক দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আমাদের দেশের লোকসংগীতের সারিতে একে পাশ্চাত্য 'প্রটেস্ট সঙ্গস'-এর পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে পারি। সেজন্যই ভাওয়াইয়া গানে বিয়েকে বলে 'বেচেয়া খাওয়া'। "বাপে মায়ে বেচেয়া খাইছে, সোয়ামী পাগেলারে।"

ভাওয়াইয়ার আন্দোলায়িত বিলম্বিত আর্তি যেমন প্রতিমার গলায় মূর্ত তেমনি আবার গৌরীপুরের অন্ত বৈশিষ্ট্য মেয়েদের গান, বিশেষত বিয়ের গান কিংবা কার্তিকপূজার নৃত্য-সম্বলিত গীতও সমানভাবেই সার্থক। চট্‌কার শাণিত ব্যঙ্গও প্রতিমার পরিবেশনায় যেন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

কার্তিকপূজা উপলক্ষে চট্‌কার ছন্দে মেয়েদের গান—

চেংরা বন্ধুরে, মোর সোনার বন্ধুরে, মোর ভাবের বন্ধুরে
আমার বাড়ীত কার্তিকপূজা ঢাকের বায়না নে।
দশা পড়া সোয়ামীটা মোর মরিয়াও না যায়,
তবে সেনে মনটা মোর চল্‌চলা হয়;
ছেকায় খইলায় মাথা খসিহু হয়,
পানিয়া মরা যদি এ্যালায় মরিল হয়"...

প্রতিমার গলায় ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে এই গান শুনলে যুবতী স্ত্রীর বুড়ো স্বামীটির যেমন হবে গঙ্গাযাত্রা, সমাজপতিদের বুকেও বিঁধবে তেমনি ক্ষুরশাণানো ছুরি।

মুসলমানী বিয়ের গীত আমরা প্রায় শুনিই না। মোল্লা-মৌলবীর শরিয়তী শাসনে শ্বাসরুদ্ধ মুসলিমসমাজের মেয়েরাও তাদের গানে পুরুষশাসিত সমাজের বিধিনিষেধকে নানাভাবে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন।

প্রতিমার কাছেই শুনেছি :

দুমবদহর পারে, কি পারে মাও
কেওয়া বা কেষ্টির ফুল
মোর বাবার সেনে আনলে
কি আনলে মাও, ঘেঘা বা চাইয়া পাত্তর :
মুঞি ঘেঘার ভিতি দেখং
ও কি দেখং মাও, কান্দং বা মনে মনে
ও মুঞি হাসং বা চিতে চিতে ॥

মেয়ের বাবা, চাচা, মামা নানারকম পাত্রের প্রস্তাব নিয়ে আসছেন—মেয়ে তাঁদের বর্ণনা করছে একটা ঘেঘা (গলায় গলকম্বল) অন্যটা খোঁড়া আরেকটা কালা ইত্যাদি। কী নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান।

কিন্তু তথাপি গৌরীপুরকে, তার গানকে বাংলাদেশের লোকে জানে তার মাহুতের গানে। অনস্বীকার্য, মাহুতের গানগুলিই যেন গৌরীপুরের হৃদ্‌স্পন্দন। আর তারো সার্থক প্রবক্তা হলেন প্রতিমা। একজন মেয়ে কী করে মাহুতের

গীতকে এমন আত্মস্থ করতে পারলেন? সেটা তার পারিবারিক ঐতিহ্যের দান।

অনেকদিন আগে গণনাট্য সঙ্ঘের কয়েকজন গায়ক-গায়িকাকে নিয়ে ধুবড়ি থেকে গিয়েছিলাম গৌরীপুরে। আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল পরলোকগত প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়ি, আর 'মুক্তি' ছায়াছবির একজন মুখ্য অভিনেতা তাঁর সেই হাতীটি। পরিবারের অতি আপনজন হাতীটি আর জীবিত নেই, তবে তার স্মৃতিকে নাকি জীবন্ত করে রাখা হয়েছে। মাটিয়াবাগের সেই স্মৃতিজড়িত ভবনটির সামনেই দেখা হলো প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই প্রকৃতীশ বড়ুয়ার সাথে। 'লালজী' বলেই তিনি সারা আসামে বিখ্যাত। বন্য হাতীর সাথে তাঁর আত্মীয়তা, বাঘের সাথে বন্ধুত্ব। ঝিঁঝিঁ-ডাকা সন্ধ্যায় মাটিয়াবাগের খোলা সবুজ ঘাসের গলিচায় বসে তিনি আমাদের শিকারের গল্পে জমিয়ে রাখলেন। বন্য হাতী ধরা তাঁর ব্যাবসায়। জঙ্গলেই জীবন কাটাতে হয়। গল্পের মাঝখানে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আপনারা তো গায়ক, বলুন তো সবচেয়ে ভালো, ভরাট, সুরেলা ও জোরালো গলা পৃথিবীতে কোন্ শিল্পীর?" আমরা হকচকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে, কঠিন প্রশ্নে পরাভূত ছাত্রদের কাছে প্রধান শিক্ষকের মতো নিজেই উত্তর দিয়ে বললেন "গায়ক হবেন কী করে? সেই গলাটি না শুনলে—সেই গলায় গলা না সাধলে? চলুন আমার সঙ্গে অন্তত ছ'মাস থাকুন আমার তাঁবুতে। গভীর রাতে ঘন অরণ্যে কখনো শুনেছেন বাঘের ডাক? ভারতবর্ষের কতো বড়ো বড়ো ওস্তাদের গান শুনলাম, কিন্তু এমন দরদী, দরাজ গলার আওয়াজ কারও শুনলাম না।"

পিতা প্রকৃতীশ বড়ুয়ার সাথে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে এই বাঘের 'ঘরানায়' সুর সেধেছেন প্রতিমা। তার গলার দরদটা সেখানকার। বড়ুয়া পরিবারের ঐতিহ্যের কথা বলতে হলে প্রমথেশের পিতা প্রভাত বড়ুয়ার কথা না বললে চলে না। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। অধ্যয়ন ছিল গভীর। আমার বন্ধু 'মাহুত বন্ধু রে'র লেখক, প্রমথেশ-পুত্র অলকেশ বড়ুয়ার কাছে প্রথম শুনেছিলাম এই অসাধারণ মানুষটির কথা। তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল ব্যাপক। তাঁর অমূল্য গৃহ-গ্রন্থাগারে পাতায় পাতায় নিজ হাতের টীকাটিপ্পনি সহ কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' তার সাক্ষ্য বহন করছে। সংগীতে তত্ত্বগত পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর লিখিত 'সংগীত সোপান' গ্রন্থে। আসামের রাগসংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ লক্ষ্মীরাম বড়ুয়ার সংগীত সাধনায় হাতেখড়ি তাঁর কাছেই। পাশ্চাত্য সংগীতের গভীরেও

তিনি ডুব দিয়েছিলেন। আবার তিনিই প্রথম সে-অঞ্চলের গ্রাম্যজীবনে ছড়ানো ধূলিমাখা সোনাদানা—লোকসংগীতের দিকে শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি ফেরান। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তাঁর মেয়ে নীহার বড়ুয়া, নীলিমা বড়ুয়া প্রমুখ পরিবারের অনেকে রাজপরিবারের আভিজাত্য ছুঁড়ে ফেলে গৌরীপুরের সাধারণ নিরক্ষর গরীব মানুষের ঘরে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় মোড়া লোকসংগীতের রত্ন আহরণে লেগে যান। নীহার বড়ুয়ার কাছেই প্রথম আমি গৌরীপুরের লোকগীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি এবং নীলিমা বড়ুয়ার নেতৃত্বে গঠিত একটি দলের নৃত্য-গীতে শিলং-এ প্রথম গৌরীপুরের লোকনৃত্যের সহজ, সুন্দর, প্রাণবন্ত রূপটি দেখতে পাই। আর গৌরীপুরের অবিস্মরণীয় লোকশিল্পী বয়ান শেখের কণ্ঠে পাই প্রথম সেই অঞ্চলের সুরের স্বতঃস্ফূর্ত ফোয়ারাটিকে। কিন্তু গৌরীপুরের লোকগীতির পরিপূর্ণ রসঘড়াটির সন্ধান পাই প্রতিমার কাছেই।

"হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা বামুনের নারী"

আসামের চিরন্তন সবুজ পরিধানের আঁচলে বাঁধা গৌরীপুর। বর্ষা শেষে শরতের সোনালী রোদে ভুটান পাহাড়ের হাতছানিতে বেরিয়ে পড়ে পোষা হাতীর পিঠে মাহুত ও ফান্দীর দল। অন্তত ছয় মাসের রসদ ওদের সঙ্গে। আর আছে সাথে চিরসাথী সেই দোতারাটি। 'মনাস', 'সঙ্কোশ' ও 'চম্পা' নদীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা 'জেনালী', 'জাকার্তী' প্রভৃতি পার হয়ে ওরা সমবেত হয় ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে মহলদারের খড়ের তৈরি ক্যাম্পে, 'ধুরা'য়। সন্ধ্যায় অরণ্যের পরিবেশে জ্বলে ওঠে 'আগুনের' ধুনি। এই ধুনির চারপাশে বসে আরণ্যক সুরায় ওরা বিভোর হয়। টুংটাং করে-বাঁধা দোতারার তারে আঙুল নড়ে ওঠে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষার জীবিকা। একটি অসতর্ক মুহূর্তে যাবে পরপারে। বীরের জাত। তবু মনটা ঘরে ফেলে-আসা নতুন বৌটির কাছে, আপনজনের কাছে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে চায়:

> বালু টীল্‌টীল্ পঙ্খীরা কান্দে বালুতে পড়িয়া
> আরে গৌরীপুরীয়া মাহুত কান্দে—ও, সখী ঘরবাড়ী ছাড়িয়া—
> ও মোর দান্তাল হাতীর মাহুত রে
> যেদিন মাহুত শিকার যায়, নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয়।

হাতী ধরার দুটো পদ্ধতি, মেলা ও খেদা। বন্য হাতীকে ধরে আনার পর তাকে বশ মানানোর প্রচেষ্টা কী কঠোর অথচ কী মমতামাখা। একদিকে অঙ্কুশের

ঘা, অন্যদিকে সুরের পরশ বুলানো পাতার চামর। সেই ঐন্দ্রজালিক যুগেরই রেশ। সংগ্রাম ও সাযুজ্যের কী অপূর্ব সমন্বয়।

হস্তীর কন্যা, হস্তীর কন্যা বামুনের নারী
মাথায় নিয়া তাম্ কলসী ও, সখি হস্তে সোনার ঝারি।
সখিও—ও মোর হায় হস্তীর কন্যারে
খানিকো দয়া নাই মাহুতক লাগিয়া—রে

হস্তীর কন্যা কী করে হলো বামুনের নারী? গল্পটা সংক্ষেপে কিছু বলতে হয়। গরীব-দুঃখী বামুন জয়নাথ ও তার পত্নী জয়মালার কাহিনী। এক বিত্তবান ব্রাহ্মণের বাড়িতে যজমানী করতে গেলে তার কুরূপা কন্যাকে বিয়ে করতে জয়নাথকে বাধ্য করা হয়। প্রচুর অর্থ, সোনা-রূপা, দাসী ও নতুন স্ত্রী নিয়ে জয়নাথ ঘরে ফিরলো। ধনের গৌরবে উদ্ধত, স্বার্থপর সপত্নীর কাছে শুরু হলো জয়মালার নিগ্রহ। মাথায় তামার কলসী ও হাতে সোনার ঝারি নিয়ে সপত্নীর জন্য রোজই জল আনতে যেতো জয়মালা। পাড়ে বসে একদিন নদীর জলে তার চোখের জল মিশেছিল। সেই পথে তখন যাচ্ছিল যুথবাঁধা একদল হাতী জয়মালার দুঃখ দেখে তাকে তারা তুলে নিয়ে গেলো। পাহাড়ের ওপর এক ঝর্ণার সাতরঙা ধারায় তাকে স্নান করতে বললো। ঝর্ণার জলে জয়মালা রূপান্তরিত হলো এক রূপসী হস্তীকন্যায়। সেই থেকে হস্তিযূথের প্রধান পরিচালক হলো একটি মেয়ে হাতী।

পাত্তিরা করিয়া কন্যা
বাড়েয়া দিলেন পাও
মাথার উপর কাল-জিঠী
ও সখি করে পঞ্চরাও।

(দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করেছিলে, কিন্তু রওয়ানা হবার সময় টিকটিকি অমঙ্গলের ধ্বনি করলো—তাই তুমি বন্দিনী হলে।)

আকাশেতে নাইরে চন্দ্র
কী করে তোর তারা
যেবা নারীর পুরুষ নাইরে
ও তার দিনে আন্ধিহারা;
পুখুরীতে নাইরে পানি নৌকা
ক্যামনে চলে

যেবা নারীর সোয়ামী নাই
ও তার রূপে কী কাম করে।

বন্যতার সাথে মানবিকতার সংঘর্ষ ও সমন্বয়। বন্যতাকে জয় করেছে মানুষ—আর সেই জয়ের গানেই মানুষ সভ্যতার অগ্রগতির ছন্দ মিলিয়ে চলেছে। কিন্তু শ্রেণীসমাজে সেই শ্রমজীবী বীর মানুষও যে বঞ্চিত, নিঃস্ব, গৃহহারা। বিরহিণী যূথভ্রষ্ট হস্তিকন্যাকে অপহরণ করে এনে তারই কানে কানে তার মর্মব্যথার কাহিনী শুনিয়ে মাহুত ও ফান্দী তার অন্তর জয় করতে চাইছে :

আই ছাড়িলং, ভাই ছাড়িলং,
ছাড়িলং সোনার পুরী
বিয়া করিয়া ছাড়িয়া আসিলং
ও সখি অল্প বয়সের নারী।
ও মোর 'সারিন' হাতীর মাহুত রে—
যেদিন মাহুত ছাড়িয়া যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে।

অন্যদিকে যে মেয়েরা একবার মাহুতের প্রেমে পড়েছে—তাদের তো এই বুনো-চরিত্রকে ধরে রাখার কোনো উপায় নেই। মাহুত বা ফান্দীর প্রেমের জীবনে প্রতিফলিত এদের জীবিকার্জনের—শ্রমজীবনের চিরবঞ্চনার রূপটি। তাই মেয়ের উক্তিতে শুনি :

হাতীর পিঠিত থাকিহারে মাহুত
হাতীর মায়া জানো
নারীর মনের কথা তোমরা
কিবা জানোরে।

কিংবা—

আজি গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে।
হস্তী নড়ান হস্তীরে চরান কেকোঁয়া বাঁশের তলে
কি ওরে, কি কালসাপে দংশিল
মাহুতক রে কয়া যাও বা মোরে রে
রোজায় ঝাড়ে, গুণীনে ঝাড়ে ঢেকিয়ার আগাল দিয়া
কি ওরে মুঞি নারী ঝাড়িবাম
মাহুতক কাশের আগাল দিয়া রে।

গদাধরের পারে পারে

প্রতিমার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে বলেছি বোন, হুগলীর পারে বসতি কোরো না। গদাধরের পারেই থাক। আজকের কলকাতা, লোকসংগীত শ্রবণ করে না, চর্বণ করে। কিন্তু তবু অন্তত মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেই হয়। মৌচাকে মধু থাক বা না থাক—এই মহানগরী শুধু বঙ্গদেশের নয়, সমস্ত পূর্বাঞ্চলের মক্ষিরাণী। শিল্পী-ভ্রমরদের এখানে না এসে উপায় নেই। এর পাসপোর্ট ছাড়া কোনো শিল্পী শিল্পী হতে পারে না। আকাশবাণীর ইথার তরঙ্গে, গ্রামোফোনের ডিস্কে, কিংবা ছায়াছবির 'প্লেব্যাকে' যদি কণ্ঠ ছড়াতে না পারে, তবে শিল্পীজগতে সে অচ্ছুৎ। কিন্তু কণ্ঠের জোরে তা হয় না—একচেটিয়া-কবলিত এই ব্যূহ ভেদ করার কায়দা-কানুনও জানতে হয়। অতীতে গ্রাম থেকে আসা অখ্যাত পল্লীশিল্পী নিজের কণ্ঠের গুণেই রেকর্ড কোম্পানীর দাক্ষিণ্য লাভ করেছে—কিন্তু তে হি নো দিবসা গতা। কলকাতার ঘুঘু আধুনিক গায়ক ও গায়িকাদের দিয়ে 'লং প্লেয়িং' রেকর্ড করানো হয়—লোকসংগীতের, যা এদেশে ও বিদেশে ফোক্-সং অফ বেঙ্গল' বলে চলান হয়। তবু কলকাতায় আসতে হয়।

মুষ্টিমেয় হলেও সত্যিকারের গুণী সমঝদারও আছেন এখানে, যাঁদের ওপর ভরসা রেখেই মুরশিদ কলম ধরেছেন। প্রতিমার কণ্ঠ এখানকার সমঝদারদের ইতিমধ্যেই মুগ্ধ করেছে। কেউ কেউ রীতিমতো নতুন আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছেন। কোনো অঙ্গ সঞ্চালন নেই, গলার শির ফুলানো নেই—হারমনিয়মের দাপাদাপি নেই, তবলার রেলা নেই—একটি দোতারার তারের কম্পনের সাথে যেন বন-ভোমরার গুনগুনানি। নিচের সপ্তকেই প্রধানত গলা ঘোরাফেরা করছে—চড়া পর্দার চমক নেই। অথচ মন কেড়ে নেয়। একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রতিমা আমাকে বলেছিল, "কলকাতাতে বসে গান করলেও—যখন আমি গাই, আমার চোখের পর্দায় কিন্তু ভাসতে থাকে, সেই দুরন্ত ঘরছাড়া মাহুত ফান্দী—হাতী খেদা—বনবনানী—নিশুতি বন্য পশু-পাখীর ডাক—কত কিছু।" প্রতিমা যখন গান করেন তখন শহুরে শ্রোতাদের অশ্রুত এবং অদৃশ্য জনপদের ছন্দ ও অরণ্যের অর্কেস্ট্রা বাজতে থাকে বহুদূর থেকে আবহসংগীতের মতো। ভিসুয়াল ইমেজ বা মনশ্চক্ষুর চিত্রাবলী। লোকসংগীতের প্রধান পশ্চাদপট।

কয়েকদিন আগে কলকাতায় 'লেনিন যুব-উৎসবে' প্রতিমা বড়ুয়া ও নীহার বড়ুয়া মুক্তমঞ্চে প্রথম কলকাতার জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হন। এর আগে আমরা অবশ্য কয়েকবারই এঁদের ঘরোয়াভাবে পেয়েছি। প্রতিমার নৃত্যের গানের

সাথে নাচলেন ষাট বৎসর অতিক্রম করা শ্রীনীহার বড়ুয়া, দোতারা বাজালেন গৌরীপুরের গুণী দোতারা-বাদক রঞ্জিৎ মণ্ডল—সঙ্গত করলেন কলকাতার গুণী সঙ্গতী বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিচঢালা পথের কালো দাগ এখানকার যৌবনের গায়ে ক্ষণিকক্ষণের জন্য হলেও আসামের সবুজ পরশ যেন বুলিয়ে দিল। কয়েকজন মুগ্ধ শ্রোতা অনুষ্ঠানের শেষে আমাকে বললেন—এঁর গানগুলি কেন আমরা রেকর্ডে পাই না। আমি বললাম—জিজ্ঞেস করুন গ্রামোফোন কোম্পানীকে।

৪

আসামের বোল মঘাই ওজার ঢোল

সমতলে সেদিন আগুন জ্বলছে। শিলং পাহাড় থেকে গানের ব্রিগেড চলেছে উম্‌ইয়াম্‌ নদীর স্রোত বেয়ে সে আগুন নেভাতে। উম্‌ইয়াম্‌ মানে অশ্রুমতী। খাসিয়া উপকথার এক হতভাগা মেয়ের চোখের জলে প্রবাহিত এ-নদী। সেদিন তার জল কানায় কানায় পূর্ণ, বোধহয় সমতলের সংবাদে। আমাদের ব্রিগেডে ছিলেন অসমীয়া, বাঙালী, খাশিয়া, জয়ন্তীয়া, নেপালী শিল্পীরা। নেতৃত্ব করছিলেন ডঃ ভূপেন হাজারিকা ও এই প্রবন্ধের লেখক। সেদিন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পর্বতচূড়ায় শুভবুদ্ধির এই সংঘবদ্ধ অঙ্গীকার প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলেছিল চারদিকে। সেই প্রতিধ্বনিকে আরো জোরালো করার জন্য আমাদের সংগীত সমদলে অভাব অনুভব করছিলাম একটি দামামার। যাত্রার পূর্বে তাকে চিঠি লিখলাম—'ওজা ভাই, আমাদের অভিযানের "আগরহুয়া" হবে তুমিই আর তোমার ঢোল হবে আমাদের জয়ডঙ্কা।'

গৌহাটী, নওগাঁ, ঢিং প্রভৃতি অঞ্চল হয়ে পৌঁছলাম জোড়হাটে। জোড়হাটে পৌঁছেই ধাওয়া করলাম মঘাই ওজার বাড়ি। জোড়হাট থেকে চার মাইল উত্তরে আসাম ট্রাঙ্ক রোড ধরে ভোগদৈ নদী পার হয়ে চেনিজান চা-বাগিচাকে ডান হাতে রেখে বাঁহাতির বালুময় গেঁয়ো কাঁচা পথ ধরে কিছুদূর গেলেই মঘাই ওজার বাড়ি। মঘাই ওজার ছোট ছেলে অরুণ রাস্তা থেকে দৌড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মাকে বললো—'বরদেউতা আহিছে' অর্থাৎ জ্যাঠা এসেছেন। মঘাই বাড়ী নেই। তার স্ত্রী রোহিণী মাথার উপর ঘোমটা টেনে সলজ্জভাবে বললো, 'আপনার কথা ভেবে ভেবে এই কয়দিন উনার চোখে ঘুম নেই। শুধু বলেন, হে ভগবান, আমার দাদার যেন কিছু না হয়।'

শান্ত সবুজ উপত্যকায় হঠাৎ জলে-ওঠা আগুনে দগ্ধ মনের উপর এই কটি কথা মেঘের ছায়ায় ঘিরে দিল। অনেক চেষ্টাতেও চোখের জল রোধ করতে পারলাম না।

জোড়হাটে বাঙালী স্কুলে সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের অনুষ্ঠান। অসমীয়া বাঙালী দর্শক পাশাপাশি বসেছেন। একদিন কেন, এক ঘণ্টা আগেও ছিল তা অভাবনীয় ব্যাপার। পোশাকে প্রকৃতিতে, আকারে, আকৃতিতে, ভাষায় ও ভাবে এমন ঘনিষ্ঠ দুই জাতির মাঝখানে তখন যেন সমুদ্রের ব্যবধান। সমস্ত বিদ্বেষ-ভয়, সন্দেহ-

অবিশ্বাসের থমথমে চাপা গুমোটকে চৌচির করে দিয়ে বেজে উঠল মঘাই ওজার ঢোল। ধিন্ ধাও ধাও, খিৎ তাও তাও, ধিন্-খিত্তি-গিঘিন্-ধাও, ঘিনি খিতা গিঘিন্ ধাও। চিরাচরিত বিহুগানের বদলে সেই সুরের টানে মঞ্চের উপর improvise করে ভাষা-দাঙ্গার বিরুদ্ধে ছড়া কেটে ওজা মিলনের গান গাইলেন—

রাইজখনে কান্দিছে দা-ডাঙরীয়া
দেশখনে কান্দিছে চোয়া
রাইজর বলতে তুমি বলবন্ত
কিয়নো পাহবি যোয়া।

(দেশ কাঁদছে, কাঁদছে দেশের মানুষ, তাদের বলেই তো আপনারা বলীয়ান —ভদ্রমহোদয়রা কেন ভুলে যান।)

এর মধ্যেও তীব্র ব্যঙ্গ. হাস্যরস পরিবেশন করে গাইলেন—

ভাইয়ে ভাইয়ে ডান করে
পরে পায় আশ,
মতা মাইকী ডান লাগে
ঘরে বনবাস।
(স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে
গৃহ বনবাস।
ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা করে
শত্রু পায় আশ)

সেদিন আসামের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশের চিন্তা যখন জাতি-বিদ্বেষের কলুষ কালিমায় আচ্ছন্ন তখন আসামের গরীব চাষীর ঘরের সন্তান মাটির শিল্পী মঘাই ওজার ঢোলের কাঠিতে অসমীয়া সংস্কৃতির বিবেক গর্জে উঠলো।

যে হাতে হালের খুঁটি, সেই হাতে ঢোলের কাঠি

আসামের অপরাজেয় লোকশিল্পী মঘাই ওজা। বহু সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সমাবেশে আসামের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। আজ তাঁর বয়স ৪৫ পার হয়েছে। এই ৪৫টি বছর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে একটানা সংগ্রামে চিহ্নিত। কিন্তু তাঁর শিল্পী চেতনায় দুঃখ বা হতাশা দানা বাঁধতে পারেনি। চাষীর গর্বে তিনি ঢোলের বোলে বলেন, এক হাতে ঢোলের কাঠি, আর হাতে হালের খুঁটি। অন্ন

বয়সে বাবা মারা যান। তখন পাঠশালাতে হাতে-খড়ি হয়েছে মাত্র। কিন্তু মায়ের মুখে অন্ন জোগাবে কে? হাল বাইবার বয়স তখনও হয়নি। যে মাটি আছে তাতে পেট চলে না। কিশোর মথাই এর উপর পড়লো সংসারের দায়িত্ব। বাড়ির কাছে চেনিজান চা-বাগিচা। কিশোর মথাই গেল সেখানে যোগালীর কাজ নিয়ে। সেখানেই নিজের চেষ্টায় শিখলো মিস্ত্রীর কাজ। যেটুকু রোজগার হতো মাকে এনে দিত। ক্ষুধার পয়সা বাঁচিয়ে কিশোর মথাই কিনলো তার এক-মাত্র শখ—একটি বিহুর ঢোল। কাজের পর যেটুকু সময় পেত, বিহু ঢোলের বোলে ভরাট হয়ে থাকতো। আশেপাশে উদীয়মান ঢুলী হিসাবে তার নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ছোট ছোট বিয়ের আসরেও ডাক পড়লো। দু-চার টাকা উপরি আয় হতে লাগলো। একবারে মাজুলীতে এক বড় বিয়ের বাড়িতে একসঙ্গে মিলে গেল ২০ টাকা। সে সময় সেটাই মথাই এর জীবনে বড় রোজগার। এই করে টাকা জমিয়ে গরু হাল কিনে ফেললো। কিছুদিন পর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। শক্ত করে ধরলো হালের খুঁটি, সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত রেওয়াজে চললো ঢোলের কাঠি।

বরুয়া হলেন ওজা—ঢোলের যাদুকর

তার পারিবারিক উপাধি বরুয়া। কিন্তু জনসাধারণ তাকে ডাকতে লাগল 'ওজা' —অর্থাৎ ওস্তাদ বলে। তার নাম ডাক ছড়িয়ে পড়লো।

গণনাট্যের সংগঠক হিসাবে আসামে ঘুরে বেড়াতাম শিল্পীর সন্ধানে। প্রায় ২০ বছর পূর্বে জোড়হাটে মিলিত শিল্পী সমাজ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রথম আবিষ্কার করলাম এই লোকপ্রতিভাকে। অসমীয়া সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আদি-মাতা বিহু। অথচ কিছুদিন আগে শিক্ষিত সমাজে এর উপর ছিল অবজ্ঞা, এমনকি নিষেধাজ্ঞা। ইংরাজী বিশের দশকের গণ-আন্দোলনের পর থেকে বিহু তার আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে থাকে কিন্তু গীতের ধারাটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও নৃত্য ও বাদ্যের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা সেভাবে হয়নি। তার ছন্দ ও সুষমা যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ যেন মথাই ওজার ঢোলে শতাব্দীর হারিয়ে যাওয়া এই লোকসংস্কৃতিটি মুখর হয়ে উঠল। এর আগে আসামের বিহুর ঢুলীদের তিন-চারটি বোলে যাকে বলে 'নাচনী-চাপর' বারে বারে বিভিন্ন লয়ে বাজাতে দেখা যেত। মথাই সেখানে আনলেন বোলবাণীর ও ছন্দের অপরূপ বৈচিত্র্য। ঐন্দ্রজালিক যুগের fertility cult থেকেই বিহু নাচের উৎপত্তি। মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাত, তারপরে ফসলির দোলা ফসল কাটা নবান্ন—সবই প্রতীক অঙ্গ সঞ্চালনে

অভিব্যক্ত বিহুনৃত্যে। মঘাই ওজার ঢোলে মেঘ ডাকে, বজ্র ফেটে পড়ে। ঝড় আসে, আবার টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে। মঘাই ওজা প্রকৃতির অনুকৃতিতে নিজে অভিনব বোলবাণী সৃষ্টি করেছেন। আসামের সনাতন ঐতিহ্য তাঁতশালে কাপড় বোনা, সুতা কাটা, তুলা ধোনা ইত্যাদি। সেই ছন্দে তিনি যখন ঢোলের সাথে ছড়া কাটেন :

কঁপাহ ধুনু ধুনু বেটী
কঁপাহ ধুনু ধুনু
নেওথনিতে ধুনু বেটী
নেওথনিতে ধুনু।

তখন যেন চোখের উপর ভাসে সেই চিত্র। লৌকিক ছড়া ও লৌকিক উপকথাকে তিনি ঢোলের বোলে প্রাণবন্ত করে তোলেন। আসামের অতি পরিচিত মেঠো পাখী 'বতাচরাই' প্রান্তরে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। তিন মাত্রা ও চার মাত্রার টানাপোড়েনে বাদ্যকর মঘাই ওজা চিত্রকর হয়ে দেখা দেন আমাদের সামনে।

উড়িৎ তৌ তৌ উড়িৎ তৌ তৌ
উড়িলৌ উড়িলৌ উড়িলৌ
উড়ি···(৩) উড়ি যাওঁ·· (৩)

তিগ্রীৎ তৌ তৌ, তিগ্রীৎ তৌ তৌ—তারপর ঘ্রীৎ ঘিটি টিটি ঘিৎ ঘি তৌ বলে রেলা মেরে দিগন্তে উড়ন্ত পাখীর পিছনে ধাওয়া করেন। ভারতের সর্বত্র উপকথায় লোকছড়ায় ও গানে বৃষ্টির কামনায় শিয়ালের বিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে যেমন বলে :

রৌদ্র ওঠে বৃষ্টি পড়ে
শিয়াল মামা বিয়ে করে।

ঠিক তেমনই আসামেও খেঁকশিয়ালের বিয়ের গল্প আছে। কিন্তু মঘাই ওজার নিজের রচনায় ও ঢোলের ছন্দে এই গল্প রীতিমত নাট্যরসে ভরপুর হয়ে ওঠে :

চোতর মাহত ঢোলর হাত
বরষুণত পিছল বাট
মাজে মাজে রোদ চৌফুলীয়া ঐ
রোদ চৌফুলীয়া

খরা শিয়ালর বিয়া ঐ
খরা শিয়ালর বিয়া…

সে বিয়েতে অতিথি অভ্যাগতদের অপূর্ব বর্ণনা। তার মধ্যে আবার কর্মরত নেউল রাঁধুনী, বিড়াল গোয়ালী, কন্যার মামা কাঠবেড়ালী, বাজনদার ব্যাঙ ইত্যাদি। খেঁকশিয়ালের বিয়ের এই বিচিত্র সমাবেশ ও আয়োজন ঢোলের কসরতে মঘাই এর বর্ণনার ঢঙে শ্রোতাকে বিয়ের রঙ উল্লাসে মজিয়ে দেয়। তারই ক্লাইম্যাক্স আসে যখন শ্রোতারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন, যখন হাতীর পিঠে শিয়াল বর 'রভাতলীতে' অর্থাৎ বিয়ের মণ্ডপে এসে হাজির হয়। কন্যাপক্ষের সবাই আবিষ্কার করে শিয়াল বরের লেজটি কাটা।

মোখনা হাতীত উঠি শিয়াল
আহিল রঙ করি
দরা হৈছে ভেলেঙ ভেকু
লেজ নাইকিয়া ঐ
লেজ নাইকিয়া।

দূর দূরান্তের সীমান্তের ঢোল

মঘাইএর সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই গভীর ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হলো। গণনাট্যের সংগঠক হিসাবে লৌকিক প্রতিভা খুঁজে বেড়িয়েছি অনেক, মঘাইএর মতো কৃষকের গর্ব ও অভিমান নিয়ে এমন দুর্বার প্রাণবন্ত অথচ সহজ বুদ্ধিদীপ্ত মাটির শিল্পী আর পাইনি। তিনি হলেন আসাম গণনাট্যের সহ-সভাপতি। গণনাট্যের মধ্যে এসে তাঁর ধ্যানধারণা নতুন দিগ্বলয়ের সন্ধান পেলো। চিরাচরিত গান গাইতে গাইতে উত্তেজিত মুহূর্তে কখনও তিনি দেশের দুঃখ দারিদ্র্য অবিচারের বিরুদ্ধে মঞ্চেই স্বতঃস্ফূর্ত গান রচনা করে গান গাইতে শুরু করেন :

মাজুলী দেশতে খোয়ার অভাবতে
পেলায় পরিয়ালক কাটি ;
শিলং রোডতে দেখিবা রাইজসকল
মিনিস্টার সকলর মাটি।

(মাজুলী দেশের খবর আসে অন্নাভাবে নিজের স্ত্রীকে কেটে ফেলেছে, ওদিকে তাকিয়ে দেখ শিলং রোডে মিনিস্টারদের নতুন নতুন বাড়ি।)

বিদ্রূপ ও ব্যঞ্জনায় এ সুস্পষ্ট ও লক্ষ্যভেদী। যথার্থ শিল্পীরূপে সম্মান পেলেন তিনি সর্বত্র।

১৯৫৪ ইংরাজীতে কোলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গণনাট্যের প্রাদেশিক সম্মেলনে আসামের প্রতিনিধি হিসাবে ডঃ ভূপেন হাজারিকা ও মঘাই ওজাকে নিয়ে আসি। হাজারিকার কণ্ঠে ও মঘাই ওজার ঢোলে কোলকাতার হাজার হাজার জনতা আসামের এক নতুন পরিচয় পেলেন। বিখ্যাত সংগীতশাস্ত্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আমাকে বলেছিলেন, মঘাইএর ঢোলের বোল আমাদের শাস্ত্রীয় ব্যাকরণের বাইরে; মাটির ও মাঠের দুর্লভ জিনিস। তিনি এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে টেপরেকর্ড করে রেখেছিলেন।

তারপর গণনাট্যের সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান পাটনা, মাদ্রাজ, বোম্বে—সর্বত্র মঘাইএর ঢোলের জয়ডঙ্কা।

মোর কান্ধত ঢোলর বোজা

চিরদিনের হাসিখুশী মানুষটি চিরন্তন দারিদ্র্যের বোঝা বয়ে চলেছেন। কিন্তু তাঁর দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য নয়। বয়সে ভাঁটা দিয়েছে—আর কয়দিন বাজাবেন? কিন্তু কেউ আর তাঁর এই বিদ্যে শিখে নেবার জন্য উৎসাহী নন, এটাই তাঁর আসল দুঃখ। যে দিনকাল, ঢোলের সম্মান আর থাকবে না। যেটুকু টাকা উপার্জন করেন, ছেলে মেয়ে পরিবার নিয়ে পেট ভরে না। হাল বেয়ে যে ধান ঘরে ওঠে, তাতে তিন মাস কোনোমতে চলে। ঢোল বাজিয়ে সারা বছর যা রোজগার করেন তাতে পরিবারের ছেলেমেয়ের বস্ত্রের সংস্থান হয়তো হয়—কিন্তু ঘরের ফুটো ছাউনি ঢাকা যায় না। তাই মঘাই ওজা মাঝে মাঝে গান ধরেন—

মোর কান্ধত ঢোলর বোজা
মোক কয় মঘাই ওজা।

তবু মঘাই ওজার ঢোল যখন বেজে ওঠে—সেখানে হতাশা নেই, বিভ্রান্তি নেই, আছে লয়ে দ্রুত তরঙ্গে অমর গণজীবনের ঢেউ।

লোককবি : নিবারণ পণ্ডিত

'সতের মাস অজ্ঞাত বাসে থাকার পর পাকিস্তান সরকারের দশম হামলায় আমি ধরা পড়ি ও নোয়াখালীর কুখ্যাত গোলাম শারোয়ারের হাতে পড়ি। তারপর বন্ধু, জার্মান ও জাপানী ফ্যাসিস্টদের পৈশাচিক অত্যাচারের যে সকল নির্মম কাহিনী কাগজে পড়িতাম, বাস্তবক্ষেত্রে তাহার সম্মুখীন হইলাম এবং মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হইলাম। সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেহের উপর বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার চলিল। কখনো জ্ঞান ছিল, কখনো ছিল না। অবশেষে একটি ছোট্ট কুঠরীতে রেলিং-এর সাথে হাত পা বাঁধিয়া মাংসপিণ্ডের মত ফেলিয়া রাখা হইল।···

আমার পাশেই আমারই মত অবস্থায় আমার পরিচিত দুইজন বন্ধু যাতনায় গোঁ গোঁ করিতেছেন। অপর একজন ভাগ্যবান চোর ঐ কুঠরীতে বসিয়া পরম আনন্দে বিড়ি টানিতেছে।···দারোগা ঐ লোকটিকে আমার উপর পীড়ন করিতে হুকুম দিলেন। চোরটি রাজী হইল না। তাহাকে মুক্তির প্রলোভন দেখান হইল তবুও সে রাজী হইল না। তৎপর চোরটিকে পীড়নের ভয় দেখাইয়া আমার উপর লেলাইয়া দেওয়া হইল। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল সহ্য করিয়াছি, তারপর আর মনে নাই। রাত্রি ১টায় জ্ঞান হইল। জ্বর আসিয়াছে। ভীষণ শীত। বস্ত্র ইতিপূর্বেই কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছিল। মাঘ মাসের শীতের রাত্রি ঐভাবে বিবস্ত্র অবস্থায় কাটিল— ।'

জামীনে মুক্ত অবস্থায় একজন মুসলমান বন্ধুর সাহায্যে পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে এসে আলিপুরদুয়ারে থাকাকালীন নিবারণবাবু এক চিঠি লেখেন আমাকে। চিঠি পেয়ে ভাবলাম গণ-সংগ্রামের আগুনে কীভাবে আজ বাংলার বাউলের হাতে উদাসী একতারা হয়ে উঠেছে অগ্নিবীণা। চন্দ্রাবতী, দ্বিজ ঈশান, নয়ানচাঁদ, ফকির বৈজু থেকে সুরু করে জালালউদ্দীন, দীন শরৎ-এর ময়মনসিংহের লোক সাহিত্যের ভরা গাঙকে নতুন গণ সাগর সঙ্গমের পথে বাঁক ফিরালেন নিবারণ পণ্ডিত। সহজ, সরল স্বল্পভাষী মানুষটি। শহুরে কবির আত্মকেন্দ্রিকতার লেশটুকুও নেই; কিংবা গ্রাম্য গুরু, সাঁইপীর মুরশিদের সংসার বিমুখী ভাবালুতার আবেশও নেই। জঙ্গী জনতার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দিয়েছেন

তিনি। তাইতো এ যুগের জনসাধারণের সহজ কবি জহ্লাদী জুলুমের মুখে সবল সহিষ্ণুতায় হয়ে ওঠেন অসাধারণ।

৩৯ বৎসর পূর্বে কিশোরগঞ্জ শহর থেকে দেড় মাইল দূরে সগরা গ্রামে এক গরীব কৃষক পরিবারে নিবারণ পণ্ডিতের জন্ম। তার বাবা কৃষক হলেও তিনি সেই ভাগ্যবানদের একজন যারা নিরক্ষরতার পাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রাম্য পাঠশালার মাষ্টার। গ্রামের সবাই তাকে তাই ডাকতো পণ্ডিত বলে। সেই থেকে পরিবারের উপাধিই পণ্ডিত বলে চলতে থাকে। পুত্র পিতার চেয়েও ভাগ্যবান। পাঠশালার সীমানা ডিঙ্গিয়ে শহরের স্কুলে ২। ৩ বৎসর ইংরেজী অক্ষরের সঙ্গেও কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটে। কিন্তু পুত্রগরবী বিদ্যানুরাগী পিতা দুটি বড় মেয়ে এবং কিশোর নিবারণ ও তাদের মাকে রেখে অকালে পরলোক গমন করেন। ১১ বৎসরের ছেলে নিবারণের উপর পড়লো সংসার প্রতিপালনের বিরাট দায়িত্ব। জমিজমা যা সামান্য ছিল বর্গা দেওয়া হলো। বিদ্বান হবার রঙীন স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে স্কুলের খেলার সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিল কিশোর নিবারণ। পুঁথিপত্র বিক্রী করে যে দু'চার টাকা মিললো তা নিয়ে বিড়ির পাতা খরিদ করে বিড়ি তৈরীর ব্যাবসা নিলেন। কিশোরগঞ্জ কোর্টের বটগাছের নীচে বসে সারা দিন বিড়ি বানাতেন—দিনের শেষে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু বিড়ির মহাজনের শয়তানীতে তাকে কারবার গোটাতে হলো। একদিকে দারিদ্র্যের জ্বালা, অন্যদিকে মহাজনের বদমায়েসী—এই অভিজ্ঞতায় মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে নিবারণ বাবু গান রচনা করেন। ভগবানের কাছে অভিযোগ এবং ঠগ মহাজনের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষই ছিল তার বিষয়বস্তু। আমাদের দেশে গণ আন্দোলন যখন অপরিণত, শ্রেণী সংগ্রাম অসংগঠিত, তখন আমাদের গ্রাম্য কবিরা জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণ, প্রবলের পীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষপূর্ণ রূপক ছড়া বা গান লিখে জনগণের মনের বিক্ষোভকে ভাষা দিয়ে থাকেন। লৌকিক কাব্যে তার অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। নিবারণ বাবু সেই ধারাকেই অবলম্বন করলেন মনের জ্বালা জুড়াতে। বলতে গেলে এ থেকেই তার কবিতার স্ফুরণ। পূর্ববঙ্গে মহোৎসবে বা পূজার প্রসাদভোজে প্রেমধ্বনি বলে এক ধরনের ছড়া কাটার রীতি প্রচলিত আছে। একবার এক গ্রামে নিবারণবাবু তেমন এক প্রসাদভোজ খেতে যান। সেই গ্রামে সমাজপতিরা অন্যায়ভাবে এক-জনকে গুরুতর শাস্তি দেন। সেই ঘটনার উপর তিনি তখনই ছড়া কাটেন :

বাজিতপুরে হুক্কা খৈয়া, টানছে বৈসা শ্রীবৃন্দাবন
কল্কীর আগুন ডিলহী মাইর‍্যা
বসগ্রাম গেল পুইড়্যা
দেখগো দিশ করিয়া, হরিয়ার পাপে, চিড়িয়ার মরণ ॥
বলিহে···প্রেমসে···ইত্যাদি ॥

সাধারণ গরীব চাষীর মতো জীবিকা আহরণের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দুঃখ ও দারিদ্র্যে তার দিন কাটতে লাগল। কিন্তু আমাদের দেশের মেহনতী জনতা ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করে না। কূলভাঙা নদীর পারে বাসা বাঁধে, গান গায়। প্রতি বৎসর ঘর ভেসে যায়। আবার ঘর বাঁধে। আবার গান গায়। পৌষ মাসের ছেঁড়া কাথার ওম শীতের রাতের ঘুমকে ধরে রাখতে পারে না। আবার ফাগুনের শুক্লপক্ষে সারারাত হোলী গানে ঢোলক বাজনা আর করতালের ধুমে গাঁয়ের ঘুম ছুটে পালায়। আসর করে দুই দলে গানের লড়াই চলে। প্রত্যেক দলে থাকেন এক দুইজন নাম রচয়িতা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের জবাব দিয়ে গান বাঁধতে হয়। অনেক সময় কাব্যের মধুরস আড়াআড়ির তাতে শুকিয়ে গিয়ে গালাগালির হুল ফুটাফুটিও চলে। নিবারণবাবু তাঁর অঞ্চলের দলের রচয়িতা। শিশু রচয়িতা হলেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। শ্যাম দারা ধরে হয়ত গান ধরলেন :

হইল কিবা শোভা ঋতুরাজ আগমনে
ফুটিল বাগানে ফুল, গুঞ্জরিছে অলিকুল
বিরহী হইল আকুল, কোকিলের কুহুতানে।
ডালে বসে শুকসারী, হেরিতেছে রংমাধুরী
এস গো রাইকিশোরী, রঙ্গ করি আজ রঙ্গের দিনে ॥

কিংবা রাই দারা ধরে আবার গাইলেন :

কতনা কহিলাম তারে রঙ দিতে মানা
রাস্তা দাও চলিয়া যাইগো ও কেলে সোনা,
গিয়াছে বেলা, তাহে একেলা অবেলা আর
রঙ খেলা ভাল লাগে না।

বাউল গানেও তেমনি লড়াই হতো। নিবারণবাবু কৃত্তিদের সঙ্গেই অনেকবার জয়লাভ করেন।

কিন্তু গ্রাম্য কবিরা জনসাধারণের মধ্যে থাকেন বলেই গণজীবনে নতুন কোনো

দুর্বিপাক এলে অত্যন্ত সহজেই তাতে সাড়া দেন। যদিও প্রায়ই তাতে থাকে ভগবানের কাছে নালিশ ও প্রতিকারের আবেদন। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে এবং অন্যদিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় জাতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা করাল রূপ ধারণ করল। সেই সময় ঢাকার দাঙ্গায় বিহ্বল হয়ে নিবারণবাবু কয়েকটি গান লিখেন বাউল সুরে।

হরি তোমার অপার লীলা বুঝা হল ভার
শুনেছি ঢাকার সরে, মানুষে মানুষ মারে
ঘর পোড়ায় দিনদুপুরে, করে নানা অত্যাচার
যে যাহারে যেথা পায়, ছুরিকাঘাত করে গায়
পিছন থেকে মারে মাথায়, নাই তার কোন প্রতিকার।

১৯৩৫-৩৬ সন। দুনিয়া জোড়া ধনিকতন্ত্রী দেশগুলিতে চরম আর্থিক সঙ্কট। ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়। সাম্রাজ্যের নাগপাশে বাঁধা ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কৃষি সমাজের বিপর্যয়। অন্যদিকে সোবিয়েতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অভূতপূর্ব সাফল্য। স্পেনে ও চীনে মুক্তি ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ভারতে আনে গণ-আন্দোলনের জোয়ার। কংগ্রেসের আপোসকামী নেতৃত্বের নির্দেশিত ধারাকে এ আন্দোলনের স্রোত অস্বীকার করে, জনতা লালঝাণ্ডার নীচে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো। '৩৬ ইংরেজীতে সারা ভারত কৃষক সভার পত্তন হয়। সেই সময় ময়মনসিংহে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বর্গা আন্দোলন খুব ব্যাপক আকার ধারণ করে। নিবারণবাবু সেই আন্দোলনে কৃষক সমিতির একজন অগ্রণী কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। সংঘবদ্ধতাই যে শোষিতের একমাত্র হাতিয়ার, কৃষকদের জয়লাভের মধ্য দিয়ে নিবারণবাবু তা অনুভব করেন। তাঁর কবি-দৃষ্টির সামনে খুলে যায় এক নতুন দিগন্তরাল। তাঁর গানের ধারা সম্পূর্ণ ভাবে বদলে গেল। তার গান এখন হলো কৃষক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

তারপর আসে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ভারতের শান্তিপ্রিয় জনতাকে তার মতের বিরুদ্ধে বৃটিশ শাসক যুদ্ধের রথচক্রে বেঁধে দিল! আসলো পঞ্চাশের মন্বন্তর, মহামারী। অন্যদিকে জাপানী সমরবাদীরা আসরে অবতীর্ণ হলো। আসামে, চট্টগ্রামে বোমা পড়তে লাগলো। নিবারণবাবু লিখলেন :

ওরে আসাম মণিপুরে
দিবারাত্র ঘর্ঘর শব্দ ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান উড়ে।
চতুষ্পার্শে আছে যারা, মৃতপ্রায় হইয়াছে তারা

সদায় এই চিন্তাধারা, কখন বোমা পড়ে॥
দরদী কেউ নাইগো তাদের ডেকে জিজ্ঞাস করে
আপন বুচকা বান্দে সবাই আপন আপন চিন্তা করে॥

মিলিটারী কনট্রাক্টে, মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে রাতারাতি একদল লোক স্ফীত হয়ে উঠলো। কারেন্সী কুম্ভীরেরা সৃষ্টি করলো কালাবাজার নামে এক পাতালপুরী। তারই সুড়ঙ্গ পথে বাংলার ঘর, সংসার, মাতৃত্ব, সতীত্ব, মান ইজ্জৎ তলিয়ে গেল। কিন্তু অন্যদিকে হিটলারের বিরুদ্ধে ষ্টালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার দুর্দমনীয় প্রতিরোধ ভারতের জনসাধারণের কাছে নিয়ে এলো মুক্তি আন্দোলনের এক নব চেতনা। ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতার মধ্যেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নিশানা—নিবারণবাবু তা উপলব্ধি করেন। সেই সময় 'পটের সুরে' তিনি যে সুদীর্ঘ জাপবিরোধী ছড়া লেখেন, এই গানেই তিনি সারা বাংলায় খ্যাত হয়ে পড়েন। তখনকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' কাগজে তা প্রকাশিত হয়। তাঁর দল নিয়ে নিবারণবাবু গ্রামে গ্রামে গেয়ে গেয়ে এই গানের বই—প্রায় ১০ হাজার কপি নিজেই বিক্রী করেন।

শুনেন ভাই বলে মাই শুনেন দিয়া মন
জাপানী যুদ্ধের কথা করিতেছি বর্ণন—
দস্যু এলো দেশে ;
দস্যু এলে দেশে, মারবে পিষে লুটে নেবে ধন
থাকবে না আর মান ইজ্জৎ ভাই হারাব জীবন।
উপায় না করিলে—
উপায় না করিলে বোমা ফেলে কিংবা গুলি দিয়া
মারবে তারা মরব মোরা নিরস্ত্র হইয়া
যেমন সিঙ্গাপুরে……ইত্যাদি

আগস্ট আন্দোলনে বৃটিশ শাসকদের বর্বর নিপীড়ন, কংগ্রেসী নেতৃত্বের ভ্রান্ত আত্মঘাতী নীতির পরিণামে জাতীয় আন্দোলনের নিষ্ফলতা থেকে ভারতে যে সর্বনাশী জাপপ্রীতি দেখা দিয়েছিল—যেসব বামপন্থীরা ও বুদ্ধিজীবীরা তোজো-হিটলার বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাদের তীব্র কষাঘাত করলেন গানে :

হচ্ছে কানা ঘুষা, এক দুরাশা শুনি কারও মুখে
জাপানীরা ভারতবাসী রাখবে বড় সুখে—।
দিবে স্বাধীন করে—

দিবে স্বাধীন করে, ভারতেরে জাপান উপকারী
জনপ্রতি আনিয়া দিবে সুন্দর সুন্দর নারী !
দিবে মটর গাড়ী, বাড়ী বাড়ী জিনিষ সস্তা দামে
স্বরাজ ভরিয়া রাখবে গুদামে গুদামে
যখন যে চাহিবে—
যখন যে চাহিবে তারে করবে অকাতরে দান
স্বরাজদাতা ভারত বন্ধু আসতেছে জাপান।
আবার কেহ বলে—
আবার কেহ বলে জাপান এলে মন্দ হইত না
পুরাতন প্রভুতে আর রুচি ধরে না
নব্য নূতনেতে—
নব্য নূতনেতে দেখতে শুনতে রুচি ধরে ভাল
পুরাতন প্রভুটি তবু বদল ত হইল
হয়ে জাপান জাতি—
হয়ে জাপান জাতি, জাপ সুখ্যাতি চৌদিকে ছড়ায়
এমন বহু বাবুলোক আছেন এই বাংলায় !......

তারপর জাপানকে রুখবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান দিয়ে লেখেন :

আসুন মিলে সবে সমভাবে মুক্তির কারণ
মুষ্টিবদ্ধ ওহে দাঁড়াই জীবন করি পণ
আসুন মুক্তি পেতে পারি যাতে যুক্তি করে যাই
চীনের আদর্শ নিয়ে রুখিয়া দাঁড়াই
নইলে রক্ষা নাই। ইত্যাদি···

তারপর বাংলার শ্যামল বুকে জলে উঠলো শ্মশানের চিতা—প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মরল দুর্ভিক্ষে। লোক কবির দরদী অন্তর আর্তনাদ করে উঠলো। অসংখ্য গান লিখলেন ও রিলিফের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সেদিন তার গান মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করেছে—দুর্ভিক্ষকে রুখার জন্য সংঘবদ্ধ করেছে—

গ্রামের মানুষ ধ্বংসের বন্যায় ভাসিয়া চলেছে হায়
কে বাঁচাবে তোরা, কে বাঁচাবে, ওরে আয়, ওরে আয়
উঠানে উঠানে শ্মশান কবর
মানুষে মানুষে নাইরে খবর

কার বা বাড়ী কার বা ঘর
শিবা ডাকে আঙ্গিনায়
ওরে তোরা আয়, আয় ।।

বিদেশী দুঃশাসনে দেশের বস্ত্র কেড়ে নিল—আহার জোটে না ইজ্জত ঢাকা যায় না। কবি লিখলেন :

বংগ নারী হইল বিবসনা
......তারা দিবসেতে ঘর হইতে বের হইতে আর পারেনা
কলসী কাঁখে অপরাহ্নে
যায় না রে জলের জন্যে
জলের ঘাটে গ্রাম্য ললনা—
তারা আঁধার হলে যায়রে জলে দিনের আলোয় আর আসেনা।
হইল বিবসনা
গ্রামের দুঃস্থ পুরুষনারী যারা ভিক্ষা করে বাড়ী বাড়ী
ভিক্ষা ছাড়া যাদের দিন চলেনা
তারা লোক সমাজে মুখ দেখাতে লেংটা হ'য়ে আর পারেনা
হইল বিবসনা
বঙ্গনারী হইল বিবসনা ॥—ইত্যাদি

বহু কষ্টে একমুঠো ভাত যদিও মেলে ত' নুন জোটে না। ঘরের গিন্নি মাঞ্জুর মা অবোধ মেয়ে। কনট্রোলের কেরামতি কিছুই বুঝে না। তার বুঝি কাঁদুনী আর থামে না। তীক্ষ্ণ শ্লেষে নিবারণবাবু লিখলেন মেয়েদের সুরে :

আমার মাঞ্জুর মায়ে ত কনট্রোল বুঝে না।
রান্‌তে গেলে কান্‌তে বসে লবন ছাড়া রান্‌ধে না
(আহারে) কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম
কত বাবুর পায়ে ধরলাম
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে
ও আহারে—আমার ভাঙ্গা ঘরে নেড়ার ছানি
মেঘ না হইতে পড়ে পানি
টেপ টেপানি গেল নারে
আমার টেপ টেপানি গেল না॥

দুর্ভিক্ষের হাত ধরে এলো দুর্নীতি। কনট্রোল ব্যবস্থার দৌলতে গ্রামের

জমিদার, জোতদার, ঠিকাদার, কনট্রাক্টর ও তাদের পোষ্যরা মিলে চোরাবাজারে হঠাৎ ফেঁপে ওঠা একদল নব্য বাবুর জন্ম হয়। নিবারণ তাদের মারেন তীব্র চাবুক :

বাবুদের নব্য বাবুয়ানা গো
বাবুদের নব্য বাবুয়ানা,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় গরম জল্
আর উইলস মার্কা চুরট টানা ॥
পাইয়া কন্‌ট্রোলের বাজার
কত হবু হইল অফিসার
কত গবুর হইল পাওয়ার
দেখি ভাব নমুনা,
চাল চলন দেখিলে বাবুর চিনতে কষ্ট হয় না
হাতে ঘড়ি চশমা পরা ত্রিশ টাকা মাইনা ॥
নব্য সভ্য বাবুদেরে দেখতে পাবেন চায়ের ঘরে
ইংরেজীতে আলাপ করে বাংলা আর বলেনা
দু এক কৌটা চুরট ছাড়া তাদের দিন চলেনা
দৈনিক বিশ কাপ চা না হ'লে সেই বাবুদের মেজাজ হয়না
হইলে মাস কাবার হিসাব দেখায় চা দোকানদার
বাবু বলেন কত তোমার হয়েছে পাওনা—
গত মাসের চিনির বস্তার দাম দিতে হবেনা
দেনা পাওনা নাই আর কারও চুরট খাওয়াও
আর এক খানা ॥

আমাদের ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের মধ্যে যদিও একটা নতুন গণসংস্কৃতি আন্দোলন সারা বাংলা তথা ভারতে জন্ম নিল তবু তার রাজনীতি ছিল abstract। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনকে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের সাথে যথাযথভাবে যুক্ত করতে পারিনি, এজন্য দুর্ভিক্ষ"প্রতিরোধ মানব সেবার আবেদনের উপর উঠতে পারে নি।

১৯৪৩ ইংতে বোম্বাইতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস উপলক্ষে ভারতের গণসংস্কৃতিবিদদের এক সমাবেশ ও অনুষ্ঠান হয়, নিবারণ বাবু তাতে যোগ দেন। ঐ একই বছরে কোলকাতায় নিখিল বঙ্গ ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও

শিল্পী সম্মেলন হয়—আমাদের নব সংস্কৃতি আন্দোলনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আমাদের সংস্কৃতি আন্দোলন দুটি পৃথক ধারায় বহমান। একটি শহরের—আরেকটি লৌকিক। যে বুদ্ধিজীবী শহুরে ধারাটি নতুন জীবনবাদের তাগিদে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ গড়ে তুলেছিল ১৯৩৬ ইংরাজীতে, তাদের সামনে ঐতিহাসিক দায়িত্ব ছিল দেশের গণ-আন্দোলন ও লোক সংস্কৃতির গভীরে নিমগ্ন হয়ে তাদের ধারাকে লোকায়িত, জনপ্রিয় ও রূপান্তরিত করা। অন্যদিকে সামন্তবাদী ভাবধারায় আচ্ছন্ন লৌকিক সংস্কৃতির পুরাতন খাতে শ্রেণীসংগ্রামের জোয়ারে যে নতুন জীবনবাদী ঢল নেমে এল—সেই বৈপ্লবিক বাস্তবকে রূপায়িত করতে লৌকিক সংস্কৃতির শহুরে সংস্কৃতির সান্নিধ্যের ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজন। সেদিন সংস্কৃতি কর্মীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন না থাকলেও ফ্যাসি-বিরোধী ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রামের মঞ্চে আমরা এই পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলাম। সিলেট, রংপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলা থেকে বাংলার নিজস্ব লোক-সংস্কৃতির সম্পদ বহন করে প্রতিনিধিরা আসেন। নিবারণ বাবু আসেন ময়মনসিংহ থেকে। কোলকাতার বিদগ্ধ শিল্পীদের সঙ্গে তাদের পরিচয় শুধু মৌখিক নয় নিজেদের শিল্পধারার মাধ্যমে সে মিলন ঘটে। সে সময় তদানীন্তন 'পরিচয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণ সান্যাল নিবারণ বাবুকে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' একখানা উপহার দেন। নিবারণবাবু তার আগে রবীন্দ্রনাথের নাম জানলেও তাঁর কোনো কবিতা পাঠ করেননি। রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়। সেদিনের নব সংস্কৃতি আন্দোলনের ঢেউ-এ কোলকাতার বিদগ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেকেই পল্লী বাংলাকে জানবার, বুঝবার এবং শিল্পে প্রবাহিত করার চেতনা ও প্রেরণা নিয়ে গণমুখী হতে শুরু করেছিলেন। আমাদের আন্দোলনের এই প্রবাহ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বালুচরে শুকিয়ে গেল। কিন্তু তবু সামান্য সংযোগেই কী ফসল ফলতে পারে তার দৃষ্টান্ত নিবারণ পণ্ডিত! তখন গণনাট্যের বিখ্যাত অভিনেতা শম্ভু মিত্র কয়েকদিনের জন্য ময়মনসিংহে যান। তার মুখে রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি শুনে সর্বপ্রথম নিবারণ বাবু রবীন্দ্র-কাব্যের প্রাণ ফোয়ারার সন্ধান পান। নিবারণবাবুর সহজ কবিপ্রাণ রবীন্দ্র প্রতিভার সহস্র ধারায় অভিভূত হয়ে পড়লো। সেই রাত্রে আর চোখে ঘুম নেই। সারারাত বসে বসে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথের ভাঙা পয়ারের ছন্দে এক কবিতা লেখেন। এতে দেখি

পল্লী কবির গুণগত পরিবর্তন। পল্লী কাব্যের টেকনিক বদলে গিয়ে আধুনিক কবিতায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অথচ আধুনিক কবিদের উদ্ভট রূপক, দুর্বোধ্য প্রতীক, কষ্ট কল্পনা তাতে নেই। তিনি লিখলেন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে :

আজি এই পুণ্যদিনে
গাঁয়ের কিষাণ
কি গাহিব গান
নাই ভাষা
দৈন্য হতাশায় মন ম্রিয়মাণ—

হয়ত বা কেহ কেহ বসি নিজ
চৌতালার প'রে
গর্ব্ব করে
শিখিয়াছি রবীন্দ্রের গীতি
গাহি নিতি
বেহাগ খাম্বাজ ভৈরবী
নানাবিধ সুরে।

হয়ত দু'একটি পল্লীর গান
কাক ডাকা সুরে
আমিও দিয়াছি টান
সে সুর বে-সুর বাজে
পৌঁছে নাই সবার অন্তরে।

ভেঙে গেছে মানুষের মন
ভেঙে গেছে কুঁড়ে ঘর
কামার ছেড়েছে গ্রাম
গুটায়ে হাপর।

জেলে কাঁদে জাল নাই
তাঁতি বসে গুটাইয়া তাঁত

এদের কান্নার সুরে
কে বা করে কর্ণপাত।

অজ্ঞতার অন্ধকারে আছি
কোটি কোটি পুরুষ রমণী
কেউ দেয় নাই জানি
তব বাণী দীপ শিখাখানি
এদের সম্মুখে আনি।

হে কবি—
তোমার সোনার মাঠে
কে কাটিবে ধান
কে গাহিবে গান
কেউ রুগ্ন শুয়ে আছে
কেউ গ্রাম ছেড়ে গেছে
কেউ ত্যাজিয়াছে প্রাণ
তোমার মাঠের রাজা
মরেছে কিষাণ।

হঠাৎ তোমার ডাক
কোন ফাঁকে পশিয়াছে কানে
"ভয় নাই ওরে ভয় নাই...
নিঃশেসে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"
তাই দলে দলে
যারা বেঁচে আছে তারা চলে।

তারা দল বেঁধে আসে
দল বেঁধে যায়
দল বেঁধে হাসে
দল বেঁধে গায়

ভাঙা পরিবার
আবার গড়িতে চায়।
এদের অস্পষ্ট বুলি
কেউ বোঝে কেউ বোঝে না
কেউ শুনে কেউ শুনে না
গাঁয়ের বারতা
এদের প্রাণের কথা
তবু বারে বারে
ওরা বলে মানুষেরে
ঘুচাও মোদের ব্যথা
ওগো দাও অধিকার
মানুষের মত বেঁচে থাকিবার ॥

সে সময় এই কবিতাটি 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়। এর পরেও তিনি এই ধরনের কবিতা আরো দশ বারোটি লেখেন। কিন্তু কোনদিক থেকেই বিশেষ কোনো উৎসাহ পান নি! একদিকে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের দুর্বলতা ও লৌকিক দৃষ্টির অভাব অন্যদিকে গণ আন্দোলনের বেশির ভাগ নেতাদের সংস্কৃতি আন্দোলন সম্বন্ধে নিদারুণ নিস্পৃহতা ও অজ্ঞতা। একজন কৃষক নেতা সে-সময় নিবারণ বাবুকে ঠাট্টা করে বলেন: ওকি হে, তুমি নাকি আজকাল কোলকাতার কবিদের আসরে ভিড়তে চেষ্টা করছ? বলা বাহুল্য নিবারণবাবু তারপর থেকে এই ধরনের কবিতা লেখার প্রচেষ্টা ছেড়ে দেন। তাঁর লেখা কবিতাগুলিরও কোনো সন্ধান মেলে না আজকাল।

পঁয়তাল্লিশ ইংরেজীতে ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনে নিবারণবাবুর সাথে আবার দেখা হলো। পদ্মকে যেমন দেখতে হয় দীঘির জলে লোককবিকে তেমনি চিনতে হয় জনতার মাঝখানে। কোলকাতার বিদগ্ধ সাহিত্যিক সমাবেশে এই নীরব নম্র মানুষটি অনেককেই হতাশ করেছিল। তা ছাড়া সুগায়ক বলতে যা বোঝায় নিবারণবাবু তা নন। কিন্তু নেত্রকোণায় পেশীবহুল আদুল গায়ে কোমরে গামছা বাঁধা লুঙ্গী পরা মুসলমান কৃষকদের জারী নাচের দলের মাঝখানে যখন তাদের কবিকে দেখলাম সেদিন চিনলাম গণমনের যাদুকর কে!

পঁচিশ-ত্রিশ জনের জারী নাচের দল নেচে নেচে গাইছলো নিবারণবাবুর জারী গান—

কপালের দুঃখ ঘুচাব কত দিনে রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে
হায় হায়রে বুঝলাম না বুঝলাম না ভাইরে ঘরে রইলাম বইয়া
চৈতন্ত হইল শেষে সংকটে পড়িয়া
অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া রোগে অনাহারে
মরছে যখন মা বোন শিশু হাজারে হাজারে রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণেরে।
হায় হায়রে সংকটে পড়িয়া তখন হিন্দু মুস্লাম যত
গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু হইল মিলিত
খাদ্য দাও বলিয়া দেশে চললো আন্দোলন
দরখাস্ত পড়িল কত গভর্ণমেণ্ট সদন
সস্তা দরে গরীবদের জিনিষপত্র দাও
অন্ন বস্ত্র কুইনাইন দিয়া গরীবেরে বাঁচাও রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে তারপরে চাপে পড়ে বুদ্ধিমান সরকার
মিটাইতেছি দাবী কিঞ্চিৎ করিল স্বীকার
ঘুষখোর আর চোরাদের সামিলে রাখিয়া
ছালার মুখ বান্ধিয়া ঢালে উভুত করিয়া
(হলো) 'দেড় ছটাক' কণ্ট্রোলের দোকায় গরীব বাঁচিবার
শাহীদার হইল যত প্রেসিডেণ্ট মেম্বার রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে মুখ চিনিয়া বিলি হইল কণ্ট্রোলের কুইনাইন
ট্যাক্স নাই যার কার্ড পাইব না শাহীদারের আইন
রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উষার
কেউ পায়না ছিড়া তেনা কেউ করে বাহার রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।

একলক্ষ কিষাণের বিরাট জমায়েতের সামনে সভাপতির মঞ্চ থেকে নিবারণ

বাবুর গান ময়মনসিংহের বিখ্যাত পল্লীগায়ক অখিল চক্রবর্তীর অনুপম কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো···

একসাথে চল গড়ব মোরা রাঙা দুনিয়া
সবে মিলে থাকব সেথা বিভেদ ভুলিয়া—বিভেদ ভুলিয়া
একসাথে চল গড়ব মোরা রাঙা দুনিয়া ॥
... ...
নূতন সমাজ গড়ব মোরা দুঃখ করব দূর
হাটে মাঠে তুলব রে ভাই আনন্দেরি সুর
আলো করব আঁধার রাতি
ঘরে ঘরে জ্বালব বাতি
গাইব নব গান
দুঃখ করব অবসান
নতুন সমাজ গড়বে কে রে আয়রে ছুটিয়া, আয়রে ছুটিয়া ॥

নতুন সমাজ গড়বার সংকল্প ও শপথ লক্ষ লোকের প্রাণে সঞ্চারিত হলো।

ইতিমধ্যে একদিকে কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা ও অন্যদিকে নিবারণ বাবুর নেতৃত্বে নব-লোকসংস্কৃতির আন্দোলনের প্রভাবে ময়মনসিংহের বহু পেশাদারী লোকশিল্পীর ভিতরে এক নূতন জীবনবোধ জাগ্রত হলো। নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলনে এরকম বহু লোকশিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল। ঐতিহাসিক কৃষক মিছিলের সঙ্গে দোতারা, একতারা নিয়ে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন বাউলও গান গাইতে গাইতে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের অগ্রণী ছিলেন রসিদউদ্দীন, জমানউদ্দীন ও মজিদ। জমানউদ্দীন যখন গান ধরলেন—

আমার দুঃখের অন্ত নাই দুঃখ কার কাছে জানাই
আমার সুখের স্বপন ভাঙলোরে চোরাই বাজারে ॥

মিঞা হোসেন মুন্সী গান ধরলেন—

দেশে কোন দেশের হাওয়া এলো গো
দেশে কোন দেশের হাওয়া এলো
লবণ কেরোসিন চিনি, কণ্ট্রোলে হয় বিকিকিনি
এই কথাডা সবাই জানি, অনেক লোকেই কইলো
ধনী মানী গুণী কয়জন, একমিলে চলিল।

কাঙালের নাম খাতায় জমা, চিনির মজাড়া তারাই মারল,
দেশের হাওয়া এলো গো,
দেশে কোন দেশের হাওয়া এলো ॥

সহস্র সহস্র কৃষকের প্রাণে সেদিন দেখেছিলাম তার কী প্রতিধ্বনি। আমরা গণনাট্যের মধ্যবিত্ত গায়করাও সেখানে গান করেছিলাম কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল এইসব লোকশিল্পীর ক্ষমতার কাছে আমরা আমাদের সমস্ত সুরের কারিগরী সত্বেও কত দুর্বল। গণমনে প্রবেশের গোপন পথটির এরা সহজ উত্তরাধিকারী কিন্তু আমাদের তা আয়ত্ত করতে এসব শিল্পীর পায়ের কাছে বসে অনেক কষ্টে তা শিখতে হবে।

১৯৪৬ সালে যুদ্ধোত্তর ভারতে আসে বিদ্রোহের ঢেউ। বাংলাদেশে তেভাগা আন্দোলন কৃষি বিপ্লবের রূপ নিল। এইসময় ময়মনসিংহে জমিদারী টংক প্রথার বিরুদ্ধে উপজাতি হাজংদের সংগ্রামের কাহিনী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন কৃষক পুরুষ ও রমণী তখন শহীদ হলেন। নিবারণবাবু হাজং চাষীর এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে তাদের নেতা মনি সিংহের জীবনীকে কেন্দ্র করে পুঁথিপড়ার সুরে এক সুদীর্ঘ গাথা রচনা করেন। রচনায় সুরে গাঁথুনিতে বলিষ্ঠ ভাব দ্যোতনায় নিবারণ বাবুর এ গানটি তাঁর অন্যান্য গান থেকে স্বতন্ত্র। কয়েকটি কলিমাত্র এখানে দিচ্ছি—

(পুঁথি পড়ার সুরে)

শুনেন যত দেশবাসী, শুনেন ভাই গরীব চাষী, শুনেন সর্বজন
কৃষক দরদী মনি সিংহের বিবরণ
সংক্ষেপেতে দুই এক কথাহে করিব বর্ণন ॥
একদিন মনি আচম্বিতে দেখে সুসুং রাজবাড়ীতে হাজং বহু লোক
জঙ্গী চেহারা তাদের ভয়ে ভীতু মুখ
কারণ জানিতে মনি হে হইল উৎসুক ॥
ডাকি এক হাজং-এরে নিয়া মনি কিছুদূরে জিজ্ঞাসে কারণ
কি কারণে তোমাদের ভয়ে ভীতু মন
বিস্তারিয়া কহ শুনি হে সব বিবরণ ॥
হাজংটি কাঁদিয়া বলে শুনবাবু তাহা হলে (আমরা) দোষী সর্বজন
ধান আনিয়াছিলাম নব্বুইয়ের ওজন
একশ তোলায় সের দিতে হে কয় পেয়াদাগণ।

নব্বই তোলাতে সের, ধান দেই টংকের জানি সর্বদায়
এখন সের দিতে কয় একশ তোলায়
এই দোষে হইয়াছি দোষী হে ছাড়ে না পেয়াদায় ॥
আসিয়াছি কোন সকালে ক্ষুধায় এখন পেট জলে পাইনা বিদায়
বিকালে আসিবেন বাবু বাহির আঙ্গিনায়
পেয়াদারা জানাইয়া গেল হে কর্কশ ভাষায় ॥
হাজংএর কথা শুনি অবাক হইয়া বলে মনি হবে প্রতিকার
রক্ষা করব তোমাদের প্রতিজ্ঞা আমার
বন্ধ করব জুলুমবাজী হে অন্যায় অবিচার ॥
মনি আপন জমি বাড়ী সমিতিতে দান করি করেন আবেদন
কে কে হবে কৃষককর্মী বলে এইক্ষণ
সংগ্রাম চালাইতে হবে হে জীবন-মরণ ॥
তারপর এক সভা হলো নিয়ে হাজং কোচ ডালো যতেক কিষাণ
গাড়ো বানাই ছেলে-মেয়ে হিন্দু-মুসলমান
সবারে চিনাইল মনি হে রক্তনিশান ॥
ললিত হান্নানের মত কর্মী এলো শত শত ফৌজী দশ হাজার
মেয়েরা আসিল সেজে কয়েক হাজার
টংক প্রথাটি শেষে হে হইল চুরমার ॥—ইত্যাদি

দুইজন কৃষক সামনে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে যায়, নিবারণবাবু পিছনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কবিতা আউড়ে যান এবং ধুয়া ধরেন। হাজার হাজার চাষী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নীরব আগ্রহে ও উত্তেজনায় শুনতো বাংলার চাষীর বীরত্ব কাহিনী।

তারপর এলো বাঙ্গালীর জীবনের উপর নিষ্ঠুরতম আঘাত—বঙ্গবিভাগ। যুদ্ধোত্তর গণবিপ্লবে সন্ত্রস্ত বৃটিশ শাসক, ভীত কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্বের সহায়তায় মাউন্টব্যাটনী ব্যবস্থা চালু হলো। গণ-আন্দোলনের উপর তা হানলো প্রচণ্ড আঘাত। মাউন্টব্যাটনী স্বাধীনতার স্বরূপকে তীব্র শ্লেষে উদ্ঘাটিত করে নিবারণবাবু লিখলেন—

থাইকো সাবধানে রে ভাই থাইকো সাবধানে
রইয়াছে ভাই ভূতের বাসা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে
ভূত নাই ঠিক সেওড়া গাছে
ভূতের বাসায় চিন্‌ পইর‍্যাছে

ভূত এখন ছাপ্যা আছে অতিশয় গোপনে
ভূতের বংশ ধ্বংস হয় না শুধু মন্ত্রের গুণে
নরসিং ডালের বারি ছাড়া ভূত ছাড়বেনা অল্পদিনে ॥

জনসাধারণের ক্রমশ মোহভঙ্গ হতে লাগলো। লীগ সরকার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ওয়াদা রাখলো না। মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী এক বিল আনেন যাতে জমিদারী উচ্ছেদের নামে জমিদারী রক্ষারই ব্যবস্থা ছিল। নিবারণবাবু এক-দীর্ঘ ছড়া ও গান রচনা করে ঐ বিলের প্রত্যেক ধারার অসারতা বিশ্লেষণ করেন। 'দেখ বিচার করিরে ভাই, দেখ বিচার করি। নূতন একখান বিল এনেছেন জনাব হামিদুল হক চৌধুরী।' ঐ গান ও ছড়াটি 'নয়া আইন' নামে বইয়ে ছাপান হয়। লীগ সরকারের জনবিরোধী কাণ্ডকারখানা নিয়ে আর একখানি বই লিখেন 'ষড়যন্ত্র' নাম দিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তানে সমস্ত প্রগতিশীল দল-গুলির যখন কণ্ঠরুদ্ধ তখন নিবারণবাবুর গান সমস্ত বাধা নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে কৃষকদের ঘরে পৌঁছায় এবং সজাগ করে তোলে। এ দুটি গানের বই প্রায় চল্লিশ হাজার কপি বিক্রী হয়েছিল। এ হেন কবি 'খোদার বান্দা' লীগ সরকারের নিরাপত্তার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। আনসার, পুলিসের গোয়েন্দা ও জমিদার এবং তালুকদারের চর কবির তালাসে গ্রামের পর গ্রাম হামলা দিতে লাগলো ময়মনসিংহের বীর মুসলমান চাষীরা তাদের আদরের কবিকে বক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে রাখলো অনেকদিন। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে একদিন আনসার বাহিনীর থাবায় পড়তে হলো।

পাকিস্তান সীমান্ত পার হয়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি আলিপুরদুয়ারে এসে উঠেন। নীড়হারা ঝড়ের পাখী।

পূর্ববঙ্গে তাঁর ভাঙ্গাঘরের নেড়ার ছানীতে পানির টেপটেপানী থাকলেও তাতে ছায়া ছিল আর ছিল মায়া, কিন্তু এখানে কবির মাথার উপর নির্মেঘ আকাশ আর পায়ের তলায় স্টেশন, প্ল্যাটফরমের গরম খোয়া। মাউণ্টব্যাটনী স্বাধীনতার দৌলতে রাতারাতি পূর্ববঙ্গের লোককবি হলেন পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু, দরদী সংগ্রাম-সাথী সহধর্মিনী কবির পাশে দাঁড়ালেন। মা, মেয়ে ও ছেলে মিলে বিড়ি তৈরীর ব্যবস্থা নিলেন। লোক কবির কবি-সত্তা অজেয়। দুঃখে-অনাহারে ভেঙ্গে পড়লেন না! অগণিত উদ্বাস্তুর ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে মিলিয়ে নিলেন। 'বাস্তুহারার মরণকান্না' নাম দিয়ে ভাটিয়ালী, পাঁচালী ও রামপ্রসাদী সুরে কয়েকটি গান লিখলেন। আলীপুরদুয়ারে রংপুরের কৃষকনেতা

জীবনকৃষ্ণ দের সাথে দেখা হয়, তিনি দিনহাটা সুলভ প্রেসের মালিক লক্ষীবাবুকে ধরে 'বাস্তুহারার মরণকান্না' বইটি ছাপার ব্যবস্থা করেন। পূর্ববঙ্গের কৃষক আন্দোলনের সাথী অতুল মজুমদারকে নিয়ে হাটে, গঞ্জে ও গাড়িতে গান গেয়ে বই বিক্রী করতে লাগলেন—

মোদের মায়ায় ঘেরা ঘর ছিল রে বুক ভরা খুব আশা
স্বাধীনতার দমকা হাওয়ায় ভাঙলো সুখের বাসা রে
ভাঙলো সুখের বাসা ॥

হিন্দুস্তানের ভণ্ড উদ্বাস্তু-বান্ধবদের মুখোসও খুলে দিলেন—

সীমান্ত পার হইতে নানামতে হইয়া নাজেহাল
এপারে আসিয়া দেখি আর এক জঞ্জাল।
একদল ভদ্রবেশী বন্ধু আসি দেশপ্রেমিক বলে
একাদশীতে জল-খান তারা ডুব মারিয়া জলে।
... ...
কইলে বহুকথা মনের ব্যথা কইবার জায়গা নাই
হইল বাস্তুহারার ধনে রাজা বাস্তু ঘুঘুর ভাই।
কথা সত্য কিনা আমরা পাইনা মাথা গুঁজবার ঠাঁই
(আবার) সরকারী সাহায্য পাইল পাইকারের জামাই।

কবি লিখলেন—

বেচি তিলের খাজা বাদাম ভাজা গরম চানাচুর
এমনি করে আর-বা কত করা যায় সবুর।
তারাও বসে নাই যারা ভাই খাদ্য লইয়া খেলে
গোদামজাত করতেছে খাদ্য কৌশলে কৌশলে।

কিন্তু এর মধ্যেও তিনি শোষিতদের দিকে দিকে অভিযানের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভয়-বাণী শুনালেন।

দুনিয়ার মানুষ যত
হয়েছে দ্বি-ভাগ বিভক্ত
শোষক দল আর শোষিত উভয়ে ঝগড়া
জোর জুলুমে ভাণ্ডার ভরা যাদের নীতিধারা
সে নীতি আজ মোড় ঘুরেছে শোষিত দিয়েছে সাড়া
জীবন মরণ প্রশ্নে এবার হিসাব নিকাশ জগৎ জোড়া

বুঝেও বুঝলিনা ভাই তোরা ॥
কোরিয়ায় দেখরে ও ভাই চলছে দুই নীতির লড়াই
কোরিয়ান আর আমেরিকান হইতেছে মহড়া
দুই নীতিতে চলছে দ্বন্দ্ব হচ্ছে বুঝাপড়া
মধ্যপন্থা সেখানে নাই নিরপেক্ষ যায় আগে মারা।
অশান্তি আর সইতে নারি   চল শান্তির পথ সন্ধান করি
মানুষকে রক্ষা করি মানুষ হই আমরা
অসহায় আজ মরছে মানুষ নাই তার কূল কিনারা
মানুষে মানুষ মারে এই কি রে মানুষের ধারা।

কবি নিবারণ পণ্ডিত হিন্দুস্তানে এসে নতুন নাম নিলেন উমাচরণ চক্রবর্তী। নাম গোপন করার কারণ ছিল অনেক—প্রধান কারণ সরকারের হামলা থেকে আত্মরক্ষা করা। তারপর জীবিকার সন্ধানে নিবারণবাবু যান কোচবিহারে। কোচবিহারে এসে নিবারণবাবু দেখলেন, কোচবিহারের ভাষা, সুর এবং সামাজিক পরিবেশ পূর্ববঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। স্থানীয় অধিবাসীরা হলো কোচরাজবংশী। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্যাবসা বা চাকুরী সংক্রান্তে যারা সেখানে গেছেন, তারা নানাভাবে গরীব রাজবংশীদের শোষণ করেছেন। এবং নিজেরা এক ভিন্ন সমাজ গড়ে তুলেছেন। বহিরাগত বাঙ্গালীরা স্থানীয় অধিবাসীদের বলেন 'বাহে' এবং স্থানীয় অধিবাসীরা বহিরাগত বাঙ্গালীদের বলেন 'ভাটিয়া।' এভাবেই দুই সমাজের মধ্যে বৈষম্য ঘটেছিল। বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গের গরীব চাষী সমাজের লোক দলে দলে কোচবিহারে আসেন—যাদের সঙ্গে গরীব স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। কিন্তু ভাষা ও আচার ব্যবহারের ভিন্নতার সুযোগ নিয়ে গরীবদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাজনীতিসচেতন পল্লী কবি নিবারণবাবু মনস্থ করলেন উত্তরবঙ্গের ভাষা আয়ত্ত করবেন এবং উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত শৈলী, ভাওয়াইয়া, চট্কা ইত্যাদি সুরে গান রচনা করবেন। সামন্তীয় সমাজে ও তার বিবাহপ্রথার প্রতিবাদে পল্লী-বধূর পরকীয়া প্রেম হলো ভাওয়াইয়া গানের মূল উপজীব্য। সেই গানে নিবারণবাবু চেষ্টা করলেন আনতে নতুন প্রবাহ। ভাওয়াইয়া সুরে ও ঢঙে তিনি গান বাঁধলেন—

কাক মরিলে কাকেরে কান্দে জুটে এক জায়গায়
গরীব মরিছে গরীব ভাইসব—আয়রে ছুটে আয়রে

দরদী মোর ভাই
চল করি চল বাঁচিবার লড়াই।

ভাওয়াইতে এমনি লড়াইএর গান এক সম্পূর্ণ নতুন ব্যতিক্রম। ব্যঙ্গাত্মক চটকা গানে লিখলেন :

হামরাগুলা হালুয়া কিষাণ কামাই করি খাং
কাম নাই কাজ নাই কোট এলায় যাং
দিন-হাজিরা আড়াই টাকা যদিবা কাম পাই
দিন মনে সেই শুকান রুটি দাদারে ভাতের উদ্দিশ নাই।

সত্যিকারের একজন শ্রেণীসচেতন গণকবিই পারেন এমনিভাবে এমন সহজে অন্য পরিবেশকে আপন করতে। নিবারণবাবুর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় স্থানীয় রাজবংশীদের মধ্যে গহীন বর্মনের মতো নতুন রচয়িতা এবং ঢুরো গীদালের মতো গায়করা বের হয়ে আসেন।

ঘটনার ফের এমনি, যেদিন তিনি কোচবিহারে পৌঁছেন সে দিনই এক ঘটনা ঘটে যায়। ভুখা বাংলার বুকে প্রতিরোধের আগুন ধরিয়ে খাদ্যের দাবীতে ভুখ মিছিলের উপর অহিংস কংগ্রেসী সরকারের চললো গুলী। কবিতা, বন্দনা দুইজন মেয়ে ও সতীশ, বাদল ও বকুল তিনটি ছেলে নিহত হয় কোচবিহারে। বকুলের বয়স ছিল মাত্র সাত। সারারাত কবির চোখে ঘুম নেই। 'বাস্তহারার মরণ কান্না' ক্ষুধিত শহীদদের চিতায় জ্বলে উঠলো আগুনের হলকায়।

কিন্তু মুস্কিল হলো তাঁর গান 'খাদ্যের বদলে গুলী' কোনো প্রেস ছাপতে রাজী হয় না। তাছাড়া অগ্রিম টাকার দাবী মেটানও কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে গানের কিছু গরম শব্দকে একটু নরম করতেই হলো, তাতেও কোচবিহার, জলপাইগুড়ির কোনো প্রেস ছাপতে রাজী হলো না। অবশেষে বন্ধু জীবনকৃষ্ণ দে লেখাটা নিয়ে কলকাতা আসেন এবং লেখাটার আরো কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে 'খাদ্যের বদলে গুলী, রচনা উমাচরণ চক্রবর্তী'—এইভাবে কলকাতা থেকে এক হাজার বই ছাপিয়ে নিয়ে আসেন। তৎপরে ঐ ছাপান বই দেখিয়ে কোচবিহার, শিলিগুড়ি, ধুবরীর বিভিন্ন প্রেস থেকে বিভিন্ন সময়ে ঐ বই ছাপিয়ে বা'র করা হয়। কবি নিজেও পূর্ববঙ্গের কৃষক আন্দোলনের সাথী অতুল মজুমদারকে নিয়ে হাটে, গঞ্জে, স্টেশনে, গাড়িতে চারণের মতো গাইতে গাইতে বই বিক্রী করতে লাগলেন। নিকৃষ্ট কাগজ, বটতলার ছাপা, অসংখ্য ছাপার ভুল, দাঁত-ভাঙ্গা টাইপ আবার তার মধ্যে আছে কোন হাতুড়ে বদ্যির মুষ্টিযোগের বিজ্ঞাপন। অথচ

কী আগ্রহে জনসাধারণ তা কিনতে লাগলো। প্রথমে মাত্র এক হাজার ছাপান হয়েছিল। দুদিনেই তা শেষ হলো। তারপর কয়েকটি সংস্করণে ৪০ হাজার ছাপান হয় এবং বিক্রীও হয়। গানের লেখক উমাচরণ চক্রবর্তী কে, কোথায় থাকেন অনেকেই নিবারণবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, কিন্তু তারা কেউ জানতে পারেন নি যে যিনি বিক্রেতা, যিনি গায়ক তিনিই লেখক।

কোচবিহারে আসার পর 'খাদ্যের বদলে গুলি', থেকে আরম্ভ করে 'চাষীর কথা', 'টসার কথা', 'নীলবিদ্রোহ' প্রভৃতি প্রায় ২০টি গানের পুস্তিকা প্রকাশ করেন তিনি। এসব মিলে তাঁর রচনার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় মোট ৩৫ খানা। কয়েকটি গান নিবারণবাবু ও আমি যুক্তভাবে রচনা করেছি। বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল 'আমরাতো আকালে মরব না।'

আকালেতে মরবনা অকালেতে মরবনা
ক্ষুধার জ্বালায় গরম সীসার গুলী খেয়ে মরবনা।......

১৯৫২ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী থেকে প্রকাশিত 'ভোটবৈতরনী কাব্য' নিবারণবাবু ও আমি যুক্তভাবে রচনা করেছিলাম। এক মাসের মধ্যে ১০ হাজারের মতো এই গানের পুস্তিকাটি বিক্রী হয়েছিল।

কোচবিহারে আসার পর আমি নিবারণবাবুকে সুকান্তের 'ছাড়পত্র' এক কপি উপহার দিয়েছিলাম। সে বই পড়ে উদ্বোধিত হয়ে তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি কবিতা 'অরণ্যের আশা' আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তদানীন্তন দৈনিক 'স্বাধীনতা'র রবিবাসরীয় পাতায় সে-কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। কবিতাটির আংশিক উদ্ধৃত দিচ্ছি :

রয়েছে অশোক
অশ্বত্থ, বট, শিমূল, মাদার
নাগেশ্বর, অর্জুন, শমী
শিশব, খয়ার
দেবদারু পলাশেরা মাথা নত করি।
তবু ওটা শালবন শুনি লোকে বলে
অন্তরা রয়েছে হায় শালের আড়ালে।
জানি একদিন
আসিবে ফাগুণ—চৈত্রের ঘূর্ণি হাওয়া
বিশাল শালের বড় আসিবে দুদিন

অবজ্ঞায় আগোচরে যারা পিষ্ট নত
আসিবে গোচরে।
দেবদারু উচ্চশিরে স্পষ্ট দেখা দিবে
রক্তরাঙা পলাশেরা ছড়াবে আগুন
দাউ দাউ সে আগুনে অরণ্য জাগিবে।
আড়ালে অচেনা যারা
চির অবনত
ফুলে ফলে হবে তারা
যোগ্য সুশোভিত
পলাশের সাথে সাথে লইবে শপথ
মুক্তবায়ু সূর্যালোকে নির্বাক ঘোষণা
বনে বনে ছড়াইবে অন্য জনমত।

অরণ্যে শালপদের একাধিপত্যকে প্রতীক রূপে এভাবে ব্যবহার করে নিবারণবাবু স্বকীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্যের সাথে সহজ কাব্যে যুক্ত করেছেন সমাজ রূপান্তরের এক সুগভীর প্রত্যয়কে। আমাদের দুঃখ, নিবারণবাবুর এ-ধরনের কবিতাগুলো আমাদের হাতে দু-একটা মাত্র আছে। তিনি নিজেও রাখেন নি। নাগরিক কবি মহলে আগ্রহের অভাব নিশ্চয়ই তার একটা কারণ।

নিবারণবাবু আজ পর্যন্ত অনেক গানের বই লিখেছেন। 'জনযুদ্ধের ডাক', 'জনযুদ্ধের ছড়া', 'জনযুদ্ধের গান', 'লোকসংগীত', 'জনসংগীত', 'ময়মনসিংহের জারীগান', 'ষড়যন্ত্র', 'প্রগতির ছন্দ', 'বাস্তুহারার মরণ কান্না', 'খাদ্যের বদলে গুলী' প্রভৃতি। কোনো কোন বই ৪০ হাজার এমন কি ৭০ হাজার পর্যন্ত বিক্রী হয়েছে। ১০ হাজারের নীচে একটিও নয়। আমাদের আধুনিক কবি যাদের বই পাঁচশ কি হাজার বিক্রী হওয়া একটি রীতিমত ঘটনা তাদের কাছে নিবারণবাবুর বই বিক্রীর হিসাবটা আরব্য উপন্যাসের মতোই শোনাবে না কি?

সংগীত সৃষ্টি থেকে তিনি সংগঠন ও আন্দোলনকে আলাদা করে দেখেন না! কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার ও সংগঠক বলেই জনসাধারণের প্রতিটি সমস্যা নিয়ে অফুরন্ত লিখতে পেরেছেন। তিনি প্রচলিত লৌকিক শিক্ষা-রূপকেই মাধ্যম করে নিয়েছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় কৃষকদের মধ্য থেকে করিমগঞ্জ থানার অন্তর্গত কিরাটন গ্রামের মিঞা হোসেন মুন্সীর মতো আরো বেশ কয়েকজন লোককবির

জন্ম হয়। কিন্তু আমাদের তখনকার গণনাট্য আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীর অস্বচ্ছতা ও সংগঠনের দুর্বলতার জন্য এইসব সহজাত লোককবিদের একটি ঐক্যবদ্ধ গণ-সংস্কৃতি আন্দোলনে আমরা মিলিত করতে পারি নি। তারই ফলে শহরের গীতিকাররা যেমন রূপ সর্বস্বতার অর্থাৎ ফরম্যালিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, তেমনি আজকের কৃষক জীবনের বৈপ্লবিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে পুরাতন লৌকিক শিল্পরূপের মধ্যে যে পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সে সম্বন্ধে লোক শিল্পীরাও তেমন সচেতন প্রচেষ্টা করতে পারছেন না। নিবারণ বাবুর মধ্যেও এ বিষয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে এবং কিছুদিন আগে আমার কাছে এক পত্রে তা ব্যক্ত করেছেন। জানি আমাদের এ অন্তর্দ্বন্দ্ব অগ্রগতির অন্তর্দ্বন্দ্ব। এবং এ-বিষয়ে সজাগ থাকলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাব।

কিন্তু সে-লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নিবারণ বাবুর মতো যেসব লোকশিল্পী জনতার অন্তর-গোমুখী থেকে বের হয়ে এসেছেন তাদের অগ্রগামী ভূমিকাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিতে হবে।

আজো নিবারণ বাবুর সৃষ্টিকারী প্রচেষ্টার বিরতি নেই। কঠিন হৃদরোগে তিনি আক্রান্ত কিন্তু যখনই তার কাছে গেছি—ব্যাধির কথা নয়—গণনাট্য এবং গণসংগীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতেই ভালোবাসেন এবং দুর্বলকণ্ঠে পুরোনো দিনের কিংবা নতুন রচনার গান কোনো গাইতে শুরু করেন। গত ৩০ বৎসরের উপর প্রগতিশিল্প সাহিত্য ও গণনাট্য আন্দোলনে সারা ভারতে কত শিল্পীর ও লোককবির সান্নিধ্যে এসেছি। দেখেছি শিল্পীর আমিত্বটা বারে বারে আমাদের সংগঠনে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এমন নম্র, বিনয়ী, মিষ্টিভাষী গণ-দরদী আপনভোলা লোককবি খুব কমই পেয়েছি।

অতীতের প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর স্বনামধন্য নাগরিক কবি সাহিত্যিক ও শিল্পী-বৃন্দের অধিকাংশই যখন স্থিত স্বার্থের পায়ে সাষ্টাঙ্গ আত্মসমর্পন করেছেন—তখন পল্লী-কবি নিবারণ পণ্ডিত আমাদের কাছে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

পরিশিষ্ট

'লোকসংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম' গ্রন্থের ভূমিকা

'কৃতজ্ঞতা'

লোকসংগীত সম্পর্কে আমার নানা বিচ্ছিন্ন ভাবনা একসূত্রে গাঁথা হয়ে বইয়ের আকারে আত্মপ্রকাশ করার মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে সেইসব নামহীন গ্রামীণ শিল্পীদের—যাঁদের সৃষ্ট অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার থেকে আমার সংগীত ও সংগীতচিন্তার রসদ আহরণ করেছি।

দারিদ্র্যে, অনাহারে ও অনাদরে দিনপাত করে যাঁরা সুরলোক সৃষ্টি করে গেছেন এবং আজও করছেন তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার আমার কতটুকু জানি না, তবে তাঁদের হয়েই এখানে দু'কথা বলার চেষ্টা করেছি।

চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলন যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারই একজন সংগঠক হিসেবে তখন এই শ্রমজীবী মানুষ ও তার সৃষ্ট সুর-সম্পদকে আরও গভীর ভাবে জানবার সুযোগ ঘটল। সুরমা উপত্যকায় পার্টির নেতৃত্বে ও আমার পরিচালনায় নির্মলেন্দু চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী, গোপাল নন্দী, হেমন্ত দাস প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে যে প্রথম সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠন করা হয়েছিল তাঁরা গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে লোকসংগীত সংগ্রহ করে আনতেন। গ্রামের লোকশিল্পীদের পথ অনুসরণ করে নিজেও গীতিকার হবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখনও লোকসংগীতের সামাজিক ও সাংগীতিক অবস্থান নিয়ে তেমন ভাবিনি। আসামে গণনাট্য আন্দোলন সংগঠিত করার জীবনে মূল অসমীয়া-জাতির পাশাপাশি বাস করা বহু উপজাতি ও খণ্ড জাতির গানের সুরের নিজ নিজ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আমার মনে জাগাত বহু প্রশ্ন। তখনও ethno-musicology সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে যেসব গবেষণা হচ্ছে তার কিছুই জানতাম না। শ্রীহট্টের রাগপ্রধান সংগীত রচনার পথিকৃৎ কবিয়াল বন্ধু ফণী দাস লোকসংগীত ও রাগসংগীতের তুলনামূলক কিছু কিছু আলোচনা করতেন আমার সঙ্গে—যদিও এ-বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁর নিজস্ব মুদ্রণালয় থেকে আমার প্রথম গণসংগীতের বই 'বিষাণ' তিনিই প্রকাশ করেন। তাঁর তখনকার আলোচনা আমাকে পরবর্তী সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'শ্রীহট্টের লোকসংগীত' গ্রন্থে একটি অধ্যায় 'শ্রীহট্টের লোকসংগীতের সুরবিচার'

আমাকে লিখে দিতে অনুরোধ জানান কিন্তু জেলাগত বা আঞ্চলিক সুরবিচারের চেষ্টা তখনও করিনি এবং এ-বিষয়ে কোনো প্রামাণ্য লেখাও হাতে ছিল না। তিনিই প্রথম আমাকে এদিকে আকৃষ্ট করলেন। শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য নৃতত্ত্ববিদ ডঃ সুরজিৎচন্দ্র সিংহ ও ডঃ পূর্ণিমা সিংহ শ্রীনিকেতনে থাকাকালীন ভূমিজদের গানের সুরবিচারের আলোচনা করে আমাকে শোনান। শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা সিংহ শুধু বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্রীই নন—শাস্ত্রীয় সংগীতেও তাঁর যথেষ্ট দখল। ভূমিজদের সুরবিচারে তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমাকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। ইতিমধ্যে রাগসংগীতের শিক্ষক শৈলেন পাল, বিশেষতঃ বন্ধু নীহারবিন্দু চৌধুরীর কাছে বিভিন্ন রাগের রূপ জানতে কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করি ও আজও করছি। একধরনের সংগীতবিদ লোকসংগীত ও রাগসংগীতের মধ্যে যে প্রাচীর গড়ে তোলেন আমার কাছে তা ক্রমশঃ ভাঙতে লাগল এবং রাগসংগীতে লোকসংগীতের ও লোকসংগীতে রাগসংগীতের elements খুঁজে খুঁজে নতুন চিন্তার খোরাক পেলাম। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তী প্রমুখদের লেখাগুলো আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

এই সময় বিজ্ঞান কলেজের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের পাঠাগার থেকে ethnomusicology'র সম্পর্কে বই ও ম্যাগাজিন পড়তে দিয়ে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেন। সেগুলো থেকে সবকিছু আহরণ করা আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিল। তবুও এ-থেকে আমি অনস্বীকার্য ভাবে উপকৃত হয়েছি। মনে হয়েছে এইসব সমসাময়িক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিশেষজ্ঞরা উৎপাদক খেটে খাওয়া মানুষের সামাজিক অবস্থিতির বিশ্লেষণ ছাড়াই শুধু সুরবিশ্লেষণে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু তাঁদের পূর্বসূরী, এ-বিষয়ে পথিকৃৎ, মহান সংগীতজ্ঞ সেসিল শার্প আজও আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। যাহোক, এই সামান্য বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা সম্বল করেই আমি চৌদ্দ পনের বছর আগে থেকেই এ-বিষয়ে কিছু কিছু লিখতে শুরু করি। শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য তাঁদের সম্পাদিত 'এক্ষণ'-এ আমার প্রথম প্রবন্ধটি এবং পরপর আরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত করেন। আমার বন্ধু লোকায়ণিক শ্রীঅরুণ রায়ের সঙ্গে আলোচনা আমাকে সব সময় সাহায্য করেছে। তাঁর সম্পাদিত 'চতুষ্কোণ'-এ আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতায় বেঁধেছেন। আসাম গৌরীপুরের লোকসুর ও লোকনৃত্যের ভাণ্ডারী প্রমথেশস্বসা

শ্রদ্ধেয়া নীহার বড়ুয়ার কাছেও আমার ঋণের অন্ত নেই। আমার অনুজাপ্রতিম অদ্বিতীয়া লোকসংগীতশিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার কথাও এই প্রসঙ্গে মনে হয়।

শিলচরের বিশিষ্ট লোকনৃত্য ও লোকসংগীত-সংগ্রাহক আসাম গণনাট্যের আমার সহকর্মী মুকুন্দ ভট্টাচার্যের কথা না বলে পারি না।

আসামে ডিব্রুগড়ে আমার ইস্কুলের সহপাঠী লোহিত কাকতির কাছে বিহুগান প্রথম শুনি ১৯২৭-২৮ সালে, যখন বিহুগীত শহরের জীবনে নিষিদ্ধ ছিল। পরে আসামের যুগস্রষ্টা রূপকুমার জ্যোতিপ্রসাদ ও বিষ্ণু রাভা এবং আনন্দিরাম দাস, ডঃ ভূপেন হাজারিকা, ব্রজেন বরুয়া প্রমুখ শিল্পী ও স্রষ্টাদের এবং বহু লোকশিল্পীর সঙ্গে আমার অতি আপন সম্পর্ক আমাকে আসামের লোকগীতি বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এ-বইতে অসমীয়া লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে প্রধানত বিহুর কথা আলোচনা করেছি।

গ্রাম্য জনতার জীবন চলমান। সেই জীবনে বার বার ডুব দিয়ে মণি আহরণ করতে হয়। এই বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। আমার আলোচনার মৌলিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে আমার সহশিল্পী ও সহকর্মী কালি দাশগুপ্ত উত্তরবঙ্গে ও আসামে বারংবার পরিভ্রমণ করে এই মণি সংগ্রহ করে চলেছেন। আসামে চা-মজুরদের মধ্য থেকে তাঁর সংগ্রহ আদিবাসী সংগীতের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। তিনি নিজে গায়ক হওয়াতে তত্ত্ব ও শিল্পে এতদিন আমি যে-কথাটি বলতে চেষ্টা করেছি তা আরো শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

তাছাড়াও যাঁদের কাছে আমি ঋণী এমন এত নাম আছে যে আজ তাঁদের কথা মনে হলেও এখানে নাম উল্লেখ সম্ভব না। খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও সংগীত সমালোচক বন্ধু নারায়ণ চৌধুরী প্রথম থেকে এই গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যোগী না হলে এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য না করলে ও অবিরাম তাগাদা না দিলে এ বই বার হত না।

প্রকাশক শ্রীবিপুল চট্টোপাধ্যায় লোকসংগীত বিষয়ে একটি বই প্রকাশের আগ্রহ অনেকদিন ধরে দেখিয়ে এসেছেন, তিনি ও তাঁর সংস্থা আমার এই বইটি প্রকাশ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এজন্যেও কৃতজ্ঞ আমি।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

আকাশবাণীর কেন্দ্র-অধিকর্তাকে লেখা একটি চিঠি

Sri Qaisar Qalandar,
Station Director,
All India Radio,
Calcutta 700 001.

Dear Sir,

Before I meet you on the question of the transmission of folk songs of Bengal from the Calcutta Station, I would like to formulate some points of discussion as given below :

1. The audition board is to be constituted in a way where well-known critics and exponents are included.

2. The examinee while singing himself or herself must play on at least a single stringed instrument, 'Ektara' or 'Laua'. Tanpura is to be abandoned as it is not the instrument for folk songs and creates a different milieu. A person who cannot handle even an 'Ektara' while singing can by no means be called a folk singer.

3. A singer playing 'Dotara' while singing must be given special marks in audition.

4. Simply announcing 'Lok Giti' or 'Palli Giti' will not do. The announcer must mention the genre, the style and particularly the region the song belongs to.

5. After the selection is made by the audition board an arrangement must be there for the board to check up the subsequent performances of the artiste. Very often after getting access to the AIR by singing correctly one or two songs the artiste, having a poor stock is found singing spurious urban compositions in his programmes.

6 The list of folk song composers that the AIR maintains

should be scrapped completely. A song is to be judged in its own merit.

7. Special effort must be there to recruit genuine folk singers from rural areas, limiting the influx in the AIR of the alienated urban breed.

8. In accompaniment Tabla has to be completely abandoned and Dhol or Dholak to be introduced immediately.

9. The present grade system is a ridiculous affair—an indication of favouritism and a negation of the principles of collective selection.

Yours sincerely
Sd/- Hemango Biswas